ভালবাসিব না আর

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১৩৭১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

ভালবাসিব না আর

হাইজিনে স্নেহপদার্থ কথাটা প্রথম পেয়েছিল কমলেশ। সে তার স্কুল জীবনের কথা। এখন সে স্কুলের পড়ার বই লিখে নাম করেছে। কলকাতায় বাড়িভাড়া করে সংসার করে। ছিমছাম সংসার। একটিই ছেলে। কলেজে পড়ে। একটি বউ। বেশ ফিটফাট। স্থায়ী একটি রোগ পুষে রাখায় উনচল্লিশ বছরের খুকুকে কেউ প্রথম দেখায় পঁচিশের বেশি বলে না। পুরনো সস্তার ভাড়ায় চার-পাঁচখানা ঘর। একটায় গান শোনে। একটায় খায়। একটায় বসে বই টুকে টুকে সেনগুপ্তর মেডইজি লেখে।

তবু কমলেশ সেনগুপ্ত ছোটবেলার স্কুল জীবনের সেই স্নেহপদার্থকে ভুলতে পারে না। পঁয়তাল্লিশে পৌঁছে সে একা থাকলে এইসব ভাবনা তার মনের ভেতর ভেসে ওঠে।

মা বাবা বেঁচে থাকতে তাঁদের মর্ম বুঝিনি। ওঁরা থাকা মানে মাথার ওপর ছাতা। এখন সে নিজের সংসারে মহেন্দ্র দত্ত। সবাইকে আগলে থাকার জন্যে কাঁহাতক একা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু উদ্বেগ আশঙ্কা তাকে দিয়ে এইসব করিয়ে নেয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছে—এরও মূলে সেই স্নেহ।

আমি না থাকলে খুকু তার ছেলেকে নিয়ে দিব্যি সব সামলে নিতে পারবে। যদি না পারে? অল্পবয়সে সংসারের ভার মাথায় নিয়ে পিতৃহীন ডালিমের পড়াশুনোর দফরফা হবে।

আমি সেরিব্রালে যদি প্যারালিসিস হয়ে পড়ে থাকি—একটা হাত কোনওমতে তুলতে পারি—তাহলে সংসার তো ডালিমকে দেখতে হবেই—তার ওপর আমার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার মেল নার্সের খরচ বইতে হবে। খুকু পারবে না। খুকুর ডান দিককার ফিমার বোনে ঘুণ ধরেছে। ঘন ঘন ওঠানামা—বেশি চলাফেরা বারণ। স্ট্রেইন হলে ও-জায়গায় ব্যথা করে। এক্সরে প্লেটে তাকিয়ে ডাক্তার বলেছিল কোথাও শুকনো জায়গায় বেড়িয়ে আসুন। বোন টিবি। ইনফ্লেমেশন অব দ্য বোনম্যারো। ইনজেকশন দিচ্ছি—

কোনও চিন্তা নেই।

ছেলে বড় হয়ে যাওয়ায় খুকু আজকাল চা খাওয়ার পর এক খিলি করে পান খায়। অসুখ খুকুর বয়স বাড়তে দেয়নি। বরং তাকে হালকা রেখেছে। দেখলেই কমলেশের মনে হয়—চাপ দিলে ফুট করে ভেঙে যাবে। তাই কমলেশ মনে করে—এ সংসারে তার একদম মরে যাওয়া উচিত; নয়তো ভীষণ সুস্থ থাকা উচিত।

পরে কমলেশ একা একটা বুঝছে—এরই নাম স্নেহ। রক্ত, মাংস হাড়ের ওপর এই জিনিসের প্রলেপ দিয়ে ভগবান তারপর চামড়া বসায়। পাঁঠা খাসির বেলায় ওকে বলা হয় বোধহয় চর্বি।

এছাড়াও কমলেশের সংসারে দুটি কুকুর আছে। ওরা যমজ বোন। বয়স চারপাঁচ মাস। রোজ বড় হচ্ছে। একজনের নাম হেম। অন্যজন নলিনী। ওদের বাবা পিরানিয়ান মাউন্টেন ডগ। এখন তার বয়স এগারো মাস। ওদের মা অ্যালসেশিয়ান। বয়স প্রায় সাড়ে ছ'বছর।

হেম ও নলিনী শুধু তাকিয়ে থেকে সারা বাড়ির আদর কাড়ে। হেমের একটা দোষ আছে। একই কলাই থালায় খেতে দিলে সে ভয় দেখিয়ে একাই খায়। নলিনীকে কিছু খেতে দেয় না। নলিনী দূরে দাঁড়িয়ে ওর বোনের খাওয়া দেখত আর রোগা হত। সম্প্রতি এটা বন্ধ করেছে কমলেশ। পটলের সাহায্যে।

পটল একজন সাবালক বালক। সে কথায় পরে আসতেই হবে। উপায় নেই কোনও।

সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর আগে অনেকগুলো লোহার বেড়া মাথায় করে নিয়ে আসে ক্লাউন, ঘোড়সওয়ার, তারের বালিকা সাইক্লিস্ট, রিংমাস্টার। তাড়াতাড়ি বেড়াগুলো জুড়ে ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্তপোক্ত ঘেরাও তৈরি হয়। তার ভেতর ছোট দরজার মুখে বাঘের খাঁচার ফাঁসকল তুলে দিলে বাঘ ঢুকে পড়ে সেই ঘেরাওতে।

খুকুর বুদ্ধিতে কমলেশ মিস্ত্রি দিয়ে অমন কতগুলো কাঠের বেড়া বানিয়েছে। দরকার হলে টেবিলের নিচে হেম নলিনীকে ঘিরে রাখা যায়। চারখানা ছোট বেড়া টেবিলের চারদিকে আটকে দিলেই হল। এখানে রিংমাস্টার পটল।

কিংবা বাড়ি পরিস্কারের জমাদারের যাতায়াতের পথে দু'দিকের দেওয়ালের মাঝখানে দুটি বেড়া বসিয়ে পটল ডাকে—অ্যাই হ্যামনলিনী—নলিনী রে।—

ওরা দুজন পটলের গলায় মায়ায় পড়ে গিয়ে ফাঁদে পা দেয়। এখন পটলের রিংমাস্টারের কেরামতিতে নলিনী আবার মোটা হচ্ছে। আলাদা কানা উঁচু দু'খানা কলাই থালায় সকালসন্ধে পটল দুধের সঙ্গে হাতে গড়া রুটি দু'খানা করে চটকে রাখে। তাতে পাঁচ ফোঁটা করে অ্যারডেচ ড্রপ। এক চামচ করে অস্টোক্যালসিয়াম। তারপর বেড়ার ভেতর হেমকে বাইরে নলিনীকে আলাদা করে খেতে দেয় পটল। দুপুরের ভাত মাংসও তাই। সঙ্গে ক্যালসিয়াম ডাই ফসফেটের গুঁড়ো। আর খানিকটা করে গেরস্থর স্নেহ-ভালবাসা।

মেডইজি লিখতে লিখতে সবই দেখতে পায় কমলেশ। তার এক একখানা বই ছাপা হয় পঁচিশ-তিরিশ হাজার করে। সে জানে পটল সমেত হেম নলিনীকে স্নেহ করে সে। আর স্নেহ করে ডালিম সমেত ডালিমের মাকে।

তার বাইশ বছরের বিয়ে করা বউ খুকুর শরীরের ভেতর একখানা হাড়ের মজ্জা যখন খুলে গেল—সে প্রথমেই ভাবল মা নেই—বাবা নেই—ভাইয়েরা সব দূরে চাকরিতে—এ অবস্থায় খুকু চলে গেলে তো চিরকালের জন্যে যাবে। মানে আর দেখা হবে না। ওরে বাবা। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস আর কি হতে পারে। এমন হবে জানলে তো দেখা হওয়াটাই বন্ধ করে দিত কমলেশ। সামনে কত লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেবে। তাদের জন্যে কত সিওর সাকসেস, কত মেডইজি এখনও লেখা বাকি। এসব নিয়ে আমি কি করব তখন—যদি খুকু না থাকে!

এমন অবস্থায় গত ৩রা এপ্রিল এক অবস্থাপন্ন ঘরে হেম-নলিনী জন্মায়। সেখান থেকে মে মাসের গোড়ায় ওরা দু-বোন বিক্রি হয়ে এ বাড়ি আসে। ডালিমের তো আর কোনও ভাইবোন নেই। সে চিরকালই কুকুর পছন্দ করে। বিছানায় বসিয়ে নিয়ে কলেজের পড়া পড়তে বসে।

এপ্রিলের শেষদিকে আসে পটল। হেম নলিনী এসে পৌঁছবার কয়েকদিন আগে। পটল খুব দূরে ছিল না। বাড়িওলার বাড়িতে তেতলায় ওর মা কাজে আসত। সঙ্গে পটল। সাত-আট বছরের বোন সিম। ময়লা ফ্রক। খড়ি ওঠা চেহারা। আর ওদের বছরখানেকের হামাটানা ল্যাংটা ভাই আলু। চান্স পেলেই হেগে খেয়ে ফেলত। সিম সবসময় পাহারা দিয়ে উঠতে পারত না। কমলেশের চেঁচামেচিতে ওদের মা তেতলা থেকে নেমে এসে পটলকে ধমকতো। যা—রাস্তায় টিউকল থেকে জল এনে ধুয়ে দে।

এ ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটত কমলেশের বেরোবার সদর দরজার সামনে। সেখানেই তেতলা থেকে সিঁড়ি এসে থেমেছে। মায়ের ধমকে পটল এসে ধুয়ে দিত। হাফপ্যান্ট। খালি গা। গলায় রাস্তা থেকে কেনা হার। তাতে আবার দু-একটা সেফটিপিন। এছাড়াও ওদের একটা ভাই আছে। তার নাম কচু।

বরান্দা ধোয়ার সময় পটল কমলেশের চোখে তাকিয়ে দেখত। ভাবখানা তুমি বাবু আছ তো তোমাদের—তাতে আমাদের কি? আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি ন। খাটি-খাই। শোধবোধ হয়ে গেল। যাও। আমার ছোটভাই অ্যা করেছে। ধুয়ে দিয়েছি। ওর গা সিম এসে এখুনি ধুয়ে দেবে।

কচু সব সময় ল্যাংটো। বছর চারেক বয়স। ভয়ঙ্কর ভাল স্বাস্থ্য। ভাল কথা—ওদের মায়ের নাম যমুনা। যমুনা সধবা। তখনও কমলেশ যমুনার স্বামীকে দেখেনি। দেখেনি বড় ছেলে ওলকে। যমুনা কাজের ফাঁকে লাইন দিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানের পাউরুটি আর দুধ আনত। তা তার প্রায় সবটাই কচু কেড়ে খেয়ে নিত। এসবই কমলেশের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়। কমলেশ ওদেরও একটু একটু স্নেহ করতে থাকে।

কমলেশ একটা পুরনো চাকরি করে। চাকরির গায়ে শ্যাওলা পড়ে গেছে। এক ঢাউস কলেজের মাস্টারি। সেখানে দফায় দফায় মাইনে বেড়ে সে এখন শেষ দিককার মাইনে পায়। ডিপার্টমেন্টাল হেড বলে রুটিন করে। গম্ভীর থাকে। টিউশনি করে ভাল টাকার। আর ইস্কুল, বারো ক্লাস, পার্ট ওয়ান, পার্ট টুয়ের বই লেখে ঢালাও।

পাঁচ-ছ' বছর আগে চল্লিশ পার হয়েই কমলেশের ভাবখানা রিটায়ারের। এক জায়গায় বসে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা লেখে। সেখানেই খায়। শোয়। বসে বসে হজম করা দরকার বলে নানা রকমের বড়ি, ভিটামিন খেয়ে থাকে নিয়ম করে। লিখতে লিখতে মাঝরাতে উঠেও খোলা বারান্দায় পায়চারি করে। কেননা, যদি মরে যায়—তাহলে কি হবে এই চিন্তায়। তখন শহুরে জ্যোৎস্নায় হেম-নলিনী মিশে গিয়ে মিশরী সিংহের পোজে ঘুমোয়। কিংবা কমলেশকে পায়চারির অনুমতি দেওয়ার সম্মতি মেঝেতে মৃদুমন্দ লেজ সাপটে জানিয়ে দেয় ওদের কেউ একজন। কখনও একই সঙ্গে দুজনেই।

এ বাড়ির রান্না করে বালবিধবা নিঃসন্তান মালতী। বয়স এখন ষাটের কোঠায়। পৃথিবীর দুটো জায়গা সে চেনে। বনগাঁ আর পশ্চিম

দিনাজপুর। ওখানে তার ভাইপোরা থাকে। বিনা টিকিটে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে। একবার দু'মাস পরে আদ্রা জেল থেকে হাসতে হাসতে ফিরে আসে। খুকুকে বলে বৌদি। কমলেশকে বাবু। তার জন্যে নাড়ু করে। করে তালের বড়া, পোস্তর বড়া, মুলো শাক ভাজা। খুকুর অসুখটা পোষা হয়ে যাবার পর থেকে আরও একজনকে কমলেশ এ বাড়ির কাজে বহাল করেছে। তার নাম সুবালা। সে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট দেয়—রেশন আনে। সুবালার স্বামী রং-মিস্ত্রি। দিন মজুরি পনেরো টাকা। তবে কাজ থাকে না প্রায়ই। কমলেশের বাড়ির সামনে প্রায়ই ফুটপাতে বসে গুলতানি করে। মাঝে মধ্যে কমলেশের সিগারেট এনে দেয়।

এই মালতী, সুবালা, যমুনা—এরা সবাই পঁয়তাল্লিশ নম্বরে পোড়াবস্তির বাসিন্দা। যুদ্ধের সময় জাপানি বোমায় বস্তিটার অনেকখানি পুড়ে যায়। সেই থেকে নাম পোড়াবস্তি। বস্তির একদিককার সীমানায় বজবজ যাওয়ার রেল লাইন। সেই সীমানায় শুয়োর, মানুষ, গেঁজেল, গাঁটকাটা, ঘুরঘুর করে। ছাদ ফুটো, বারোয়ারি জলকল, চটে ঢাকা ঘেরায় চৌদোলা ল্যাট্রিন। দুর্গন্ধ। ঘুঁটে, গোবর, নোংরায় হরিহরছত্র। তার ভেতর থেকে এসে ওরা কমলেশদের পরিস্কার রাখে—রান্না করে, বাটনা বাটে, কাপড় কাচে, ফাইফরমাশ খাটে। ওদের দিকেও কমলেশের স্নেহ গড়িয়ে যায়।

যমুনার মেয়ে সিমের দিকে তাকানো যায় না। ভোরবেলা মায়ের সঙ্গে কাজে এসে আলুকে সামলায়। কচুর থাপ্পড় খায়। কচু ছোটভাই—কিন্তু গায়ে খুব জোর। সে থাপ্পড় দিয়ে সবকিছু কেড়ে খায়। পটল সুযোগ পেলেই কাজের বোঝা সিমের ওপর চাপায়। যেমন সিঁড়ির ঝাঁটপাট। না পারলে চড় কষায়। অল্প বয়সে খবরদারির আনন্দও পায়।

এইসব হুকুম তামিলের ফাঁকে ফাঁকে লোহার একটা পাতলা খোঁচানি হাতে সিম গেরস্থ পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে। হাতে ডালা। সবার আস্তাকুঁড় ঘেঁটে সারাদিন পর সন্ধ্যার মুখে একডালা কয়লা হাইড্রেন্টের জলে ধুয়ে ফেলে। সেটাই যমুনাদের বাড়ির রান্নার জ্বালানি।

একটা ফ্রক বা দুটো টাকা দিয়ে সিম বা যমুনার উপকার করা যাবে না। তাই কমলেশের পরামের্শ খুকু যমুনাকে বলল, তোমার পটলকে আমাদের বাড়ি কাজে দিতে পার। বাবুর সিগারেট আনবে। সঙ্গে বাজারে যাবে। ফোন ধরবে। বাবু গান শোনেন, গানের রেকর্ড ওলটাবে। চাপাবে।

যমুনার চোখ ঝক করে উঠল। আমার পটল গান খুব ভালবাসে,

বড্ড ছেলেমানুষ। ওকে দেখেশুনে খাটিয়ে নিও।

আমার ডালিমের বইপত্র গুছোবে। জুতো জামাটা তুলে রাখবে। হালকা কাজ। খুব পারবে পটল। বারো-তেরো বছর বয়স তো হয়েছে।

না বৌদি। পটলের এই নয় চলছে।

খুকু আপত্তি করল না। সে জানে বয়সের ওরা কোনও হিসেব জানে না।

পটল বহাল হয়ে গেল। কিন্তু তিনদিনের ভেতর ডালিমের হাতে এক ইলেকট্রিক চড় খেল। ঠিক কানের নিচে। মাথা ঘুরে গেল পটলের। সে দাদাবাবুর চিঠি লেখা ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। যদিও পড়তে পারে না। কিন্তু বাড়ির কাজ করতে এসে এই কৌতূহল ডালিমের পছন্দ হয়নি।

এক চড় খেয়ে পটল টঙ করে তেতলায় উঠে গেল। সেদিন সারাদিন কাজেই এল না। পরদিন সদর দরজার সামনে ল্যাংটো আলু আর কচুকে নিয়ে সিমকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল পটল।

খুকু শাসাল। হ্যাঁরে পটল ! কাজ করবি না আমাদের বাড়ি ? পটল সাবালক ভঙ্গিতে বলল, হল না। তোমাদের বাড়ি হল না।

ঘরে ভেতর লিখতে লিখতে কমলেশ পুরোটা শুনতে পেল। তার মনে হল--পটলকে পাওয়ার জন্যে এ বাড়ি যেন পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষায় ফেল হয়েছে। তাই পটল বলল, হল না। যেন পটলের এ বাড়ির কাজে বহাল হওয়ার ব্যাপারটায় পটলো না।

হল না—কথাটা ঘরে বসে শুনতে পেয়ে পটলের জন্যে কমলেশের মনে স্নেহপদার্থ জমতে থাকল।

পৃথিবী অশোকের আগে থেকেই ঘুরছে। অশোক আকবররা চলে গেলেও ঘোরে। কলকাতা নামে বিশাল গাঁয়ে—যাকে বলা হয় মহানগর—পাশাপাশি ওপর নিচে সবাই চুলো ধরিয়ে নিত্যদিন সংসার ও সভ্যতা করে। কেউ পোস্তর বড়া দিয়ে ভাত খেয়ে বামিয়ান গিরিপথে শায়িত যুদ্ধে কতটা লম্বা তাই ভাবছে। কেউ বা মহাশূন্যে নির্ভার অবস্থায় মানুষের যাতায়াতের দিনে থুতু কোথায় ফেলা যাবে—তাই নিয়ে দিস্তে দিস্তে অঙ্ক কষে হিমশিম খাচ্ছে।

কমলেশ সেনগুপ্ত কোনওদিকে তাকায় না। যতক্ষণ না ভূমিকম্প এসে তার ভাড়াবাড়িটা নাড়া দিচ্ছে—ততক্ষণ সে মেডইজি লিখে যাবেই। রাষ্ট্রবিপ্লব, সরকার বদল, মহামারী, চাঁদে মানুষ—যা-ই ঘটুক না কেন—কমলেশ তার বইগুলোর রিভাইজড এডিশন করে যাবেই।

এই সময় যমুনাদের জীবনে কলকাতার অগোচরে একটা জলস্তম্ভ টে গেল। একদিন ভোরে কড়ানাড়া শুনে কলমেশ গিয়ে দরজা খুলল। মুনা দাঁড়িয়ে। পেছনে তার অনেক লোক। কি ব্যাপার?

বৌদিমণি নেই? তাকে ডাকো।

খুকু এসে দাঁড়াতেই যমুনা বলল, এই হলগে পটলের বাপ।

তাকে ভাল করে দেখল কমলেশ। বুকের মাংস গলার দিকে কে যন কুঁকড়ে দিয়েছে। ঠোঁট পুরু আর ভারি। মাথায় কোঁকড়া চুল। ুখে কয়েকটি দাঁত। সেখানে অনেকটা হাসি। হাসি থামিয়ে লোকটি লল, আমরা চলে যাচ্ছি দাদাবাবু।

কোথায় যাচ্ছ? তোমার নাম কি?

অবোধ। আমরা—

আর বলতে দিল না যমুনা। ওটি আমার বড় ছেলে ওল। আমরা লকাতার বাসা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছি—

মুখে আর হাসি ধরছে না যমুনার। খুকু বলল, বাসা তুলে দিয়ে াচ্ছ? ফিরলে কিন্তু ঘর আর পাবে না পঁয়তাল্লিশ নম্বরে। ভীষণ চাহিদা—ালতী বলছিল।

আমরা আর ফিরব না বৌদি।

তা কি কেউ বলতে পারে যমুনা। সবাইকেই ঘুরেফিরে কলকাতায় াসতে হয়। একথা খুকু কেন বলছিল, কমলেশ বুঝতে পারছিল। খুকু লতে চাইছিল—যেখানে নতুন কাজ পেয়ে চলে যাও না কেন—হতাশ লে তোমায় তো সেই কলকাতায় ফিরতে হবে। তখন ঘর পাবে কোথায়? একবার বাসা তুলে নিলে বাসা পাওয়া বড় কঠিন।

না গো বৌদিমণি—আমরা চিরকালের মত দেশে ফিরে যাচ্ছি।

আর কাজ করবে না?

নাঃ। বাড়ি বাড়ি আর করব না। নিজের বাড়িতেই কাজ করব। ান ভাঙব। চাল করে হাটে হাটে বেচে দিয়ে নুন, কেরোসিন, সর্ষের তেল আনব।

বাড়ি আছে তোমাদের? ধানজমি আছে?

ওমা! শোন কথা বৌদির! বাড়ি আছে—জমি আছে—পুকুর আছে। তেরোটা খেজুর গাছ। দুটো তাল গাছ, আটটা নারকেল গাছ পেয়েছি ভাগে।

ক'বিঘে জমি?

ন'বিঘে। ভাল জমিটাই ভাসুরপোরা নিয়েছে। দুই ভাসুর, দুজনেই নেই। ভাসুরপোরা বছর বছর বাগান দেয়। হলুদ, বেগুন, টমেটম—কত কি লাগায়। ওরা ইস্কুলে পড়েছে তিনটে বছর। অনেক জানে তো।

এতদিন তোমরা লাগাও নি কেন।

ওলের বাপ তো বোকা। কোনও কাজ ভাল পারে না। একটা পা খুঁতো আছে। শরীরেও পারে না অনেক কিছু।

জেনেশুনে এই ভরসায় দেশে ফিরে যাচ্ছ?

তা বৌদি বর্গা চাষে সরকার আরও তিন বিঘে দিল। সরকারি খাল কেটেছে গত বছর। আমাদের জায়গার গায়ে জল বেঁধেছে বর্ষার-- সেইখানে তাই আমরা যাচ্ছি। সবাই মিলে কাজ করব।

খুব ভাল কথা। বলে কমলেশ প্রায় গ্রুপ ফটোর সঙ্গে হাসিখুশি ফ্যামিলিটা দেখতে লাগল। ভোরবেলার কিছুটা শান্ত কলকাতা। সিম আজ কয়লা কুড়োতে যায়নি। কচু এই প্রথম ইজের পরেছে। বোধহয় এসবে ওদের বড় ভাই ওলের হাত আছে। হাসিখুশি ছেলেটি। একটা ঢলঢলে প্যান্টের ওপর ভীষণ টাইট জামা পড়েছে।

এ জামা প্যান্ট কোত্থেকে কিনলে?

ওলের বাবা অবোধ বলে উঠল, আমি কিনে দিলাম।

তা এখন কেন?

পুরনো জিনিস তো, রাস্তা থেকে কিনলাম। তা ওতেই আমাদের চলে যাবে দাদাবাবু।

সংসার চালাতে পারবে তো?

খুব পারব। পুকুরে মাছ ফেলব। না বাড়া অব্দি বাপে পোয়ে বাদার মাছ ধরে খাব। খেজুর গাছ কেটে, তাল গাছ কেটে রস করে—গুড় হবে—ধান করে খোরাকি রাখব—বাকিটা যমুনা হাটে হাটে বেচবে। একখানা ঘর তোলা দরকার অবিশ্যি।

এসব এতকাল করলি না কেন?

দাদারা দখল করে রেখেছিল। ওনারা মারা যেতে ভাইপোরা এসে বলল, ফিরে চল খুড়োমশায়—তুমিই এখন আমাদের মাথার উপর আছ। তাছাড়া বর্গা চাষে তিন বিঘে ফেরত পেলাম।

ঘর তোলা, সংসার চালানো চাষবাদ--পারবে সব?

অবোধ বলল, আমি তো কিছুটা বোকা আছি বাবু। তা ওল আর ওর মা আমায় তো শিখিয়ে পড়িয়ে কলকাতায় এনেছিল। দিব্যি দুবছর

পাতাল রেলের মাটি কাটলাম—ঘর ভাড়া নিলাম পঁয়তাল্লিশ নম্বরে। দেশে ফিরে গেলেও পারব। খুঁতো আছি বলে ঠিকমত হাঁটতে পারিনে—তা এখন তাও তো একটু একটু পারি। সবই অভ্যেস বাবু।

যমুনা আর অবোধকে বলতে দিতে রাজি নয়। সে বলল, পটল ছোটবেলা থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কাজ করে। সেই লেগ্‌মার্কেটের পাগলবাবুদের বাড়ির দিন থেকে। ও চাষাবাদের কোনও কাজ শেখেনি। একটু আয়েসী—একটু শহুরে আছে ও। তা বৌদিমণি—ভেবেচি ও তোমাদের কাছে থাকবে। দেখ মারধর করো না। ফাইফরমাশ খাটবে ডালিমদার। বাবুর সিগরেট ফুরিয়ে গেলে ছুটে এনে দেবে। মাসে কুড়ি টাকা ধরে দিও।

ও কি মা ছেড়ে থাকতে পারবে?

বড় হয়েছে না। খুব পারবে বৌদি। আমাদের তো কয়েকটা কাঁচা টাকার দরকার হবে। সর্ষের তেল, জামাকাপড়, নুন এসব পটলের টাকায় হয়ে যাবে। ওল এসে মাইনেটা নিয়ে যাবে। আর একটা পেটও তো চলে যাবে। জমির উপর সব চাপ চাপাতে নেই বৌদি।

কমলেশ তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ফাইফরমাশ ছাড়াও হেম আর নলিনীকে দেখবে পটল। ওরা দু'বোন আলুর মতই যত্রতত্র নোংরা করে। ঠিকমত চান করালে গায়ে গন্ধ বা পোকা হবে না। চাই কি পটল যদি বিকেলে ছুট করিয়ে আনতে পারে তো হেম-নলিনীর জমটাও ভাল হবে। দরকার হলে মাইনেটা কুড়ির ওপর কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। আগে কাজ দেখে ব্যবস্থা। ছোকরার তাকানোয় কেমন যেন একটা বেয়াড়াপনা আছে। নিঃশব্দে সবসময় যেন গররর গররর করছে। মুখে কমলেশ বলল, ওল একা চিনে এসে পটলের মাইনে নিয়ে ফিরতে পারবে?

যমুনা আটখানা করে হেসে উঠল। কি যে বলেন দাদাবাবু। আমাদের দেশ তো খুব কাছে। ট্রেনে উঠে ক্যানিং। খেয়ায় চড়ে ওপারে গিয়ে আমঝাড়ায় নামতে হয়। তিরিশ পয়সায় আধঘণ্টার নদীপথ। আমঝাড়া থেকে দু ঘণ্টা হাঁটলেই আমাদের তালদা গাঁ। আমঝাড়ায় নেমে অবোধ বিশ্বাসের নাম বলবেন সবাই চেনে। আমাদের দেশে অতবড় বোকা আর নেই।

এ কথায় অবোধও হেসে সায় দিল। হ্যাঁ দাদাবাবু। যমুনা ঠিক বলেছে। আমায় চেনে তো অনেকদিন। এতটুকখানি বে হয়ে এসেছিল যমুনা।

খুকু বলল, কতটুকখানি ?

অবোধ সগর্বে বলল, যমুনাকে চ্যাংদোলা করে খাল পার হয়েছি অল্প বয়সে। তখনও ওল আসেনি।

লজ্জায় মুখে—কমলেশ দেখল যমুনা মুখ নামিয়ে নিল। জন্ম বোকা। চুপ করো তো। ছেলেরা স্যায়না হচ্ছে না।

খুকু জানতে চাইল, এখানকার পাট তো তুলে দিলে। তা আগের বাড়ি থেকে যে খাটখানা পাওয়ার কথা বলেছিলে—সেখানা কোথায় রেখে গেলে ?

বস্তির ঘর তো বৌদিদি। খাটে পটলদের নিয়ে শুতাম। নিচে মাটিতে ওলকে নিয়ে ওর বাপ শুতো। তা খাটখানা সুবলাদিকে দিয়ে গেলাম। ওরও তো চারটে বাচ্চা। মাটিতে শুয়ে শুয়ে বাচ্চাদের সর্দি লেগে থাকে সারা বছর। আমরা যাই বৌদিদি। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। পটল রইল দেখ তুমি।

কমলেশ আর খুকু সেনগুপ্তর চোখের ওপর দিয়ে একটা সুখী ফ্যামিলি বালিগঞ্জ স্টেশনে চলে গেল ড্যাং ড্যাং করে। পড়ে থাকল ওদের পটল। হাফপ্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি বগলে একটা পুঁটুলি।

॥ দুই ॥

পটল কাজে জয়েন করেই বেঁকে বসল। আমি হেম-নলিনীর ময়লা ফেলতে পারব না।

এতকাল তো আলুর ময়লা ফেলেছিস।

সে তো আমার ভাই। আর বেশি ফেলেছে সিম। আমি কম কম

খুকুর সঙ্গে পটলের সংলাপ শুনে কমলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল বুঝিয়ে বলল, কোনও কাজই ছোট নয় পটল। মন দিয়ে কুকুর পালতে শিখলে চাই কি কোনও বড়লোকের বাড়ি মোটা মাইনেতে কুকুরকে বেড়াতে নিয়ে যাবার চাকরি পাবি একদিন। ওরাও তো প্রাণী।

তিরিক্ষি হয়ে কমলেশের চোখে তাকিয়ে পটল বলল, ভাই আর কুকুর কখনও এক জিনিস নয় ? তোমরা আমায় ভুল বোঝাচ্ছ।

খুকু বলে বসল, একেবারে ধানি লঙ্কা। টনটনে জ্ঞান।

খারাপ কথা বলছ মামিমা।

ওমা! কি ছেলে বল তো। এটা খারাপ কথা হল।

কমলেশ বলল, জানিস গান্ধীজি আর তার বউ মানুষের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন।

সে লোকটা কে গো? বউকে ম্যাথরানী করেছিল! ভাল বোকা লোক বলতে হবে তো! কথা বলতে বলতে পটলের মুখ চোখ হাসিতে ভরে গেল।

কমলেশ তখন অন্য পথ নিল। পুরনো খাতার মলাটি ছিঁড়ে নিজেই হেম-নলিনীর শক্ত সন্দেশ তাতে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এল। এসে বলল, এই তো মামলা! এ নিয়ে এত কথা কিসের। আমিই ফেলব এখন থেকে। তোর মামিমার শরীর খারাপ না থাকলে সে নিজেই ফেলে আসত।

আমি কি কুকুর মানুষ করেছি কখনও আগে? তোমরা কি ধারার মানুষ বল তো?

মেডইজির লেখক কমলেশ নিজের মনের ভেতরেই একা একা বলল, সত্যিই তো পটল। তোমার মত মানুষকে আমরাই কি কখনও কুকুর করেছি।

ক'দিনের ভেতর দেখা গেল, পটল হেম-নলিনীকে তার অন্ধ ভক্ত করে ফেলেছে। ওদের স্নান করাচ্ছে। বাইরে নিয়ে গিয়ে দৌড় করাচ্ছে। পোকা বেছে এঁটুলি বেছে গা মুছিয়ে দিচ্ছে। বাজার করতে গিয়ে ছাট কিমা কেনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ডিসটেম্পার ইঞ্জেকশন দিতে হেম-নলিনীকে রিকশায় করে ডালিমের সঙ্গে ডাক্তারখানায় গেল পটল।

ওর আদরের ডাক, অ্যাই হ্যামা - আ -আ - আয় কুকুর দুটো পড়িমড়ি দৌড়ে পটলের কাছে চলে যায়। কমলেশ নিজে থেকেই পটলের মাস মাইনে কুড়ি থেকে বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ করে দিল। বাড়তিটা হেম নলিনীকে দেখাশুনো বাবদে।

কমলেশ বা খুকুর সঙ্গে বাজারে গেলে পটল আগ বাড়িয়ে সরেস আলু, সরেস লেবু বাছে। ও লঙ্কা নিও না মামিমা। শুঁটকো। এদিকে এস। লোটে মাছ নেবে? ঝাল দিয়ে ভাল তরকারি হয়। তোমরা খাও তো? জোড়া কলা নিও না। যমজ জন্মায়।

তুই থাম তো। এত কথা বলিস কেন বাজারে এসে? অ্যাঁ?

পান সিগারেট আনার আলাদা একটা দোকান বেছে নিয়েছে পটল। সেখান থেকে জিনিস আনে পান চিবোতে চিবোতে।

পান খেয়েছিস? পয়সা পেলি কোথায়?

দস্তুরী মামাবাবু।

দস্তুরী বলেই কি সবসময় পান খেতে আছে। একটু পরেই তো ভাত খাবি।

ভাত খাবার আগে পান খেলে কি হয়?

খেতে নেই। মুখ নষ্ট হয়ে স্বাদ নষ্ট হয়।

মুখ ধুয়ে আসি তা হলে—বলেই ছুটে গিয়ে মাঙ্কি ব্র্যান্ড দাঁতের মাজন ঘষে পটল মুখ ধুয়ে এল। এসে বলল, জান মামাবাবু লেগ্ মার্কেটে যে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ছিলাম সে বাড়ির বাবু গরমকালে দু'মাস পাগল থাকত। শীতকালে সুস্থ হয়ে উঠত।

কেমন পাগল?

পুরো পাগল। মাঝে মাঝে বাবুর ছেলেরা বাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। শুনছ মামিমা? মা-মি-মা-গো শুনছ—

পটলের গলা কেমন সরু হয়ে আসছে দেখে কমলেশ অবাক হয়ে তাকাল। পটলের মামিমা তখন সেলাইকল চালিয়ে কুচি দেওয়া টি-ভির ঢাকনা বানাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই খুকু বলল, হুঁ। সব শুনছি। মামাবাবুর লেখাপড়া উঠবে এবারে—

এই কথাটা শুনে যাক মামাবাবু। তুমি অনুমতি দাও।

কমলেশ আর খুকু অবাক হয়ে পটলের দিকে তাকাল। তারপর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কমলেশ আস্তে জানতে চাইল, ডালিম কোথায়?

পটল বলল, ডালিমদা? তিনি তো কলেজ থেকে এসে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা গেল।

খুকু বলল, বড়দের ব্যাপারে থাকতে বারণ করেছি না তোমাকে—

ডালিমদা নাইট শোতে সিনেমা দেখে ফিরবে—বন্ধুদের সঙ্গে। বলছিল। কথাটা শুনলাম—তাই বললাম। কানে কথা এলে তো ভুলে যেতে পারিনে মামিমা। মা-আ-মি-ই-মা-কিছু অন্যায় হল? কিছু কি হল অন্যায়—

খুকু চুপ। কমলেশও চুপ। পটলের গলা খানিকক্ষণের জন্য অন্যরকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিতে গিয়েও কমলেশ লক্ষ্য করল, মানুষের কণ্ঠস্বরেও স্নেহপদার্থ কাজ করে। এ ভাষাও তো পটলের না। কিছু অন্যায় হল? কিছু কি হল অন্যায়? এ ভাষা অবোধ বা যমুনা জানে না। ওল কিংবা কচুও জানে না। তালদা গাঁয়েও কেউ কোনওদিন নিশ্চয়ই এ ভাষায় কথা বলে না।

কমলেশ বলল, তা পাগলাবাবুর সঙ্গে তুই কি করতিস?

পটল ঝুঁকে পড়ে খুকুর দিকে তাকাল। তাহলে গল্প শোনার অনুমতি দিলে তো মামাবাবুকে?

সেই সরু হয়ে আসা গলা। স্বরে স্নেহ, মায়া, মমতা ইত্যাকার সবকিছু মাখানো। কমলেশ বেশ জোরে ধমকে উঠল। ও কী ভাবে কথা বলছিস মামিমার সঙ্গে, অ্যাঁ? এসব শিক্ষা কোথায় পেলি?

পটল জানে না—কোনও বাবুর বাড়ির বাবু স্বয়ং ক্ষেপে গিয়ে তাকে আচমকা ধোলাই দিতে পারে। কোন জায়গাটায় গিয়ে যে সে ধাক্কা দিচ্ছে—সে ব্যাপারে পটলের কোনও দ্বিধা বা আন্দাজ নেই। তাই চড় লাগানোর আগের সেকেণ্ডেও সে কমলেশ নিজের মুখখানা হাসি হাসি রাখতে পারে—পটল জানে না। ফলে আত্মরক্ষার কোনওরকম আগাম চেষ্টা পটলের ভেতরে নেই।

কমলেশ ফের বলল, ওভাবে কথা বলছিস কেন?

পটল কমলেশের চোখে সরল হাসি নিয়ে তাকাল। অনুমতি পেয়েছ বল মামাবাবু? একটুও না থেমে খুব মুরুব্বী চালে বলল, লেগ মার্কেটে ছিলাম আড়াই বছর। কায়দায় কথা শিখি তখন। সব কিছুর কি কেন হয় মামাবাবু?

কমলেশ এতদিনকার নোটবুক রাইটার। হাজার হাজার স্কুল মাস্টার, অভিভাবকের দুর্বলতা সে জানে। কিন্তু সরল সিধে তাকানো—কখনও হাসিমুখ—কখনো খুব গম্ভীর মুরুব্বীয়ানা—এই সাবালক বালকের চোখে সে তাকাতে পারল না। সত্যিই তো! সবকিছুর কি কেন হয়? কমলেশ তাই খুকুর পিঠে তাকাল। খুকু পিছন ফিরে সেলাই করছে। ভেতরে একটা অসুখ থাকায় আরও যেন সুন্দর হয়েছে খুকু। সেদিকে চোখ রেখে কমলেশ পটলকে বলল, এত কায়দা—পাকামি কেন তোর কথায়?

বাঃ! ঝ্যাতো যাত্রা আসতো লেগ মার্কেটে—সব দেখিচি রাত জেগে। রাজা, ভদ্দরলোক, রানী, সেনাপতি, গেরস্থ বউ, রাজপুত্তুর -সবার ভাবের কথা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পঁয়তাল্লিশ নম্বরে থেকে থেকে আমি তো অনেক ভুলে গেছি। নয়তো--আরও কত জানতাম মামাবাবু। তালদা থেকে নতুন এয়েচি—তখন আমার চেহারাও সোন্দর ছিল।

সেলাই করতে করতে খুকু টিপ্পনী কাটল, তা যাত্রার দলে ঢুকে গেলি না কেন?

এ কথা বলচ তুমি মা-আ-মি-মা-আ? শেষে ঠাট্টা করচো? তুমি

হয়ে ভুগে ভুগে আজ আমার এই দশা।

হো হো করে হেসে ফেলল খুকু। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, তোর সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক? নে—যা বলছিলি বল—

ওভাবে কি কথা বলা যায় মা-আ-মি-আ।

ফের পটল? হাতের কাঁচির বাড়ি মারব মাথায়।

পটল এরকম বাক্যের জন্যে তৈরি ছিল না। তার চোখ ছোট হয়ে গেল। ঠোঁট কুঁচকে অপমান আর কান্না একসঙ্গে ফুটে উঠতে চাইল।

কমলেশ হেসে বলল, বল না পটল।

খানিকক্ষণ থেমে থেকে আবার নতুন উৎসাহে পটল বলতে লাগল, পঁয়তাল্লিশ নম্বরেও যাত্রা পালা দেখিচি। গরিবের ছেলের সঙ্গে বড়লোকের মেয়ের বিয়ে—কান্নাকাটি, শেষে সুখ। জানো মামাবাবু পঁয়তাল্লিশ নম্বরে সেবার হল গে—আমার পিসতুতো ভাইয়ের কতা। সে কি কতা বলে কি বলব তোমায়। সার্কাসে জোকার তো। নানানরকম শব্দ করে গলা দিয়ে এক বালতি জল বের করতে পারে মুখ দিয়ে।

তোর পিসতুতো ভাই আছে নাকি?

বাঃ। পিসমা, পিসতুতো ভাই, তার বউ থাকে ওখানে। ওরাই তো আমাদের ঘর জোগাড় করে দেয়। তবে পিসমার ব্যাটার বউটা ভাল নয়।

কেন রে পটল?

চরিত্র খারাপ। বোধহয় অন্যলোকের সঙ্গে চলে যাবে। বলতে বলতে পটলের মুখে ভাবনার ছাড়া পড়ল।

তুই কি করে জানলি?

খুব সোন্দর। আমাদের তালদার মেয়ে তো। এই পাশাপাশি বাড়ি যেমন—। পেরায় মামিমার মত দেখতে। জানো মা-আ-মি-আ-

খারাপ চরিত্র জানলি কি করে? এবার জানতে চাইল খুকু। কোনওরকম ধমক না দিয়ে।

বাঃ। আমি তো যাই দুপুরবেলা। বৌদিদি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের আরেকটা লোকের সঙ্গে দুপুরে সিনামায় যায়। আমার জোকার দাদা বৌদির কথা ভাবতে ভাবতে দড়ির খেলা দেখাচ্ছিল সার্কাসে। দড়াম করে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙেছে। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ। উ-আ বলে কাতরায় ঘরে। পিসিমা বলছিল সব, আর আমি শুনছিলাম।

কমলেশ শুনতে শুনতে ভাবল, পটল কি সব বোঝে? না শোনামাত্র

সবকিছু ওর মাথায় ছাপা হয়ে যায় ? পরিপক্ব ? না শ্রুতিধর ? কোনটা ?

খুকু কমলেশকে বলল, তোমার এভাবে বসে বসে গল্প শুনলে চলবে ?

দাঁড়াও না। সেই বদ্ধ পাগলবাবুর কথাটাই পটল এখনও বলতে পারেনি। শুনে যাই।

হ্যাঁ মামাবাবু। আমার ওই এক দোষ। এ কথা থেকে সে কথায় চলে যাই। কোনওটাই শেষ হয় না। আমি আবার এত ভুলো ছিলাম না কোনওদিন। কি যে হয়েছে আমার মা-আ-মি-মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।

খুকু সেলাই করতে করতে বলল, ডাক্তার দেখা। পেকে খয়ের হয়েছিস তো। দ্যাখ গে তোর আবার কৃমি বাড়ল কি না।

বাড়েনি তো। আগের মত তো গুড় খাই না আমি আর।

কমলেশ বলল, নে শেষ কর পটল। অনেক পাকামি হয়েছে। বড় হয়ে তুই আমার মত নোট লিখবি একদিন দেখিস। শেষটা বল। আমি গিয়ে লিখতে বসব। কমলেশ বলছিল আর বুঝতে পারছিল—পটল খুকুর কথায় অভিমান করারও ফুরসত পাচ্ছে না। ফাঁক পেলে ঠিক অভিমান করত।

পাগলাবাবু কি করে একদিন দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছে। ভোরবেলা। কেউ টের পায়নি। ছেলেরা সবাই ঘুমোচ্ছিল। বাবু বাজারের ব্যাগ নিয়ে আমাকে সঙ্গে যেতে বলল। আমি তখন আরও ছোট। সবে ভর্তি হয়েছি কাজে। রাস্তাঘাট চিনিনে। বাবু আগে। আমি পিছনে। মাছের বাজারে বাবু ঢুকেই বলল, ভাল দেখে কিছু পচা মাছ দাও তো।

মাছওলা ভাবলে, এ বুঝি বাবুর ঠাট্টা, সে দেখে দেখে একটা ভাল মাছ দিচ্ছিল। বাবু একটা একটা করে মাছ ধরে ছুঁড়তে লাগল। রেগেমেগে বলল, যত বাজে টাটকা মাছ গছাচ্ছিল। আমি বুঝিনে ভেবেছে ? ঐ তো পচা মাছ রয়েছে। দেখেশুনে দাও বলছি। খুব পচা দেখে দেবে। যা দাম লাগে দেব। বাজারে সে কি হুলস্থূল কাণ্ড। আমার তো ভিরমি খাওয়ার দশা।

কমলেশের চোখ খুকুর দিকে পড়ল। সেলাই কল ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে খুকু মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চোখে জল এসে গেছে। কোনওক্রমে খুকু বলছে—এ তুই কি শোনালি পটল, যত বাজে টাটকা মাছ। খুব পচা দেখে দেবে। উঃ। আর শোনা গেল না খুকুর গলা। হাসি ক্রমে মুখ বুজিয়ে দিল।

কমলেশ গম্ভীর গলায় বলল, বিষম খাবে খুকু। ভীষণ বিষম খাবে। ওভাবে শুয়ে পড়লে কেন ? ফিমার বোন তোমার ভাঙো ভাঙো। করছ কি ? সাবধানে ওঠো। দাঁড়াও ধরছি। মুট করে ভেঙে যাবে হাড়। ঘুণ ধরা হাড়।

কমলেশের গম্ভীর মুখ—অগোছালো ভাবে চিৎ হয়ে গড়াগড়ি খাওয়া খুকুকে দেখে ঘাবড়ে গেল সাবালক বালক। সে ছুটে গিয়ে খুকুর দু'হাত ধরল। সাবধানে ওঠো মামিমা। সাবধানে—তোমার না অসুখ। হাড় ভেঙে যাবে শেষে।

চিন্তিত কমলেশ আর পটলের সামনে পটলকে ধরেই উঠে বসল খুকু। উঠে গম্ভীর গলায় ধমকে উঠল, ছাড়। ছাড় বলছি। বাঁদর।

ঘাবড়ে গিয়ে নিজের দু'খানা হাত সরিয়ে নিল পটল। খুকু তখন খুব মন দিয়ে কুচি দেওয়ার ছোট মেসিনটা সেলাই কলের ছুঁচের নিচে বসাতে লাগল। কোনও কথা না বলে কমলেশ পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে টেবিলের ওপর খোলা খাতায় কলমের নিব টাচ করল।

হেম বা নলিনী এসবের কিছুই জানে না। তারা পটলের পায়ে পায়ে লেজ ডলতে এসে. পটলের পায়ের বেদম লাথি খেল।

এ বাড়ির বিজ্ঞান বা ইতিহাসের কোনও নিয়ম নেই। ডালিম কথা বলে কম। খায় আরও কম। খুকু অসুখটায় পড়ার পর থেকে সারা সংসারে আলতো করে চলাফেরা করে। কমলেশ সবচেয়ে ভোরে ওঠে। শোয় সবার শেষে। খায় সবচেয়ে বেশি। সবকিছুতেই স্বাদ পায়। সেনগুপ্ত মেডইজি তাকে কখনও অভাবে পড়তে দেয় না। হাতের টাকা ফুরিয়ে আসার মুখে মুখে বইপাড়া থেকে খবর আসে—আরেকটা এডিশন ফুরলো। তার নামের সঙ্গে জলপাইগুড়ি থেকে পুরুলিয়া—সব জায়গায় বইয়ের দোকানদাররা পরিচিত। সে জানে—তার শরীরটা আস্তে আস্তে পুরনো হয়ে আসছে। এ যেন এই পৃথিবীতে তাকে এক সময় বুড়ো হতে হবে—অথর্ব হওয়া কেমন জিনিস—তাও একদিন জানতে হবে। জীবন কেন ? কোত্থেকে এলাম ? কোথায় যাব ? আবার কি এখানে আসব ? এইসব কোশ্চেন তার মনে ইদানীং দেখা দিচ্ছে।

এইসব কোশ্চেনের মজা হল—একবার যদি মনে দেখা দেয় তো পৃথিবীর আর বাকি সব ঝঞ্ঝাট খুব সরল হয়ে ধরা পড়ে। কেননা মনটা তো উঁচু গাঁটে বাঁধা থাকে। তখন একতলার বা ফুটপাতের সবকি[illegible] পরিষ্কার দেখা যায়। যেমন—লোভ কিংবা কাম—না হয় স্নেহ অথব

ভালবাসা—ধরা যাক ঈর্ষা—সবই হাড়মাস সমেত বোঝা যায়। এসব বুঝতে পারছিল বলে কমলেশ সেনগুপ্ত এক-একদিন নিজের মনকে বলছিল—আবার কি বিশ-বাইশ থেকে জীবনটা শুরু করা যায়? সেই তখনকার অজ্ঞান জবরজং মনে জীবনজিজ্ঞাসা মানেই তো খানিকটা দলাপাকানো রহস্য—যা কিনা বাঁচার ইচ্ছে বাড়িয়ে দেয়—খুঁজে বেড়াবার মন তৈরি করে দেয়।

এ বছরের স্কুল ফাইনালের কোর্সে কিছু অদলবদল করে সিলেবাস কমিটি আর বোর্ড মিলে কয়েকটা কঠিন জিনিস ঢুকিয়েছে। বিশেষ করে ল্যাংগোয়েজ। বাংলা ইংরেজি দুটোতেই সেসব জিনিসের সরল সিধে আনসার সাজাচ্ছিল কমলেশ। সাজাতে সাজাতে চোখে পড়ল বারান্দায় লাইট জ্বালিয়ে পটল খুব মন দিয়ে স্লেটে নিজের নাম লেখার চেষ্টা করছে। পটল বিশ্বাস। ওর একটা ভাল নাম আছে। মনোরঞ্জন। সেটা লিখতে গেলেই চকখড়ি ভেঙে যায়। ডালিমের ইলেকট্রিক চড়, খুকুর ধৈর্য—এইসব পটলকে দিয়ে ওইটুকু লেখাতে পেরেছে।

হেম আর নলিনী লাথি খাবার পরেও আবার তাদের রিং মাস্টারের কাছে ফিরে গেছে। দুজনই কান ঝুলিয়ে জিভ মেলে দিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল—ওদের প্রভু কি করে নিজের নাম লেখেন স্লেটে।

লিখেই পটল খুকুর কাছে ছুটে গেল।—ও মামিমা—আ-আ, দ্যাখো তো, হয়েছে?

খুকু সেলাই কল থেকে মুখ না তুলেই বলল, দশবার লিখে নিয়ে আয়।

প্রথমবার হল কিনা দ্যাখো। বলে পটল স্লেটখানা খুকুর কোলের ওপর রাখল। রেখে মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

ও কি হচ্ছে পটল? উঠে বোস।

তু-উ-মি দ্যাখো না মা-আ-মি-মা-

গলার স্বর ফের সবু করছিস! এসব বাঁদরামো ভাল লাগে না। ছিলি হেলে চাষার ছেলে—রাতারাতি কি বিদ্যোসাগর হওয়া যায়। বলে স্লেটখানা সরিয়ে পটলের পিঠের ওপর রাখল খুকু।

স্লেট সামলে তড়াক করে উঠে বসল পটল। ওকথা বললে ফের মামিমা? হেলে চাষারাও পড়ে, জানো?

এইতো। দিব্যি টনটনে জ্ঞান। তা পড়তে বসে মাটিতে শুয়ে পড়িস কেন?

তোমার কাছাকাছি শুয়ে থাকতে ভাল লাগে।

শুয়ে পড়াশুনো হয় না পটল। উঠে বোসো।

কেন মা-আ-মি-মা-আ—

আঃ! ফের ওরকম গলা করলে মারব।

কেন?

খুকু সিধে পটলের চোখে তাকাল। এই তাকানো পাশের ঘরে লিখতে বসে কমলেশ সেনগুপ্তও দেখতে পেল। খুকুরও একটা ভাল নাম আছে। যেমন আছে ডালিমের। হায়ার সেকেন্ডারির সার্টিফিকেটে। পার্থসারথি। খুকুরটা হল গিয়ে অঞ্জনা। কমলেশের সঙ্গে বিয়ের আগে ছিল—অঞ্জনা দাশগুপ্ত। বিয়ের সময় নামটা শুনেই মনে হয়েছিল—কোনওদিন ফুরোবার নয়।

তা এখন মনোরঞ্জনের দিকে তাকানো অঞ্জনার চোখ দেখে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল কমলেশ সেনগুপ্ত। এরকম কাঁপুনি তার অন্তত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হয়নি।

পটল বিশ্বাসের খালি গা। বার তেরো বছরের শরীরে কিংবা বড় জোর চোদ্দ বছরের শরীরে শুধু একটা হাফপ্যান্ট। সেই তুলনায় সংসারে আলতো করে লেগে থাকা খুকুর গায়ে ছিমছাম ব্লাউজ, শাড়ি, কানে দুল। হাতে বালা। মুখে সামান্য করে পাউডার পাফ বোলানো। ঠোঁটেও ঠোঁটের জিনিস আলতো করে বোলানো। বড় করে সিঁদুর। তার ওপর মর্মভেদী চোখ বড় করে পটলের মুখে দিকে তাকিয়ে।

অস্বস্তি হচ্ছিল কমলেশের। এই পাশের ঘর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। তারই বিয়ে করা বউ। তারই ছেলের মা। এখন আর আলাদা করে দেখার জিনিস নয়। তবু পটলের জন্যে তাকে নোট লেখা থামিয়ে নিজের বউয়ের দিকে গোপনে তাকিয়ে থাকতে হল। এমন করে তাকিয়ে থাকায় অপমান লাগছিল কমলেশের। অথচ বুঝতে পারছিল—এজন্যে ও পৃথিবীতে কাউকে দায়ী করা যায় না।

এইটে কি তোর স্বাভাবিক গলা পটল? কাজে যখন ঢুকলি—তখন তো এমন গলায় কথা বলতিস নে।

পটল নিজের গলা শুনতে পায় না বলে আরও অবাক হয়ে আরও চোখ কুঁচকে খুকুকে বলল, আমার গোলা তো চেরকালই এমন মা-আ-মি-মা-আ—

গোলা কি রে? বল—গলা।

আমাদের গোলা যখন অপছন্দ তখন আর গলা বলে কি হবে?

কমলেশ বুঝতে পারল, খুকু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক ই হল। খুকু কড়া হবার চেষ্টা করতে করতে বলল, কাজ করতে কেছিস কাজের লোকের মত থাকবি। গলার স্বর বদলানো কেন বুঝিনে। ার তোর মত ছেলেকে লিখিয়ে পড়িয়েই বা লাভ কি? শেষে তো াই অবোধ বিশ্বাসের জমিজমা নাড়াচাড়া করে খাবি।

সে জন্যেই তো লেখাপড়া শিখছি।

সেলাই থামিয়ে খুকু ওর দিকে তাকাল।

কি রকম?

বাবা লেখাপড়া জানতো না বলে জ্যাঠারা ঠগায় তাকে। আমি লখাপড়া শিখে আগেভাগে দলিলগুলো পড়ে নেব।

পড়ে কি হবে তোর?

কেন? ওল যদি ঠগায়—আগে থাকতে পড়ে নিয়ে সাবধান হব।

ও বাবা! পেটে পেটে অ্যাতো। এখনও তো ডাগরটি হসনি। হলে চ হবি কে জানে।

গলার স্বর নিয়ে অস্বস্তিকর কথাগুলো অন্যদিকে মোড় নেওয়ার বচেয়ে স্বস্তি পেল কমলেশ। সে নিজেই একসময় পটলকে বলেছিল, লখতে শেখ—পড়তে শেখ। আমিই তোর আয়ের ব্যবস্থা করে দেব।

কি করে দেবে মামাবাবু?

তোর নাম দেব অভিজ্ঞ অধ্যাপক। তারপর তুই বাংলা গল্পগুলো াড়ে যা বুঝবি—তাই লিখে দিবি। স্কুল ফাইনালের বাংলা প্রোজের নোট ই বেরিয়ে যাবে তোর নামে। আমি একটু আধটু ঘষে মেজে দেব।

নোট বই বেরুলে কি হবে?

তখন একশো টাকার নোট গোছা গোছা পাবি।

খুকু বলেছিল, ওর লেখায় চলবে?

ভাল চলবে। কারণ, ও তো খুব বেশি বোঝে না। কিন্তু মনের াদ্দা জিনিসটি লিখে দিতে পারবে। তার পাশে অনেক ঘাঘু প্রফেসরের লখা গাব্বু খাবে।

কমলেশ নিজের মনকেই বলল, যাকে দিয়ে নোট লেখা, বলে লখাপড়া করতে বললাম সে শিখতে চায় দলিল পড়া। ভাল। তাও াল। কেন সে পটল থেকে থেকে খুকুকে মা-আ-মি-আ-মা বলে কাছে ায়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে—ঠিক বোঝা যায় না। আর তখনই একটা াজানা অস্বস্তি বুক অব্দি উঠে আসে তার। গান শোনার ঘরে যেতে

যেতে কমলেশ ডাকল—এই পটল রেকর্ড দে—রেকর্ড দে—মানে রেকর্ড চাপিয়ে পিনের ডগাটা জায়গামতো বসাও। পটল এখন তেত্রিশ আর পি এম চেনে। চেনে পঁয়তাল্লিশ আর পি এম। ভেলভেটের টুকরোয় তেল মাখিয়ে রেকর্ডের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলতে পারে।

পটল জানতে চাইল, কোন রেকর্ড দেব মামাবাবু? সেই—

ভালবাসার কথা ভালতো লাগে না—দেব?

না। সরস্বতী বাঈয়ের দুর্গা রাগের গানটা দে—

সেই যে বুড়ির ছবিওয়ালা—

বুড়ি কোথায় রে। মারাঠি মহিলা। মধ্যবয়সের ছবি—তোর মামিমার বয়সে তোলা। এখন তো আর বেঁচে নেই।

মধ্যবয়সী? সেটা কি জিনিস গো মামাবাবু? আবার মামিমার বয়সী বলছ? বেঁচে নেই? মরে গিয়ে গাইছে? শেষে ভূত হয়ে গাইছে?

কমলেশ হাল ছেড়ে দিল। এতগুলো কোশ্চেনের আনসার একসঙ্গে হয় না। সে মেডইজির শেষ দিকে সাজেশন দেয়। তাতে কোশ্চেনগুলোর থাকে আইদার অর। সে রেকর্ড চাপাবার আগে পটলকে বলল, ও গানটা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের। তখন তোর মামিমা জন্মায়নি।

তাহলে যে বললে মামিমার বয়সী?

এখন খুকুর যা বয়স সেই বয়সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সরস্বতী বাঈ রাণে ওই গানখানা গান। হিমাংশু রায়ের অচ্ছুৎকন্যায়। দেবীকারানী অশোককুমার ছিল ছবিটায়।

সব গুলিয়ে গেল পটলের। সে রেকর্ড চাপাতে চাপাতে বলল, এটা সিনেমার গান?

হুঁ। বাজারে আর রেকর্ড পাওয়া যায় না। অনেকদিন আগের তো।

তুমি আর মামিমা সিনেমা করলে পার।

পটলের একথা শেষ না হতেই পাশের ঘর থেকে খুকুর গলা ভেসে এল। একটি চড় কষাব। ফাজিল ছেলে—

ততক্ষণে রেকর্ড ঘুরতে শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে সরস্বতী বাঈয়ের গলা সারা ঘরবাড়ি ভরে ফেলছিল। শুয়ে থাকা কমলেশের মাথার নিচে বালিশ গছিয়ে দিচ্ছিল পটল। কমলেশ ঘন গলার গানের ভেতরেই বলল, ভাল গান শুনবি—ভাল বই পড়বি—দুপুরে গলিতে গুলি খেলতে না বেরিয়ে একটু ঘুমোলে পারিস। তাহলে তো শরীরটাও সারে তোর—একথাগুলো ডালিমকেও বলতে চায় কমলেশ। কিন্তু বলা হয়নি।

পটল কান খাড়া করে কমলেশের কথা সবটুকু শুনল। তারপর রীতিমত বিচক্ষণ গলায় বলল, আমি কি তোমার সম্পত্তি?

সটাং করে উঠে বসল কমলেশ। কি বললি? আবার বলতো—

আমি কি তোমার সম্পত্তি?

মানে?

যেমন মামিমা তোমার সম্পত্তি।

কথাটার ভেতরে কমলেশ অদৃশ্য একটা থাম ভেঙে পড়ার নিঃশব্দ শব্দ পেল। যা হয় না, যা হওয়া উচিতও নয়—ঠিক তাই এই সাবালক বালকটি পরের পর ঘটিয়ে যাচ্ছে—আনমনা, অন্যমনস্ক নদীর কঠিন ভঙ্গিতে।

রেকর্ডটা তুলে দে।

পটল তুলে দিল। কমলেশ জানতে চাইল, মামিমা তো মানুষ। তাকে সম্পত্তি বলছিস কেন?

তুমিই তো মামিমার মালিক। বলতে গিয়ে পটলের গলা নেমে এল। এ গলা ষড়যন্ত্রে লাগে। তুমি ইচ্ছে করলে মামিমার সঙ্গে থাকতে পার। আবার ইচ্ছে হলে পাশের ঘরে চলে যাও। ঘুমোও। তখনও তুমি মামিমার মালিক।

সে তো সব স্বামী-স্ত্রীর বেলাতেই খাটে।

না। খাটে না। আমার বাবা তো বোকা। তাই সে আমার মায়ের মালিক নয় মামাবাবু।

তোর মায়ের মালিক কে?

কেউ নয়। বরং বলতে পার—অবোধ বিশ্বাস যমুনা বিশ্বেসের সম্পত্তি।

বাঃ। কথার রাঁধুনি তো ভাল শিখেছিস।

এতো খুব সোজা কথা মামাবাবু। আমাদের তালদা গাঁ থেকে আমঝাড়ার লাট অব্দি সবাই জানে—আমার বাবা আমার মায়ের সম্পত্তি।

তুই কার সম্পত্তি পটল?

এখন পর্যন্ত কারও না। তবে মা যেখানে কাজে লাগাবে সেখানে লেগে যাব। মাইনেটা মায়ের। খাওয়াপরাটা আমার। এখানে একটু থেমে পটল খুব গম্ভীর হয়ে বলল, কোনও সম্পত্তি থাকলি বড় সুখ। নয়তো মনে খুব কোষ্টো।

আর কথা বাড়াতে ভয় হল কমলেশের, কোন কথা থেকে কোন কথা এসে পড়ে—কে বলতে পারে। তার চেয়ে গানে ডুবে যাওয়াই

ভাল। তাই পটলকে বলল, ওই রেকর্ডটাই আবার দে। দুর্গা রাগে সরস্বতী বাঈ রাগে। নাও ডুবতি—কী জোয়ার গলায়! কী টান!! নাক দিয়ে ঘানির সর্ষের তেল টানলে এমন খচ্ করে গিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে ঝাঁঝ পৌঁছে যায়!

॥ তিন ॥

খুকু খুব মন দিয়ে তার এক্সরে প্লেটখানা দেখছিল। জুলাইয়ের ভোরবেলা। বারান্দায় এসে পড়া আলোর উল্টোদিকে ধরে নিজের ডানদিককার ছবির আন্দাজ নিচ্ছিল। এক্সরে প্লেটে পাছার আভাস পাওয়া যায় না।। যা যায়—তা হল ভেতরকার হাড়। এই ফিমার বোন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। খুকুরও মনে হল হাড়খানার কয়েক জায়গা বেশ সরু হয়ে গেছে। এক্সরে তোলার টেকনিসিয়ান দেখেই বলেছিল—কালো প্যাচ পড়েছে।

কমলেশ জানতে চেয়েছিল, সে জিনিসটা কি ভাই? খারাপ কিছু? টেকনিসিয়ান বলেছিল, বিকেলে তো ডাক্তারবাবু লিখে দেবেন। তখন জানতে পারবেন।

বলুন না ভাই। কঠিন কিছু?

ডাক্তারবাবুই বলবেন। আপনাদের ফিজিসিয়ান সব দেখেশুনে পাকাপাকি তো বলবেনই।

তবু বলুন না ভাই।

হাড়ে ঘুণ ধরেছে—

বোন ক্যান্সার?

আরে না না। বোন টি বি হতে পারে। ইনফ্লেমেশন অব দ্য বোনম্যারো।

খুকু তখনও এক্সরে ঘর থেকে বেরোয়নি। বোধহয় নামতে কষ্ট হচ্ছিল টিন প্লেটের খাট থেকে। প্রথম ব্যথা শুরু হয় অল্প করে। তারপর তো প্রায় দশ দিন শয্যাশায়ী। এসব মে মাসের কথা। পাড়ার জি পি গোড়ায় শুধু পেনকিলার বড়ি খাওয়াচ্ছিল। তারপর এল হাড়ের ডাক্তার। সে এসেই বলল—ফিমার বোনের কাছাকাছি একখানা হাড় ওপরে উঠে গেছে। ডাক্তারবাবু খুকুকে কাত করে নিয়ে একদিকে পেছন—অন্যদিকে কোমর উল্টো জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, সেরে গেল। এবার ক'দিনের ভেতর ব্যথা কমে যাবে।

কোথায় ! ব্যথা আরও বাড়ল বরং। সেই সঙ্গে জ্বরও।

তখন বত্রিশ টাকার ডাক্তার। আবার চার প্রস্থ এক্সরে। সব দেখে শুনে ডাক্তার বলল, তাড়াতাড়ি ওঠা বসা করতে যাবেন না যেন। বাথরুমে বসার ব্যবস্থা পাল্টানো দরকার। এক কোর্সে ইঞ্জেকশন দিচ্ছি। দরকার হলে আবার একটা কোর্স দেব।

ব্যথা কমল। জ্বর গেল। কিন্তু আবার ব্যথা ফিরে আসে। জ্বরও বাদ যায় না। আবার এক কোর্স সুঁই ফোঁড়ানো—সাতদিন ধরে। কিছু কমে। কিছু ফিরে আসে। এভাবে চলতে চলতে নিজের সংসারেই খুকুর চলাফেরা আলতো হয়ে এল। সে সাবধানে হাঁটে। এক কাতে সাবধানে শোয়। বৃষ্টি বেশি হলে চান করে না। কমলেশের এতদিনকার বউ পুরনো হয়ে যাচ্ছিল—কোনওদিনই পুরোপুরি সারবে না—এমন একটা পোষা অসুখে সে বউ আবার দিনকে দিন নতুন হয়ে উঠতে লাগল। অ্যাতোই নতুন—যেন কালকে বিয়ে করে আনা বউ। তাইতো লাগে আজকাল কমলেশের। এই লাগা সে কিছুতেই জানতে দিতে চায় না খুকুকে। ডালিম বড় হয়ে উঠতে ছেলের দিকে চলে যাওয়া ভালবাসাকে কমলেশ আবার খুকুমুখী করে তুলতে পেরে গোপনে একটা তৃপ্তি পায় ইদানীং। লালচে ফুলতোলা ছাপা শাড়ি—তার সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ ; চান না করার মাথা—খুকুকে গ্রামার ট্রান্সশ্লেসন ঘাঁটা মেডইজি রাইটার কমলেশের চোখে পঁচিশ ছব্বিশ করে দিল।

জুলাইয়ের ভোরবেলা। হেম নলিনী—দুজনেই তাদের রিং মাস্টার পটলের পায়ে পায়ে ঘুরছিল। মানুষের লাথি ও তার ভঙ্গিমা বিষয়ে ওদের দু'বোনের গবেষণা কখনই থেমে থাকে না। মাস্টার পটলও উদাসচিত্তে ওদের গবেষণার জিনিস দিয়ে থাকে।

খুকু তার নিজের হাড়ের ছবি দেখে বুঝল ওখানটায় ঘুণ ধরেছে। এক্সরে প্লেট হাতে খুকুকে খুব মন দিয়ে দেখে যাচ্ছিল কমলেশ। তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই কমলেশ বলল, ব্যথা কমেনি ?

এ আমার সারার নয়। ইঞ্জেকশন দিলে ক'দিন একটু ভাল থাকি। তারপরেই আবার যে কে সেই।

আমি আজ অধীরকে আসতে বলেছি। ও খানিকবাদে এসে আকুপাংচার করবে।

কোনও লাভ হবে না। এ আমার সারার নয়।

অন্য জায়গায় হাড় হলে তা অপারেশন করা যেত খুকু।

ওখানেও যায়। কিন্তু কাটাছেঁড়া করে কোনও লাভ নেই।

আমি জানি আমি সারব না।

কমলেশ তখন মনে মনে বলে যাচ্ছিল—খুব স্বার্থপরভাবেই—যেন না সারে কোনওদিন। সারলেই তো তোমার বয়স বেড়ে যাবে। মুখে বলল, দ্যাখোই না আকুপাংচার করে। সেরেও যেতে পার। অনেকের তো সারছে—

অধীর দত্ত এখন একচল্লিশ। বেশ হাট্টাকাট্টা। নাকশালি করে ফিরে এসে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আকুপাংচার করছে। পসার পড়তির দিকে। অল্পদিন হল বিবাহিত। বউ স্কুলে পড়ায়। মানুষটি কমলেশকে বিশ্বাস করে। কমলেশেরও বেশ পরিস্কার লাগে অধীরকে। এরকম বিপ্লবী ব্যাকগ্রাউন্ডের দেশকর্মীরা স্বাধীনতার পর কয়লার দোকান দিয়ে গৃহপালিত হয়ে যেত।

বেলা নটায় অধীর এসে বলল, অ্যালোপ্যাথিতে আপনি পুরো সারবেন না বৌদি। দুখানা হাড় মুখোমুখি থাকে ফিমার হাড়ের। তাদের মাঝের মবিল শুকিয়ে গিয়ে হাড়ে হাড়ে ঘসাঘসি হচ্ছে। তাই যন্ত্রণা পাচ্ছেন। অ্যালোপ্যাথি ব্যথা কমাবে পেনকিলার দিয়ে। আকুপাংচারে এমন সেনসেশন ঢেউ শুকনো জায়গা দিয়ে বসে যাবে—যাতে কিনা আবার আপনি হাড়ের জোরে মবিল ফিরে পাবেন। নিন—উপযুক্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন। বড়ি স্টিফ করবেন না।

লাগবে না তো?

টেরও পাবে না বৌদি।

ছুঁচগুলো পাছার জায়গায় জায়গায় ফুটিয়ে দিয়ে অধীর কমলেশের ঘরে এসে টেবিলের উল্টোদিকে বসল। এই টেবিলে কমলেশ সেনগুপ্ত খায়, লেখে, পড়ে, আবার বই ঘাঁটে। অধীর বলল, বেশি ফোটাইনি। মাত্র চারটে নিডল্। বৌদির হাড়ের ভেতর একটু সেনসেশন—মানে অদৃশ্য একটা ঢেউ নামিয়ে দিতে পারলে—

কি করে নামাবে?

সেকেন্ডে একশো কুড়িটা ঢেউ ওঠে। নিডলটা সামান্য নাড়িয়ে দিলে ঢেউগুলো জোরালো হয়। পেশেন্ট টের পাবে—তার গা দিয়ে ঢেউ নামছে। তাহলেই অসাড় ঢেউগুলো আবার বেঁচে উঠবে।

অধীরের কথা শুনছিল—আর খোলা দরজা দিয়ে উপুড় হয়ে শোওয়া খুকুর প্রায় সবটাই খোলা পেছনের ঢেউ দেখতে পাচ্ছিল কমলেশ। এ দৃশ্য যদি অধীরের শরীর খারাপ করে দেয়! আসলে অধীর তো অল্পদিন

রোগী দেখাদেখি করছে। বিয়েও করেছে এই সেদিন মাত্র। আমাদের মত পাকাপোক্ত স্বামীও নয় এখনও। আর ওভাবে উপুড় হয়ে শুলে কোনও মহিলার পেছনটা না ঢেউ হয়ে ওঠে। অধীর চলে গেলে খুকুকে বলতে হবে—ছুঁচ ফোটাবার পর শাড়িটা জায়গামত রাখবে। বলা তো যায় না—সবাই মানুষ, কার কখন কি হয়ে যায়—আগে বোঝা যায় না।

এই সময় পটল উপুড় খুকুর কনুই ধরে বলল, মা-আ-মি-মা-মা-খুব লাগছে ?

নিড্ল শরীরের ভেতর গিয়ে খুকুকে সাময়িক আরাম দিচ্ছিল। কিন্তু পটল যেই গলা সরু করে জানতে চাইল, অমনি সে চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল। ছুঁচ ফুটিয়েছে—লাগবে না ? তোর কি কোনও কাজ নেই ?

তোমায় দেখতে এলাম। ছুঁচ ফুটিয়ে পড়ে আছ—দেখব না ? দেখতে এলাম কথাটা খুব ভাল লাগল খুকুর। যেন শিউলিগাছের নিচে ভোরবেলা অনেক ফুল পড়ে আছে। সাজি হাতে কারও আসবার কথা। মুখে বলল, হ্যারে পটল, একটু চা করবি ?

মালতী মাসিকে বলি ?

না। ডালিমের কলেজের রান্না নামেনি এখনও। তুই করে নিয়ে আয়। তোর হাতের চা সবচেয়ে ভাল হয়।

কমলেশ দেখতে পেল—ডবল দমে পটল লাফাতে লাফাতে চা করতে গেল। তেমনি স্পিডে খুকুর কাছে ফিরে গিয়ে পটল জানতে চাইল, মামাবাবুর জন্যেও করি ?

হুঁ। অধীর ঠাকুরপোর জন্যেও করবি।

ওই ডাক্তারবাবু তো ?

হুঁ। আর শোন পটল—হেম-নলিনী তোর ভাই আলুর মতই নোংরা মুখে তুলছে। জল ঢেলে দে—তাহলে আর খেতে পারবে না।

দিচ্ছি।

অধীর চা খেয়ে চলে গেল। বড়জোর মিনিট দশেকের চিকিৎসা। কমলেশ দেখল, খুকু উঠে বসে নিজেকে গোছালো করছে। কাপড়-চোপড়ের জায়গায়। পাশেই খালি কাপ। চায়ের পর ইদানীং খুকু এক খিলি পান খায়। সেই খিলিটা পটল মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছিল। খুকু বেঁকে উঠল, মুখে দিয়ে দেওয়া কেন ? যত্ত খারাপ অভ্যেস—

খারাপ ? কেন মা-মি-মা-আ—

কথা বলছিল আর চিবুকটা পটল অজান্তেই খুকুর উরুতে রাখছিল।

একটা হাত খুকুর পায়ে। মুখখানা ওপরে তোলা। চোখজোড়াও তাই।

খুকু ঝাঁঝিয়ে উঠল। ওকি ? গলা অমন কেন আবার ? মামাবাবুকে ডাকব কিন্তু। কথায় কথায় পায়ে হাত দেওয়া কেন ?

পান মুখে দিয়ে দিলে কি হয় মা-আ-মি-আ—

মৃত্যুর সময় দেখা হয় না। নে—সরে বোস।

কমলেশ সব শুনতে পাচ্ছিল। তালদা গাঁ থেকে ক্যানিং। সেখান থেকে লেকমার্কেট। তারপর এখানে। মাঝে যাত্রা আর জোকার পিসতুতো দাদা। এই যার ইতিহাস—সে কি করে নিজের ভেতরের ঢেউগুলো ঢাকবে। সে জন্যে যেটুকু লুকোচুরির পালিশ দরকার তার কোনও টেনিংই রিংমাস্টার পটল যায়নি। খুকু উঠে বসতে চাইছিল। পারছিল না। হয়তো ফিমার বোনে ব্যথা বেড়েছে। কিংবা পটল চিবুক চেপে রেখে উঠতে দিচ্ছিল না। বিলের মাঝখানে আধডোবা নীল সরস্বতী—বসে পড়া খুকুকে তাই তো লাগল কমলেশের। একদম ভাঙা ভাসানের ভঙ্গি।

খুকু জোর করে উঠে দাঁড়াল, স্যান্ডেল খুঁজে দে বলছি।

জানি না বললাম তো।

কমলেশ পর্দা তুলে পাশের ঘরে ঢুলে। এসব কি হচ্ছে পটল ? স্যান্ডেল লুকিয়ে রেখে কি ইয়ার্কি হচ্ছে।

আমি জানি না—বললাম তো।

কাছে আয়। একটা চড় দিচ্ছি। এখুনি স্যান্ডেল বেরিয়ে আসবে।

খুকু বলল, আশকারা পেয়ে পেয়ে ছেলেটা গোল্লায় গেল। নে—স্যান্ডেলটা বের করে দে—

গেছো বাঁদরের ধারা লিকলিকে শরীরটা খাটের নিচে নিচে গেল পটল। তারপর গুচ্ছের জমা জঞ্জালের ভেতর থেকে স্যান্ডেল বের করে দিল খুকুকে। শেষে তুমিও মা-মি-ই-মা-আ—

হয়েছে। আর চোখে জল আনতে হবে না। যাত্রা পার্টিতে নাম লেখা গিয়ে।

স্যান্ডেল আমি লুকোইনি। হ্যামনলিনী খাটের নিচে নিয়ে গেছে দাঁতে পরে।

ওদের নামে আর মিথ্যে বলিস নে। ওরা তো কথা বলতে পারে না।

নিজেদের নাম শুনে ওরা দুজন লেজ তুলে মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের রিংমাস্টার একলাইনে দুজনকে পেয়ে লাথি কষলো।

কমলেশ চেঁচিয়ে উঠল। হচ্ছে কি ? নিজে বাঁদরামি করে ওদের

ারছিস কেন? যা—নাম সই করাটা শেখ গিয়ে। লিখে দিয়েছি—ওটা দেখে দেখে তিরিশবার মকসো করবি।

গোঁজ খেয়ে দাঁড়াল পটল। আমার হয় না। হবে না—

তা কি হবে! বললাম, পড়তে লিখতে শেখ। পড়ার নেশা হয়ে গেলে ভাল ভাল বই পড়াব তোকে। তারপর একদিন নোটমেকার হবি। তখন নাম নিবি—এক্সপিরিয়েন্সড্ প্রফেসার। চাই কি তোর নামে নোট বাজার কবজা করে ফেলবে। তখন—

তখন কি হবে মামাবাবু?

কমলেশ দেখল, পটল তার একটু আগের অপমান বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুন কোনও কাজে ডুবতে চাইছে। কমলেশ বলল, টাকা রাখার জায়গা পাবি না। কষ্ট করে পড়তে শিখে নিলে আমি নিজে তোকে নোট লেখা শিখিয়ে দেব। কিছু কঠিন না। তখন দেখবি তোদের আর অভাব থাকবে না। বছর বছর জমি কিনবি।

খুকু ঝাঁঝিয়ে উঠল, রাখ তো তুমি। পটল লিখবে নোট, তাহলেই হয়েছে।

এ কথায় পটলের চোখ ছলছল করে এল আবার। চোখ আর ঠোঁট গেল কুঁচকে। এ দিনই সন্ধেবেলা পটল হেম-নলিনীকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে বলল, আমি কিন্তু পিসিমার ওখানে যাব। আজ রাতটা থাকব ওখানে।

কি ব্যাপার?

আমার পিসতুতো দাদার বৌভাত আজ।

খুকু অবাক হয়ে বলল, এই না সেদিন তার বউ পালাল।

হুঁ। তাই বলে কি আর বে করবে না? দ্যাখো তো মামাবাবু। তোমার বউয়ের যুক্তিটা বোঝ একবার।

খুকু এতটুকু ছেলের মুখে অমন ফোড়ন শুনে গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, সেই যে বলেছিলি—সারা গায়ে ব্যান্ডেজ। সার্কাসে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে একেবারে দ।

এখনও ঠিকমত হাঁটতে পারে না। চিঁ চিঁ করে একটু আধটু। তাই বলে পুরুষমানুষ বে করবে না মামাবাবু?

পুরুষমানুষের অধিকার বা সুযোগ—কিংবা রীতি নিয়ে পটলের স্পষ্টাপষ্টি কথা কমলেশকে থ করে দিল। সে শুধু বলল, নিজের দাদার বৌভাত যখন—যাবি নিশ্চয়।

—মালতী সব শুনে বলল, তা হলে তোর চাল নিচ্ছি না কিন্তু।

খুকুর কিনে দেওয়া প্যান্ট, শার্ট, কেডস্ পরে রাত আটটা না বাজতেই পটল চলে গেল পঁয়তাল্লিশ নম্বরে। খুকু কমলেশকে চিন্তিত গলায় বলল, দাদাটি করে জোকারের চাকরি। তার হাত পা ভেঙে সার্কাসে নিশ্চয় কাজ নেই। এখন কি নতুন বউকে ঘরে বসে জোকারের খেলা দেখাবে। পেট ভরবে তাতে ?

কমলেশ বলল, সে ভাবনা কি তোমার।

রাত দশটা বাজতেই রিংমাস্টার পটল ফিরে এল। তাকে সন্ধেরাতে দেখতে না পেয়ে হেম নলিনী ঘুর ঘুর করছিল। দেখে তবে স্বস্তি—তাই লেজ আর মাথা মেঝেতে পেতে দিয়ে দুজনেই লম্বালম্বি চারফুল হল।

কিরে ফিরে এলি যে বড়। থাকলি না রাতে ?

কমলেশের এ কথায় পটল বলল, নাঃ। থাকলুম না। চলে এলাম।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বলেই খুকু জানতে চাইল, বউ কেমন হল ?

দাঁত উঁচু।

তা তোর দাদা তো ভাঙাচোরা, তার চেয়ে ভাল কি হবে !

খুব বিচ্ছিরি দেখতে। আমি খাইনি।

বিচ্ছিরি বলে খাসনি !

না। খাবারও বিচ্ছিরি। পচা চাল। আর খুব ঝগড়া হচ্ছে ছাঁদনাতলায়। মেয়ের বাবা বলে কি—ছেলে এত বুড়ো তা আগে জানাওনি কেন ?

খুকু আর কমলেশ দুজনই আর রসিকতায় গেল না। হাজার হোক ছোট ছেলে। তাই খুকুই বলল, যা আছে খেয়ে নে—

কমলেশ সেনগুপ্ত সারাদিন তা না না করে কাটিয়ে দিয়ে অন্য কাজে গোঁজামিল দিলেও তার সাধালক্ষ্মী নোট বইয়ের ব্যাপারে কোনওরকম ঢিলে দেয় না সে। যখন ঢিলে দেবার তখন সে শরীরটাকে কোনওরকমে গান শোনার ঘরে নিয়ে গেল। তারপর হাঁক দেয়—ও পটল, একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে যা—

কখনও পটল এসে বলে, এই একতারার রেকর্ডটা দেব ?

দে। কিন্তু একবারের বেশি নয় কিন্তু।

রেকর্ডটায় একতারা আছে। আছে ক্লারিওনেট আর ভয়ঙ্কর তেভি

াকটি মেয়ের গলা। ফ্ল্যাপেও তার ছবি। পটল অন্য দিনের মত আঠারো ুলাই দুপুরেও তাই করল। দিনটা শনিবারের। কলেজ নেই কমলেশের। াই সব সময় কমলেশ গানের সুর ধরে ধরে নিজের ভেতরে নেমে াড়ার চেষ্টা করে। মামাবাবু, সেই গানটা কি?

দে কিন্তু বেশি নয় কিন্তু।

পঁয়তাল্লিশ ঘুর্ণীর ছোট্ট রেকর্ড গমগম করে বেজে উঠল। আস্তে াজা পটল। ডালিম রেগে যাবে।

ডালিমদা তো বেরিয়ে গেল। একটু আগে তৃষ্ণা দিদি এয়েছিল।

তৃষ্ণা নয়—কৃষ্ণা দিদি বলবি। কোথায় গেল?

আর কোথায়—সেই সিনেমায়—নুন শো।

ও কি কথার ছিরি। তুই তো শুধু শুধু মার খা সনা পটল।

গানটা শোন তো মামাবাবু।

গান ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে—

আদর সোহাগে কোলেতে বসায়ে—এ
খেলিয়াছ কত রঙের খেলা
খেলাটি ভাঙিলে ভাসালে নয়নজলে
আমারে ছাড়িয়ে গেলা—

কমলেশ সেনগুপ্ত গান শুনছিল আর রিংমাস্টার পটলের মুখখানা দেখছিল। বারো তের বছরের কিশোর মুখ। সেখানে এই গানের ছায়া পড়েছে। পটল গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে বলল, জানো মামাবাবু—এ গান বাজালেই ডালিমদা চেঁচায়—বন্ধ করলি পটল। গানটা ভাল না?

মানে বুঝিস?

খুব কষ্টের গান। এমনভাবে বলল পটল যেন নিজের চোখেই সে কষ্টকে দেখতে পাচ্ছে।

কষ্ট কাকে বলে?

এক রকমের পাখি মামাবাবু।

পটলের এ কথায় উঠে বসল কমলেশ। কি বললি?

এক রকমের পাখি মামাবাবু। যার কষ্ট হয়—সে শুধু দেখতে পায়। তার বুকের মধ্যে এ পাখি ফরফর করে ডানা ঝাপটায়।

উরি বাপস! তুই তো কবি হয়ে গেলি পটল। কথা বলতে বলতে কমলেশ বুঝল গানটা তার সমে ফিরে এসেছে।

ভালবাসার কথা ভাল তো লাগে না
ভালবাসিব না আর—
খেলাটি ভাঙিলে ভাসালে নয়নজলে—

পটল, মুখখানা নিচু করল। উঠে বসা কমলেশ তার চোখ দেখতে পেল না। পটলের চোখে জল এলে ও সাধারণত গোঁজ হয়ে মুখ নিচু করে। আরেকখানা রেকর্ড বাজাবার সময় পেল না কমলেশ। অধীর এসে হাজির। বৌদি কোথায় ?

পাশের ঘরে শুয়ে আছে। এতে কি সারবে অধীর ?

কত পেশেন্ট কিওর হয়ে গেল। ধৈর্য ধরে কয়েকটা সিটিং দিন না বৌদি।

পটল অধীরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ওঠ মামিমা। তোমার ডাক্তারবাবু এসেছে—

খুকু ভ্রূ কুঁচকে উঠে বসল। আবার তুই বাজে গানটা বাজাচ্ছিস বারণ করেছে না ডালিম কতবার ?

খারাপ কেন মা-মি-মা-আ—

একটা চড় খাবি। একি তোদের বয়সের গান ! বলতে বলতে খুকু উপুড় হল। কোমরের কাপড় আলগা দিয়ে নামিয়ে দিল খানিকটা।

সেখানে তাকিয়ে পটল আমঝাড়ার খেয়াঘাটের নৌকো দেখতে পেল চোখের সামনে। গাবের আঠা মাখিয়ে রোদে দেওয়া হয়েছে উল্টো করে।

দেখি বৌদি—কাপড়টা আরেকটু নামান। স্টিফ হবেন না। আজ আরও দুটো নিডল্ বেশি ফোটাব। যদি টের পান—কোনও একটা সাড় ইলেকট্রিকের মত গা দিয়ে নিচের দিকে নামছে—তাহলে বুঝবেন অ্যাকশন হল। সায়ার দড়িটা খুলেছেন ?

হুঁ। বলেই দরজায় দাঁড়ানো পটলকে দেখতে পেল খুকু। তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস। যা ! ও ঘরে যা। তোর কি কোনও কাজ নেই পটল ?

ডাক্তারবাবুর যদি কিছু লাগে—

কিচ্ছু লাগবে না তুই যা বলছি।

সে রাতেই পটল স্বপ্ন দেখল। খেয়ায় করে সে মাতলা পার হচ্ছে। নামবে আমঝাড়ায়। নদীর চেহারা ভাল নয়। খেয়ায় মোটে সে একজন। আর মাঝি। নদীর মাঝ বরাবর এসে দেখল, নৌকোর পাশাপাশি একটা বড় মাছ ভাসছে—ডুবছে। হাতে প্রায় ছোঁয়া যায়।

ছুঁতে গিয়ে পটলের হাতে যা ঠেকল, তাতে সে আঁতকে উঠল। মা-মি-মা-গো—

তার নিজের গলার কান্না গিয়ে মেঘঝোলা নিচু আকাশে বিঁধে গেল। পটল জানে, মাতলায় এমন আচমকা মেঘ করে আসে। কিন্তু তুমি কখন ডুবলে মা-মি-মা-আ। এত্খোন আমি তোমায় মহাশোল ভেবেচি। কখন ডুবলে ? কোতায় যাচ্ছিলে নৌকো করে ? মামাবাবু কোথায় ? ডালিমদা ?

নৌকোর কানাতে ঝুঁকে পড়ে এক হাতে পটল ভাসা মামিমাকে ধরতে গেল। ধরেছিল প্রায়। পিছলে ভেসে গেল। মুখখানায় জলে ডোবার কোন দাগই পড়েনি এখনও। যেন ঘুমুচ্ছে। তাহলে বেঁচে আছে ? মা-মি-মা গো-ও। ছপ করে খাবলে ধরল পটল। মেঘ চারদিক অন্ধকার করে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি।

পটলের হাতে একটা লেজ উঠে এল। চমকে ধরে সে অবাক। তুইও ডুবেচিস হেম ? নলিনী কোথায় ? সবাই মিলে কোতায় যাচ্ছিলি ?

হেমকে ফেলে দিল পটল। চাষীরা তখন বেশ দূরে ভেসে চলে যাচ্ছিল। মাঝিভাই, একটু ওদিকটায় ঘোরাবে নৌকোটা। অল্পক্ষুণের জন্যি ?

উহু। ওদিকে খোলা স্রোত। খেয়া সামনালো যাবে না শেষে—আকাশ দেখিছো ?

পটল দেখতে পেল মা-মি-মা ভেসেই চলে যাচ্ছে—বড় নদীর দিকে। সে ঝাঁপ দেবে বলে উঠে দাঁড়াল।

কর কি ? কর কি ? বলে হাত শক্ত করে বুকের কাছে এনে ফেলল মাঝি। ততক্ষণে ঝাঁপ দেবে বলে হাঁটু ভাঁজ করে ফেলেছে পটল। ভীষণভাবে নৌকো দুলে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল পটলের। অন্ধকার মেঝে। অন্ধকার ঘর। খোলা দরজার সামনে দুটি আলাদা আলাদা ঘট হয়ে হেম আর নলিনী বসে না থাকলে পটল নিজেকে আকাশের নিচেই আছে বলে ঠাওরাতো। উঠে দাঁড়াল। সদর বন্ধ। মালতী মাসি ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুমুচ্ছে। দিনের বেলা এটাই কমলেশের বৈঠকখানা। বাইরের লোক এলে বসে।

বাকি সব ঘরের দরজা খোলা। ডালিমদা মশারি না টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছে। পাশবালিশটা টেনে ঠিক করে দিল পটল। মামাবাবু তার ঘরে নেটের মশারির ভেতর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একা একা টেবিলল্যাম্পটা নেভাতে ভুলে গেছে। সামনে চশমা, কলম, সিগারেটের প্যাকেট, খাতা

কাগজ চাপা। মামিমার ঘরে ঢুকতে পটলের সাহস হল না। সে দিনের বেলাতেও মামিমা ঘুমিয়ে থাকলে ঘরে ঢোকে না। হঠাৎ জেগে উঠে তাকে দেখে যদি কিছু ভাবে। কি ভাবতে পারে—তা জানে না পটল। তবে একা ঘুমন্ত মামিমার ঘরে ঢুকলে তার বুক টিপ্‌টিপ্ করে। ঘুমে তোলা মুখখানা দুগ্‌গা ভাসানের ডুবন্ত মুখ লাগে পটলের।

নিজের বিছানায় জেগে থেকে পটল ভোর নিয়ে এল। ভোররাতে মামাবাবু ফুটপাতের দোকানে রোজকারমত চিনি ছাড়া চা খেতে গেল। ফিরেও এল। হেম-নলিনী বাড়ির সামনে অ্যা করে এল।

একটু বেলায় চা খেতে বসে খুকুর নজর গেল বারান্দায়। সে এই সময়টায় কমলেশের ঘরে বেড়াতে এসে চা খায় রোজ। একটু চিনি বেশি। এক কাপ ফুরিয়ে গেলে আরও আধ কাপ নেয়। খুকু দেখতে পেল পটল মাথা মুছছে। কি ব্যাপার ? এত সকালে চান করলি কেন ?

পটল মাথা মুছেই চলেছে। ডালিম পড়তে বসে জানলা দিয়ে দেখল, পটল কোনও কথা বলছে না। জবাব দিচ্ছিস না কেন মাকে ? একটা ইলেকট্রিক চড় দেব নাকি ?

কমলেশ বলে উঠল, একি ডালিম। ভোরবেলা একটা মানুষের মন খারাপ করে দেওয়া কেন ?

পাশের ঘরে থেকে ডালিম বলল, তুমিই ওর মাথাটি চিবিয়ে খেলে বাবা।

পটল কারও কথায় না গিয়ে ধীরেসুস্থে আয়নায় দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াল। তারপর সিধে কমলেশের চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ এখন— তোমার ডালিমদা মানুষটি কেমন!

কমলেশ ধমকে উঠল। ওকি মুখে মুখে কথা তোর। ডালিমদা তোর গুরুজন।

তা আমি কি বলছি মামাবাবু ?

বলাচ্ছি তোকে। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডালিম চড় তুলেছিল। কিন্তু কমলেশ গিয়ে আটকে দিল।

খুকু ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রেখে বলল, বাধা দিলে কেন ? মারাই উচিত ছিল। হেম-নলিনীর গায়ে পোকা থিকথিক করছে। ও দুটো শুকিয়ে যাচ্ছে পোকার কামড়ে। আমিও পড়ে আছি। দেখা হয় না। ওদের গায়ে বোটকা গন্ধ হয়েছে। ডগসোপ দিয়ে চান করানোর কথা। আর নিজে সাত সকালে চান করে এলে। পোকা বাছে না হেম নলিনীর।

চান করায় না—

বলিছি তো আমি পারব না। আমার ঘিন্না করে।

এ এমন কি কঠিন কাজ পটল? ইচ্ছে করলেই তুই পারবি। এত ঘেন্না কিসের?

কমলেশের ও-কথার পিঠে খুকু বলল, হেম-নলিনী বাবদ মাসে মাসে বাড়তি টাকা নিতে তো ঘেন্না করে না।

কেটে নাও।

ও। বলে খুকু চুপ করে গেল। তারপর ধমকে বলল, সাত সকালে চান করলি কেন—সে কথা তো বললি না।

আমি দেশে যাব।

কবে?

এখুনি।

যাব বললেই তো হুট করে যাওয়া যায় না।

খুকুর এ কথায় পটল ছোট করে করে বলল, আমি যাব।

সেইজন্যে চান করেছিস?

হুঁ।

এখন গিয়ে কি করবি? তোর বাবা তোকে আবার ধান রোয়ার কাজে লাগিয়ে দেবে। শেষে একখানা কাঠ হয়ে ফিরে আসবি।

আমি যাব। স্বপ্ন দেখেছি কাল রাতে—

॥ চার ॥

এক ঘণ্টার ভেতর পটল রওনা হয়ে গেল। সকাল আটটা ছাপ্পান্নর ট্রেন ধরে ক্যানিং গিয়ে নামবে। তারপর খেয়ায় মাতলা পেরিয়ে আমঝাড়ার ঘাট। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে আরও ঘণ্টাখানেক। তা এগারোটা হয়ে যাবে। এই দশদিনের কোনও মায়না পাবে না—এই কড়ারে ছুটি নিল পটল। দশদিনের মাথায় ফিরে আসবে। যাবার সময় সবাইকে প্রণাম করল। এমন কি ডালিমকেও। দাও দাদাবাবু—তোমার পা দুখানা দাও।

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ কিন্তু পটল।

প্রণাম করে একমুখ হেসে উঠে দাঁড়াল পটল। বল—কি চুরি করিছি তোমাদের?

কমলেশ ছিল কাছেই। সে বলল, শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছিস কেন?

এখন যাবার সময় ভাল মন নিয়ে যা।

পটল কমলেশের দিকে তাকাল। দু'খানা পোস্টকার্ডে তোমার ঠিকানা লিখে দিয়েছ তো?

হুঁ। পারলে চিঠি দিস। ডাকঘর আছে তো তোদের তালদায়? তোর ব্যাগে পোস্টকার্ড ভরে দিয়েছি।

দু মাইল হেঁটে গিয়ে মোল্লাদের হাটে একটা লাল ডাকবাক্স আছে। ওখানে হাট বসে। মা চাল বেচতে যায়। দরকারে আমরা হাঁস কিনে নিয়ে ফিরি মামাবাবু।

লাল ডাকবাক্স তো আছে। পরিষ্কার করে তো পিওন?

সাত দিনে একবার। তুমি জবাব দিও। মা-মি-মা-আ- তুমিও জবাবে এক লাইন লিখে দিও।

দশ দিনের মাথায় তো ঘুরে আসবি। জবাব দিলে তো পাবি না।

তবু এক লাইন লিখ।

তুই কি লিখিস দেখি আগে। কোনও ভাষাই তো জানিসনে—

কমলেশ সেনগুপ্ত সত্যিই অনেকদিন পরে রেগে উঠল। এখন রওনা হচ্ছে, দুটো ভাল কথা বলতে পার না।

ভাল কথা যারা বলছে—এই যে তেনারা এসেছেন। এ ম্যা। কী বোটকা গন্ধ!

রিং মাস্টারি চালে পটল ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে। বাইরের লোক প্রথম দেখে ভাবতে পারে— একজন মন্ত্রধর বালক দুজন কুকুরের মাথায় হাত রেখে তুক্ করছে।

প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজে, পায়ে কেড্স পিঠে ব্যাগ নিয়ে বাবুর বাড়ির ছেলের কায়দায় পটল হাসতে হাসতে রওনা হয়ে গেল। ডালিম সেনগুপ্ত সদর দরজা বন্ধ করে হেম নলিনীকে ভেতরে নিয়ে এল। বাবাই ওর মাথাটি খেল! যদি আর না ফেরে। সব জামাকাপড় নিয়ে গেল গুছিয়ে। তারপর মাস মাইনেও তো পরিষ্কার করে দিলে।

পটল একজন স্বাধীন লোক। এটা ভুলে যেও না ডালিম।

বেলা সাড়ে দশটায় মাতলার লঞ্চঘাটায় মনোহারি দোকানগুলোর গায়ে পটল দর করে আলুর জন্যে প্যান্ট জামা কিনল। কচির জন্যে রুপোলী হাতঘড়ি। আর সিমের জন্যে সোনালী দুল একজোড়া। তারপর খেয়ায় উঠে মাঝির কাছাকাছি পাটাতনে লেপটে বসে জলের দিকে সাবধানে তাকাল। সত্যিই কি আর মামিমা ভেসে যাচ্ছে। তা কি কখনও হয়।

একবার যেন শুনেছিল—পরের কিছু খারাপ দেখলে—নিজের দিয়ে হয়। তা মামিমা তো আর পর নয়। শ্লেটে আমায় আমায় নাম লেখা শিখিয়েছে। পটল বিশ্বাস। গায়ের এই জামা প্যান্ট মামিমা সুস্থ থাকতে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পছন্দ করে কিনে দিয়েছে। স্বপ্ন দেখা একটা বাই হয়ে দাঁড়াল শেষে। মোল্লাদের হাটে গিয়ে হাট বারে একটা জোরালো তাবিজ কিনবে ঠিক করল।

পটল বেলা বারোটা নাগাদ তালদা গাঁয়ে পৌঁছে দেখল তার ছোট ভাই আলু হাঁটতে শিখেছে। ওলদাদাকে নিয়ে বাবা ডাঙামত একটা তেকোনা জায়গা বুইচে। সিমের হাতে বীজের গোছা। বাকি জমির রোয়া প্রায় শেষ। এক জোড়া পাতিহাঁসের ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে ল্যাংটো কচু বসে আছে উঁচু ঢিপিতে। হাঁস এই সময় ছাড়া থাকলে জমিতে নেমে সদ্য রোয়া ধান তুলে তার বীজটুকু খেয়ে ফেলে।

জমির বাঁধারে বিশ্বাসদের শরিকানী দীঘির জল এখন ওথলানো দশা। আর দু একটা বৃষ্টি পেলে দীঘি ভাসবে। পটলের মনে হল, এখুনি কই উঠে এসে উঠোনে নাচে হয়তো।

রোজগেরে পটলকে ঘিরে বসার জন্যে ওলকে নিয়ে অবোধ বিশ্বাস মাঠ থেকে উঠে এল। যমুনা দীঘিতে ডুব দিয়ে দিয়ে শাপলা তুলছিল। আর তুলছিল ভ্যাটফল। ডালনা রাঁধবে ছেলেদের জন্যে। নালের গোড়ায় অনেক সময় জড়িয়ে সাপ থাকে। তাই সাবধানে তুলছিল। ওপর থেকে সিম চেঁচিয়ে বলল, ওমা উঠে আয়। কলকেতা থেকে মেজদা এয়েচে।

ওলকে বড়দা, পটলকে মেজদা এসব ডাক সিমকে নতুন শিখিয়েছে যমুনা। পটল এয়েচে! যাচ্ছি যা—

রোজগেরে ছেলের মা সে। তাই শাপলার বিড়ে ডানহাতে—কোঁচড়ে ভ্যাটফলের ঢিবি—পেছনের দাওয়া দিয়ে ঘরে ঢুকে মাথা মুছল যমুনা।

ভরপেট খেয়ে গড়াতে গিয়ে বিকেল পাঁচটায় ঘুম ভাঙল পটলের। ওরকমই বেজে থাকবে কেননা, দিনের আর বিশেষ কিছু বাকি ছিল না। দাওয়ায় খোলপে পাতা বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল ওলদাদা আর বাবা তখনও বুয়ে চলেছে। পটলকে উঠে বসতে দেখে অন্ধকার করে আসা বিকেলের ভেতর দিয়ে ওল উঠে এল। যতই এগিয়ে আসছিল ততই পটল দেখতে পাচ্ছিল ওলের মুখটা থমথমে ফোলা। রক্ত থানা দিয়েছে মুখে। মনে মনে পটল নিজেকে বলল, ভাগ্যিস এখন আর আমায় ও কাজ করতে হয় না। বাবার বর্গাচাষে গত বছর পটল

মাঝখানেক সঙ্গে ছিল। দম ছিঁড়ে যাবার জোগাড়।

তুই তো কলকেতায় থাকিস। তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

ওলের মুখে একথা শুনে পটল নিজের মুখখানা গম্ভীর করে ফেলল। কি ব্যাপার ?

ব্যাপার অনেকগুলো। একটাই বলি। কচু আর সিম মিলে সন্ধে সন্ধে বাদায় আঁটল পাতছে। আর ভোর রাতে বাদা ফর্সা করে তুলে আনছে। এক একদিন আঁটল বোঝাই হয়ে যায়।

এত মাছ হয়েছে বাদায় ? কি কি মাছ ?

ওল বলল, কই আছে, চ্যাঙ আছে, রুই মৃগেলও দু চারটে থাকবে। কিন্তু সবই কি খেয়ে ফেলতে হবে ?

নিজের বড় ভাইয়ের কথার ঝোঁকটা কোনদিকে—পটল ধরতে পারছিল না। তাই আন্দাজে বলল, কচুর না হয় অন্যকথা, কিন্তু সিম যদি মাছ একটু বেশি খায় সে তো ভালই। ওর শরীরটা আগের চেয়ে অনেক ফিরেছে। তবে আরও ফেরা দরকার। ওল সিধে পটলের চোখের জায়গায় তাকাল। মাঠ এই মাত্র অন্ধকার হয়ে গেছে। দুই ভাই কেউ কারও চোখ দেখতে পাচ্ছিল না। ওল বলল, মাছ হিসেব করে খেতে হবে তো।

আমরা হিসেব করে ধরলে বাকি মাছ তো পালিয়ে যাবে।

সেখানেই তো কথা। আমি বলছিলাম মাসে মাসে যদি টাকা পাঠাতে পারিস। লোক ঠিক করে একটা ডোবা মত কাটাই পেছনটায়। নালা কেটে বাদার সব মাছ ওখানে নিয়ে ফেলব। বচ্ছরকার মাছ জিয়ানো থাকবে তাহলে।

পটল মনে মনে তারিফ করল ওলকে। মামাবাবুর হয়ে সে বাজার করে। জিওল মাছের দর আগুন। মুখে বলল, সব টাকাই তো পাঠিয়ে দি। হেম-নলিনীকে দেখা বাবদ টাকাটার কথা একদম চেপে গেছে। একটু থেমে বলল, চল দাদা—আজ রাতে তুই আর আমি বাদায় আঁটল পাতি।

ওল গম্ভীর গলায় বলল, মাছ পড়বে। অনেকই পড়বে। কিন্তু তারপর ?

তারপর কি ?

অত মাছ ভেজে খাওয়ার তেল নেই। সব মাছ জিইয়ে রাখা যায় না। শেষে যে ফেলে দিতে হবে—

জ্যান্ত থাকতেই ছেড়ে দেব?

ওল বলল, একবার জখম মাছ মরে ভেসে উঠবেই। আসলে কি জানিস পটল মাছ হিসেব করে খেতে হবে।

পটল কিচ্ছু বলল না। সে মাছ ধরার আনন্দের ভেতর দাদা আর ছোটবেলাকে একসঙ্গে ফিরে পেতে চাইছিল।

গণ্ডগোল বাধল পরদিন ভোরবেলা।

পটলের টাকায় কেনা মুরগির ডিম তা দিয়ে ছানা তোলা হয়েছিল এগারোটা। চিল নিয়েছে তিনটি। খাটাস দুটো। তাও থাকার কথা দুটো। একটু বড় হতেই বাকি ছটার তিনটেকে বেচে দিয়েছে যমুনা।

পটল কেঁদে ফেলল, তুই বেচলি কেন মা! আরও ডাগর হত। পুজোর সময় বেচে দিয়ে বড় মাছ কিনতাম।

অবোধ বিশ্বাস এগিয়ে এসে বলল, সকালবেলায় কাঁদিসনে। আমি নিজি ডিমে তা দিয়ে রাখব। যমুনা ক্ষেপে গেল। তুমি নিজি ডিমের ওপর বসে তা দিও।

তুই মা বেচলি কেন ছানাগুলো? আরও ডাগর হত।

বেশ করিছি বেচিছি। ধান সেদ্ধ ধান ভানার বন্ধ নেই। সারাটা সংসার এতকাল খেতে তবে এতটা টেনে তুললাম আর এখন পেটের ছেলেকে কৈফিয়ত দেব?

যমুনার মুখটা দেখে পটলের মন খারাপ হয়ে গেল। ভাঙাচোরা কপাল ভর্তি ঘামাচি। বাড়ির মা হবে মামিমার মত। কথাটা ভাবতেই নিজের মায়ের জন্যে পটলের বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। সে আর মুরগির ছানার দিকে গেলই না। মোট এগারোটার ভেতর পড়ে আছে তিনটে। সে তিনটে বেশ বড় হয়েছে। দিব্যি দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের দিকেও তাকাল না।

সিম দুল পেয়ে খুশি। কচু আর আলু, শেষের জনকে কোলে নিয়ে ঘোরার কোনও দরকার নেই। তবু আলুকে কোলে নিল পটল। নিয়ে একবার উঠোনে একবার দাওয়ার পেছন দিকটায় জ্যাঠাদের ভিটেয় ঘুরে এল। জ্যাঠারা নেই। জ্যোঠিমা আছে। আছে জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা। তারা তিনচার ক্লাস পড়ে নাম সই করতে পারে—সেই সুবাদে ব্লক থেকে টাকা ধার পায়। শরিকানী দলিল পড়তে পারে বলে নিজেদের ভাগে শালি জমিটুকু টেনে নেয়। আমরা কি কোনওদিন নাম সই করতে পারব? ব্লকের ধার পাব? আমি না পারি—আলু হয়তো শিখবে।

বিকেলের দিকে পটল একা একা হেঁটে মোল্লাদের হাটে গেল। লাল ডাকবাক্সের গায়ে হাটের ধুলো জমেছে। একখানা পোস্টকার্ড তার পকেটে। কিন্তু কি লিখবে। ভেবে চিন্তে একটা দুটো লাইন পটল লিখতে পারত। এই যেমন—বাদায় চ্যাঙ ও কই ধরা পড়েছে। আলু এখন দিব্যি হাঁটে।

কিন্তু লিখে কি হবে। এর একটা কথাও তো মামিমা কিংবা ডালিমদা জানতে চায় না। এখানকার কথা মামাবাবু একটু আধটু যা জানতে চায়। পটল দরাদরি করে একটা হাঁস কিনল। বড় দেখে। তালদা ফিরতে ফিরতে রাত হল পটলের। কাঁধের হাঁসটা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে দেখে কচু ল্যাংটা অবস্থায় কুপি হাতে বেরিয়ে এল, মাংসু খাব। মাংসু হবে—

মাঠের ভেতর খালের গায়ে সারা বাড়ি জেগে উঠল। সন্ধে রাতের লণ্ড একদম। অবোধ দাওয়া থেকে নেমে এসে হাঁসটার ঘাড় মটকে দিয়ে বলল, রক্ত নষ্ট করতে নেই, সব ভেতরে থাকল।

এ অবস্থায় পালক সমেত জিনিসটা একটা মেটে হাঁড়িতে অল্পক্ষণ সেদ্ধ করে যমুনা ওলের হাতে সবটা তুলে দিল। ওল আর পটল মিলে গোড়াসমেত পটাপট পালক তুলতে লাগল। বড় দু ভাই জানে, হাঁসের গায়ের ময়লা চামড়ার নিচেও আসল তেল থাকে। তাই ওরা কিছুই নষ্ট করতে চায় না। মাটির বারান্দায় কাঠগোঁজা উনুন। তার পাশে বসে সিম বাটনা বেটে যাচ্ছে। পালক ছাড়ানো হাঁসটাকে এবারে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল অবোধ। ধান কাটার হেঁসোর ধারালো জায়গায় পাকস্থলীটাকে চেপে ধরে দু'টুকরো করল। মাংসের কিছুই ফেলবে না। হাঁসের পেটের শেষ কটা ভিজে ধান পাকস্থলী থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাসে ঢাকা অন্ধকার উঠোনে ছড়িয়ে দিল অবোধ।

ওরা খেয়ে শুতে শুতে রাত হয়ে গেল। অবোধ, ওল আর পটল শুয়ে পড়ল খোলা দাওয়ায়। শুয়ে শুয়েই পটল টের পাচ্ছিল—হাঁসের ছড়ানো পালকের গোড়ায় যদি কিছু মাংস থেকে থাকে এই আশায় খাটাস এসেছে—তার ভয়ে অন্য প্রাণীরা পালিয়ে যাচ্ছে। ঘাসগুলো এবার শিশিরে ভিজবে। খাটাস বিরক্তিতে গলা ছাড়ল। পটল প্যান্টের পাশ পকেটে বড় তাবিজটা মুঠো করে ধরল।

কমলেশ সেনগুপ্ত ঘুমোয় সবার শেষে। ঘুম থেকে ওঠে সবার আগে। পৌনে চারটেয় দিনের আলো ঢুকতে থাকে অন্ধকারের ভেতরে। তখন

আর কমলেশ শুয়ে থাকতে পারে না। চব্বিশ ঘণ্টার একটা দিন চিরকালের মত চলে গেল। কোনও আড়ম্বর ছাড়াই আরেকটা দিন আপনাআপনি শুরু হয়ে গেল। এদের মাঝখানে বছর বছর রিভাইজড্ মেডইজির জোগান দিয়ে যাওয়া—কী বাজে কী অর্ডিনারি—তা আর কমলেশের চেয়ে বেশি কে জানে।

খুকু বা ডালিম কারও ঘুম না ভাঙিয়ে সাবধানে সদর খুলে বাইরে থেকে হুড়কো আটকে দিল কমলেশ। পাছে হেম নলিনী বেরিয়ে যায়। ফুটপাতে অমূল্যর চায়ের দোকানে ধোঁয়া দিল সবে। ফুটপাত বেদখল করে দোকান। তাতে বুটি বিস্কুট থাকে কাঠের বাক্সে। কমলেশ বসতে বসতে রামবাবু এসে বসল। রাস্তার আলো তখনও নেভেনি। কি কমলেশবাবু ভাদ্রের আদিগঙ্গা তো জোয়ারের জল তুলে দিচ্ছে ঘরে। সেই মহালয়া অব্দি দেবে!

ঠিক তখন তালদা গাঁয়ে মাঠকোঠার দাওয়ায় ঘুমন্ত পটল পাশ পকেটের বড় তাবিজটা মুঠো করে ধরে উড়ছিল। যারা হাঁস বেচতে এসেছিল মোল্লাদের হাটে তাদের পাশেই বসেছিল পাখিরঅলার ওপাশ থেকে আসা লাক্ষবাগানের বড় মৌলবিসাহেব। চোখে সুরমা। মেহেদি লাগানো দাড়ি। মাথায় বাবরির ওপর ইস্ত্রি করা ফিনফিনে ফেজ বসানো। পটলকে দেখেই বলল, একটাই বড় তাবিজ আছে। নিয়ে যা আড়াই টাকায়। মনে মনে যা চাইবি তাই পেয়ে যাবি তাবিজ লাগিয়ে। গোসল করে পরিষ্কার হয়ে হাতে বাঁধিস।

পিসতুতো দাদা সার্কাসের তাঁবুতে সবাইকে হাসাচ্ছিল। বারুইপুর রাসমেলার মাঠে ঝেঁটিয়ে সবাই সার্কাস দেখতে এসেছে। বড় বড় লোহার বেড়া লাগিয়ে ঘেরাওয়ের ভেতর এই মাত্র এগারোটি বাঘ ছাড়া হল। হাতে চামড়ার চাবুক নিয়ে পটল নিজে দাঁড়াল। একটি ড্রামের ওপর ডান পা। বাঁ পা নিচে। চাবুক শূন্যে চালালে ফটাস মত ভয় দেখানো আওয়াজ হয়। আর একটা করে বাঘ পরপর সাজানো ড্রামের ওপর গিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে। শেষটা বসার পরেও দেখা গেল—পটলের হাতের চাবুকের ফটাসে একজন মানুষ ভয় পেয়ে চমকে গিয়ে গুটিগুটি শেষের পরের ড্রামটায় গিয়ে বাঘের মত হাত পা গুটিয়ে বসল। মুখেও বাঘের মত ভয় পাওয়ার ভঙ্গি। এক চোখ বুজে আরেক চোখে পটলকে দেখে নিয়ে নিচের ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চাটলো পটলের পিসতুতো দাদা।

আর সারা তাঁবু হাসিতে ভেঙে পড়ল। দমকা হাসিতে আসল

এগারোটা বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে ড্রাম থেকে নেমে এলোপাথাড়ি দৌড়দৌড়ি জুড়ে দিল। যদিও খাঁচার ভেতর—তাঁবুর বাইরের লোকজন তাই দেখে হাসি গিলে ফেলে ভয়ে দৌড়দৌড়ি জুড়ে দিল। তাঁবু ভাঙো ভাঙো। পটল চাবুক ফটাসফটাস করেও বাঘদের সামলাতে পারছে না। এমন সময় লোহার খাঁচার একটা বেড়ার জোড় খুলে গেল।

রামবাবুর পুরো নাম রামদাস গুহ। তিনি অমূল্যর চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে বলতে লাগলেন, আমি একা মানুষ। বে থা করিনি। তাই চলে যাচ্ছে। পাশেই এক স্বামী স্ত্রী থাকে। ছোট দেখেছিলাম। তা ওরাও ঠাকুর্দা ঠাকুমা হয়ে গেল। ওদের মাসকাবারি টাকা দিয়েছি। ওঁরা রেঁধে দেয়। তাই খাই। রাত হলে মশারি টাঙিয়ে ভেতরে বসে একা একটাই দু তিন দান পেসেন্স খেলি। তা এই ভাদ্র আশ্বিন দুটো মাস জোয়ারের জলের জন্যে বন্ধ রাখি। খাটের পায়া, পাড়ার রাস্তা, খাটাল—সব ডুবে থাকে ঘণ্টা ছয়। মশারি ভেতর দিয়ে দেখতে পাই—মাছ এসেছে—সাপ এসেছে। চলে গেলে পুট করে সুইচ টিপি। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি শেষ রাতে। ঘুমের ভেতর জল নেমে যায় তো আবার পরদিন সেই সন্ধে রাতে জল আসে। বিস্কুট নেবেন না কমলেশবাবু?

বাঘের খাঁচার জোড় খুলে যেতেই সেখানে তাকিয়ে পটলের চক্ষুস্থির। বড় বাঘটা তার পিসতুতো দাদার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। দাদা ঘাড় ছাড়াতে না পেরে চুপ করে বসে। তার ওপিঠে দাঁড়িয়ে যে কাঁদছে সে আর কেউ নয়—মামিমা।

পটল চেঁচিয়ে বলল, মামাবাবু কোথায়?

খুকু কেঁদে বলল, দেখতে পাচ্ছি না—

ডালিমদা?

ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তুই বাঁচা পটল।

কেঁদ না মা-মি-ই-মা-আ-। আমি যাচ্ছি। দাঁড়াও। নড়ো না কিন্তু—বলতে বলতে পটল তার নিজের ড্রামটায় দাঁড়িয়ে চামড়ার চাবুক তিনবার পর পর ফটাস করল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বাঘটা তার পিসতুতো দাদার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। আর অমনি পটল এক লাফে মামিমার কাছাকাছি চলে এল।

দিন দু'খানা বিস্কুট। ও অমূল্য খুরিগুলো জল দিয়ে ধুয়ে রাখলে পার। মাটি উঠে আসে মুখে। এসব কথা কলকাতার ফুটপানের চায়ের দোকানে বসে বলছিল কমলেশ সেনগুপ্ত। একই সময়ে সূর্য বেরোবার

ঠিক আগেকার আবছামত শেষ রাতে তালদা গাঁয়ের দাওয়ায় ঘুমন্ত পটল পাশ পকেটের বড় তাবিজটা আরও শক্ত করে মুঠো করে ফেলল।

রামদাস গুহ বললেন, কাল আদিগঙ্গার গায়ে এক অঘোরিবাবার ওখানে গেলাম। পরিবেশটা খুব ভাল লাগল। লোডশেডিংয়ের ভেতর বাবার সংস্কৃত গান বেশ খুলেছিল অন্ধকারে।

অঘোরপন্থী? তাও শহরের ভেতর? ওঁরা তো শুনেছি শ্মশানেমশানে থাকেন। এটা ওটা খান।

জানি কমলেশবাবু। আমরা বংশ পরম্পরায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। একবার বিজয়কৃষ্ণ ঠিক করলেন, আউল বাউলদের সাধনভজন জানবেন। তাই ওদের সঙ্গে মিশেও গেলেন। একদিন তো ওঁকে নাড়িভুঁড়ি দিয়ে ভাল ফুটিয়ে দিচ্ছিল এক বাউল চেলা। বিজয়কৃষ্ণ বললেন, না। ওসব আমি খাব কেন? ভগবানে পৌঁছতে এসব খাবার তো কোনও দরকার নেই।

খুকুর হাতখানা শক্ত করে ধরে আরেক হাতে লোহার বেড়ার জোড় ক্ল্যাম্প দিয়ে শক্ত করে জুড়ে ফেলল পটল।

খুকু চেঁচিয়ে উঠল, তোর পিসতুতো দাদা যে ভেতরে—বাঘগুলো একদম খেয়ে ফেলবে।

বাইরে চল তো মা-মি-ই-মা-আ। বাঘ আর দাদাকে খাবে না। জামার নিচে সারা গায়ে ব্যান্ডেজ যে—তার নিচে পচা ঘা—

তাই নাকি?

হুঁ, বাঘ কখনো পচা ঘা খায়? ওরা খাবে টাটকা রক্ত।

তা এই শরীরে ক্লাউন সেজেছে?

করবে কি! ঘরে যে নতুন বৌ। পয়সা নাগে না সংসারে? চল না মা-মি-মা-আ-

রামদাসবাবু, আমি তো শুনেছি অঘোরিবাবারা নরমাংস খান। কারণসিদ্ধ হয়ে ভৈরবীতে কাজে বসেন।

আমিও কিছু কিছু জানি কমলেশবাবু। শ্মশানেও আমি থেকেছি। বেনারসের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছি। ভৃগুও করেছি। এ জন্মে এখনও একটা দুটো ফ্যাকড়া বয়ে গেছে। তাই সংসার জীবন শেষ হচ্ছে না। তবে এই অঘোরিবাবা বোধহয় শেষ বয়সে সংসারী হয়েছেন। ছোট ছেলেটি সবে স্কুল ফাইনাল দেবে।

বাবার বয়স কত?

মুখে বললেন তো সত্তর বাহাত্তর। তবে চামড়া একটুও কোঁচকায়নি কাঁচা চেহারা, গলার স্বরটি মিঠে ঘেঁষা।

তাহলে তো রামবাবু একবার যেতে হচ্ছে। রিয়াল তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ- নয়তো চামড়া কোঁচকাতো।

আমায় নিয়ে গিয়েছিল কালীঘাটের অধর দত্ত।

একবার দেখতে ইচ্ছে করছে যে বাবাকে।

তা চলে যাবেন কমলেশবাবু।

একবার পরিবারকে দেখাতাম। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তো বলছে বো টি বি।

ভোরবেলা যমুনা দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখে পটল নেই। ও ে একটু শহুরে। একা একা জল সরতে বাগানে যাবার ছেলে নয় পটল ও পটল। কোথায় গেলি ?

অনেক নিচের থেকে আওয়াজ এল, ডাকিস কেন ? চান করছি

পুকুরঘাটে এসে যমুনা দেখল, ছেলের চান করা সারা। মাথা মু মাথাও আঁচড়েছে। বাঁ হাতে, সকালবেলার নতুন রোদে কি চকচক করছে কি বাঁধলি ?

নতুন তাবিজ।

কোথায় পেলি ?

কাল সন্ধেবেলা মোল্লাদের হাটে বড় মৌলবিসাহেবের কাছ থে কিনিছি। বলতে বলতে পটল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল। পা থাকলে দাও।

এত সকালে ? কোথায় যাবি বাবা ?

কলকাতায়।

এই যে বললি দশ দিনের ছুটির বাড়ায়ে এসেছিস। আজ সবে পাঁচ দিন। তাও তো দিনের শুরু।

যেতে হবে। পান্তা না থাকলে মুড়ির ছাতু দাও।

পান্তাই আছে। দিচ্ছি বাবা।

॥ পাঁচ ॥

লো চারটে নাগাদ ধুতি পাঞ্জাবি পরে কমলেশ সেনগুপ্ত আদিগঙ্গার দিকে চ্ছিল। পাশে পাশে পটল। ডালিম পইপই করে বারণ করেছিল। যেও বাবা। তোমার মত পরিশ্রমী লোক আধ্যাত্মিক ঘোল খেয়ে শেষে কেজো হয়ে যাবে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা জিনিসটা কিন্তু সুবিধের নয়। লস করে তোলে বাবা—

তোর মায়ের ব্যাপারটা একটু জেনে আসার ইচ্ছে আছে। আর টল তো সঙ্গেই আছে। কিছু হলে ছুটে এসে খবর দেবে। পারবি চা পটল ?

পটল ঘাড় নাড়ল। আজই দুপুরে সে ফিরে এসেছে। ডালিমের ারকাস্ট মিথ্যে হওয়ায় কমলেশ খুব খুশি। পটল ফিরতেই বাড়িতে ারগোল পড়ে গেল। মালতী সুবালা খুব একটা পছন্দ করে না পটলকে। বু মালতী জানতে চাইল, তাড়াতাড়ি ফিরলি যে বড়। সেখানকার ভাত াল লাগল না।

পটল খোঁটা কাটল। তোমার মুখখানা অনেক দিন দেখিনি তো। নটা তাই কেমন করে উঠল। তুমি যে আমায় খুব ভালবাস মালতী াসি।

দূর! তোকে ভালবাসতে যাব কেন শুধু শুধু।

খুকুর কানে সব যাচ্ছিল। তার শুধু মনে হল একজন ১২/১৩ ার অন্যজন ৬০/৬১। তবু ? আমাদের বাড়ির এই সামান্য কাজ নিয়ে ত রেষারেষি !

সুবালা কিছু বলল না। খুকু বলল, কুপি আলো, মাটির মেঝে, ড়ের চাল, কলাই থালায় মোটা চালের ভাত—এসব আর ভাল লাগে া—তাই না পটল ?

পটল ভাল করে খুকুর দিকে তাকালে। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর াস্তে বলল, হ্যাঁ মামিমা তাই। এবার তো শুনে সবাই খুশি হলে।

ডালিম কাছেই ছিল। সে তেড়ে এগিয়ে এল। এ কীভাবে কথা লছিস ? অ্যাঁ ? একটা ইলেকট্রিক চড় খাবি !

পটল বাঁ গাল এগিয়ে দিয়ে শান্ত মুখে বলল, দাও। যত জোরে ার দাও ডালিমদা।

ডালিমের আর হাত উঠল না। খুকু তার নিজের ছেলেকে বলল, কছু বলিসনে ডালিম। অপমান হবি খামোকা ! বাবার আসকারায় উনি

সত্যি একদিন নোটমেকার হবেন দেখছি।

কমলেশ কোনও কথা না বলেও বুঝতে পারছিল, পটলকে ডালিম বোঝে না। ডালিমকেও পটল বোঝে না।

কমলেশ জানে, মানুষকে না বোঝার জন্যেই পৃথিবীতে এত গোলমাল। রামদাসবাবু যেমন এই ভুল বোঝাবুঝির একটা শেষ টানার জন্যে জীবনের প্রায় পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে একটা জিনিসই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে জিনিসের নাম—মহাপুরুষ। পৃথিবীর একজন মহাপুরুষ চাই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি নিজে আসবেন। এসে খুকুর ব্যথার জায়গায় হাত দেবেন। অমনি সব ব্যথা সেরে যাবে।

মহাপুরুষ—বুঝলেন। কমলেশবাবু—একদিন হয় না। জন্মজন্মান্তরে একটু একটু করে উপলব্ধি জমা হয়ে তবে একটা জন্মে এসে জাতক মহাপুরুষ হয়।

এসব কথা হওয়ার সময় অমূল্যর চায়ের দোকানের গায়ে শেষ রাতের ইলেকট্রিক জলে। সারা কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে তখন। রামদাস গুহ এসব কথা বলেন—আর লেড়ো বিস্কুট দু হাতে গুঁড়ো করে দিশি বাংলা কুকুরগুলোকে দেন।

আমাদের দেশের গাঁয়ে সাজাহান নামে এক মুসলমান ল্যাংটো হয়ে ঘুরত। শ্মশানে। গোরস্থানে। মুসলমানরা ল্যাংটোর হিঁদুঘেঁষা ভাব দেখতে পারত না। হিঁদুরা মুসলমান ল্যাংটোর হিঁদুঘেঁষা ভাব পছন্দ করতো না। তাতে ল্যাংটো সাজাহানের কিছু যেত আসত না। সে যেখানে যা পেত খেত। কিছু না পেলে কিছু খাওয়া হত না তার। একদিন আমার ঠাকুমা বলল, সাজাহান, অভাবে পড়লে আমার এখানে এসে দুটি খেয়ে যেও।

সাজাহানের সঙ্গে ঠাকুমার ছমাস পরে দেখা। ও সাজাহান, তুমি তো একদিনও খেতে এলে না।

আমি তো অভাবে পড়ি নাই। কি করে আসি বলেন!

কমলেশবাবু—একবার ল্যাংটো স্টিমারে কোথায় যাবে যেন। স্টিম ঘাটায় বসে হোটেলের ভাত খাচ্ছে ল্যাংটো। এমন সময় স্টিমার ছা ছাড়। হোটেলওয়ালা বলে—এবারে ওঠো ল্যাংটো। স্টিমার ছাড়বে।

আমি উঠি। তবে তো স্টিমার ছাড়বে। এই না বলে ল্যাংটো একখা চাড়া স্টিমার ঘাটার সামনে অল্প জলে ছুঁড়ে দিল। স্টিমার আর নড় না। ল্যাংটো ভাত খেয়ে মুখ ধুয়ে স্টিমারে উঠল, তবে স্টিমার ছাড়ল

এই মহাপুরুষদের উপলব্ধি থাকে—স্তরে স্তরে জমা হয়ে জ্ঞান জন্মায়। একবার—কমলেশবাবু—ঠাকুর্দা আর তার তিন ভাই কলকাতায় এসে পদ্মপুকুরে বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন। চারজনই বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য। গোস্বামীমশাই বললেন, আমায় দেখতে তোমরা পদ্মপুকুরে বাসা ভাড়া করে আছ?

আজ্ঞে আপনি হলেন গিয়ে মহাপুরুষ—

ঠাকুর্দাই বললেন।

তোমাদের গাঁয়ে যে মহাপুরুষ ল্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তাঁকে দেখতে পাও না?

আমাদের গাঁয়ে? মহাপুরুষ? কে? কার কথা বলছেন?

কেন? তোমাদের ওই ল্যাংটো।

তো বুঝলেন কমলেশবাবু—অনেক জিনিস চোখের সামনে দিয়ে ঘটে যায়। আমরা অন্ধ বলে দেখতে পাই না। ল্যাংটো একবার গাঁয়ের লোককে ডেকে বলল, কাল দুপুরে নদীর পাড়ে দেহ রাখব। যেও সবাই। নেমন্তন্ন করল। মুসলমানের হাতে আমি তো কবর পাব না। তাই হিঁদুরা যেন একটু নামগান করে তারপর আমায় দাহ করে।

পরদিন দুপুরে নদীর পাড়ে বসে তিন তুড়ি দিল ল্যাংটো। অমনি প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এই হল গিয়ে মহাপুরুষ।

ভাদ্রের বিকেলে আদিগঙ্গার দিককার রাস্তাগুলো ভিজে ভিজে। কমলেশ পাম্পসু বাঁচিয়ে হাঁটছিল। পাশে পাশে পটল। রাস্তার দুধারে ভাঙাচোরা বাড়ি। ভিজে কাপড়। বিড়ির দোকান। মাথার ওপরে বজবজের রেললাইন। ম্যাথরপাড়া, মুলী বাঁশের চ্যাচারি কারখানা। বড় রাসবাড়ি। দুজনে আদিগঙ্গার দিকে মোড় নিল।

শেষ জায়গায় পৌঁছে দেখে জায়গাটা বেশ নির্জন। অথচ কলকাতার একদম ভেতরে। নদীর নামে একটা ভান আছে—আদিগঙ্গা। লোহার জং ধরা নেটের ওপরে গিয়ে ফনফনে ঘাস দেখে বোঝা যায় এখানে নিত্যনৈমিত্তিক জোয়ারের জল ওঠে।

কালীঘাটের অধর দত্তর সঙ্গে আপনার এখানে রামদাস গুহ এসেছিল। তাঁর মুখে আপনার নাম শুনে দেখা করতে এলাম।

এসে পড়েছেন তো। অত কৈফিয়ত কিসের। যখন ইচ্ছে হয় আসবেন।

অঘোরিবাবার কণ্ঠস্বরটি ভাল। কিছুটা হিন্দিঘেঁষা। লাল মেঝের বড়

ঘরে তিন চাররকমের কালী। দুর্গাও আছেন। আরও নানান দেবদেবী। কালো একখানা কাপড় পরে অঘোরিবাবাকে ফর্সাই লাগছিল। তিনি বললেন, আমি জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘোরা মানুষ। এনাকে সাধনসঙ্গী করেছি—সেই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সময়—নাইন্টিন ফর্টিসিক্সে।

হ্যাঁ। যুদ্ধ থেমেছে সবে বছরখানেক। আমার তো সংসার করার কথা নয়। এই জীবনেই আমার শেষ দেহান্ত হয়ে যাবে। আর এই মায়ার সংসারে আসবেন না।

সাধনসঙ্গী কথাটা ভাবার্থেই মনে হল কমলেশের? রীতিমত স্ত্রী। তবে রক্তাম্বরধারিণী। তিনি বললেন, নাও বাবা, এই মেটে সন্দেশটি খাও। বলে মহিলা পটলকেও একটি দিলেন।

অঘোরিবাবার শরীরটা চকচকে। মেদ নেই। চামড়া কোঁচকায়নি। বললেন, ভাল সময়েই এসেছেন। একটু বাদেই হোমে বসব। তারপর আসন বসে কথা বলব।

আমি কলেজে পড়াই আর নোট লিখি।

এখন কিছু বলব না।

পটল কমলেশের পাশে আসন করে বসেছে। চোখ মটকে কমলেশকে ফিসফিস করে বলল, মামিমার কথাটা জেনে নাও, কতদিন বাঁচবে।

তুই চুপ করত।

তুমি জানো না মামাবাবু। এঁরা আগাম সবে বলে দিতে পারে।

অঘোরিবাবা হেসে পটলের দিকে তাকালেন। তুমি তো বাবা ভাল আশ্রয়ে আছ। সৎমার সংসার থেকে এখানে তো খারাপ নেই।

আমার মা তো আসল মা।

তোমার বাবার আর একটি বিয়ে ছিল। তুমি জানো না।

আমি জানি আমার বাবার এক বিয়ে।

ঠিক আছে। ঠিক আছে বাবা। বলতে বলতে অঘোরিবাবা তাঁর আসনের পাশে হলুদ হয়ে আসা নরমুণ্ডুটি দেখিয়ে বললেন, ওটি নেপালের এক মহাপণ্ডিতের মুণ্ডু। আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তখন আমি কাঠমাণ্ডুর শ্মশানে। ও মাথায় ঘি দিয়ে ভাত মেখে খেয়েছি। কোনও বিকার হয়নি। আমাদের বিকার হতে নেই। সবরকম খাদ্যেই অভ্যস্ত ছিলাম একসময়। রাজস্থানে গালতা পাহাড়ে গালব ঋষির পা টিপতে হত যৌবনে। মাঝরাত অব্দি সর্ষের তেল দিয়ে ডলতাম। আবার মহাকাল আশ্রমে মহাকালবাবার স্নেহও পেয়েছি। নিশ্চয় জানেন বাবা—ভারতে তিন জনের দেহ পাওয়া

যায়নি। শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব আর মহাকালবাবা।

একটি মনমরা মেয়ে এসে হোমের কাঠ সাজাল। অঘোরিবাবা বললেন, এটি আমার বড় মেয়ে। জামাই বি ডি ও হয়েছিল। বাস অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। মেয়ের নাম হাইকোর্টে বিরাশি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা এই মিটে এল বলে।

অঘোরিবাবার বারান্দা থেকে এক ডালডা কোম্পানির কারখানার চিমনি দেখা যায়। সিধে বসে তিনি হোম শুধু করলেন। এক এক মন্ত্র সাধনসঙ্গিনী এগারোবার জপ করে তিলোৎসর্গ দিতে লাগলেন আগুনে। আগুনের লালচে শিখার পাশাপাশি সবুজ শিখার বর্ডার।

খানিকবাদে আসনে বসে অঘোরিবাবা বললেন, আপনি গত জন্মে গোধূলিয়ায় ছিলেন। ছিলেন কাশীর বড় পণ্ডিত। একবার ঘুরে আসুন না। ফিরে এলে বাকিটা বলে দেব।

আবার জন্মালাম কেন?

ছোট্ট একটা পদস্খলন মাত্র। আগামী আড়াই বছরের মাথায় খুব কৃতী হবেন। নাম হবে খুব। এখন থেকে সাড়ে সাত বছরের মাথায় একটি রিস্ক আছে। আমরা ওকে রিষ্ট বলি। তাকে আপনারা বলেন ফাঁড়া। তা কাটিয়ে উঠে দীর্ঘায়ু হবেন। প্রায় আশি বছর বাঁচবেন।

আমার স্ত্রী খুব ভুগছেন। ওঁর হিপে ফিমার বোনটায় ঘূণ ধরেছে।

দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি হুঁ। এসব কিছু হয়নি আপনার পরিবারের। সেরে যাবে। খানিকটা নিশিঙ্গা পাতা জোগাড় করে এনে দিন। আমি নিজের হাতে করে একটু ক্বাথ বানিয়ে দেব। দিনে বার তিনেক লাগাবেন। একদম সেরে যাবে। একদিন পরিবারকে নিয়ে আসুন। দেখুন—আমরা আলাদা আলাদা আত্মা হলেও জন্মসূত্রে একই জাতকের সঙ্গে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুতোর যোগ থাকে। কোনও রাস্তা দেখলে মনে হয়—বড় চেনা। কোনও অপরিচিত মানুষকে দেখলে মনে হয়—যেন চিনি। যেন চিনতাম। এমন হয় কেন? হয়—কারণ, চাপা পড়া স্মৃতি যখন সংস্কার ভেদ করে জেগে ওঠে। বেনারসে গোধূলিয়ায় একবারটি ঘুরে আসুন না। দেখলেই সব চিনতে পারবেন।

একটু হেসে অঘোরিবাবা আবার বললেন, এই খোকাদের মাকেই করুন না। দু'জনে গেছি রামেশ্বরমে। গিন্নি দেখি একটা বাড়ি দেখেই ভেতরে চলে যাচ্ছে। হাত ধরে বললাম, যেও না। কেন বলুন তো?

কমলেশ বলল, আমি জানব কি করে?

রহস্যের হাসি হেসে অঘোরিবাবা বললেন, ওটা ওঁর গত জন্মের শ্বশুরবাড়ি। বুড়ো স্বামী তখন ভেতরের বারান্দায় বাসে কাশছেন। এই অবস্থায় তাঁকে দেখে যদি মায়ায় পড়ে যায়—আমার এ জন্মের পরিবার! ভাষা অবিশ্যি আলাদা। উনি তেলেঙ্গী। আর আমার সাধনসঙ্গিনী তো এ জন্মে বাঙালিনী।

তার আগের জন্মে অবিশ্যি আমরা স্বামী স্ত্রী ছিলাম। খাগড়িয়ার শ্মশানে সাধনভজন করতাম দুজনে। একটু চা করত লক্ষ্মী। বাবাও খাবেন।

কমলেশ বুঝল, বিধবা বড় মেয়েটির নাম লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী জানতে চাইল, দাদা কি চিনি খান চায়ে?

কম খাই। এখন চা খাব না।

খেয়ে যান। আমি তো দিনে চল্লিশ কাপ চা খাই। তিব্বতে বারমুড়া আশ্রমে তিনবছর ছিলাম। তখন মড়া কেটে তন্ত্র শিখেছি। তখনই এই চায়ের অভ্যেস। মানস সরোবার যাওয়ার পথে এক এক গুহায় এমন সব ধ্যানীকে দেখেছি—যাঁদের বয়স তিনশো-চারশো বছর। চোখের পাতা পড়ে গেছে। গায়ের চামড়া কোঁচকায়নি একটুও। এর ভেতর কোনও রহস্য নেই। পাহাড়ে নানা ভেযজ জন্মায়। সে সব খেলে শরীর অটুট থাকে। আপানি পরিবারকে নিয়ে আসবেন। আর আনবেন নিশিঙ্গা পাতা

আনব। আজ উঠি।

আসুন। আবার আসবেন।

আসতে তো হবেই। বলে কমলেশ উঠল।

বাইরে বেরিয়ে ভরা আদিগঙ্গার গায়ে ঘাসে ঢাকা সরু পথে জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। জলের ওপারেই রিফিউজি ঠাকুরবাড়িতে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে।

পটল বলল, সময়টা খুব ভাল কাটল। কি বল মামাবাবু।

হুঁ।

আমার একটা জিনিস খুব জানার ইচ্ছে ছিল।

কি?

এই জমিজমার ব্যাপারে। এ জন্মে আমার বড়ভাইয়ের সঙ্গে জমি জায়গা নিয়ে কোনও খটোমটো বাঁধবে কি না?

এ জন্মটা তো সবে তোর শুরু হল। এখুনি খটোমটোর কি হল!

না। বলছিলাম ভবিষ্যতের কথা। আর—

আর কি? বলে দাঁড়িয়ে পড়ল কমলেশ। পাড়ার কটি অপগণ্ড

মিলে অন্ধকারে মাটির খুরিতে করেই বোধহয় চোলাই খাচ্ছে। তার গন্ধ বাতাসে। এক বড়লোকের বাড়ির লোহার গেটের নিচে দুটি অ্যালশেসিয়ান নাক বের করে ওঁৎ পেতে শুয়ে আছে। জায়গাটা দেখতে এমনি শান্ত, নিরামিষ। যে কোনও মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

পটল বলল, আমার বিয়েটা কেমন হবে?

আগে তুই বড় হ। তারপর তো।

তুমি কাশীর গোধূলিয়ায় চলে যাবে জানি। আমার কি হবে? এই এতবড় শহরে।

হাঁটতে হাঁটতে কমলেশ সাইকেল রিকশা পেয়ে গেল। তাতে উঠে বসে পটলকে বলল, আমরা কাশী গেলে তুইও সঙ্গে যাবি।

শহর, আধাশহর, ভাঙা শহরের ভেতর দিয়ে সাইকেল রিকশা ওদের এনে বড় রাসবাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। আর যাওয়া যাবে না বাবু। এরপর পুলিশ ধরতে পারে।

ঠিকই। পয়সা মিটিয়ে পটলকে নিয়ে পাম্পসু বাঁচিয়ে কমলেশ হেঁটে বাড়ি ফিরল। হেম-নলিনী গরম নিঃশ্বাস দিয়ে ওদের আদর করে বাড়ির ভেতরে নিল। বাড়িতে ঢুকেই পটল লাফাতে লাফাতে মাঝের ঘরে গেল। ও মা-মি-মা-আ- ওঠো। তুমি মরছ না। অনেকদিন আয়ু তোমার। কী একটা পাতা নিয়ে যাবে মামাবাবু। তার ক্বাথা বানিয়ে দেবেন সাধুবাবা।

পটলের কথার কোনও জবাব না দিয়ে খুকু কমলেশকে বলল, আজ আবার জ্বর এসেছে কালকের মত।

জ্বর হচ্ছে বুঝি? বলনি তো আগে। কালই তোমায় অঘোরিবাবার কাছে নিয়ে যাব। আমি নাকি গত জন্মে কাশীর গোধূলিয়ায় ছিলাম।

তাই বললেন?

হুঁ। গেলেই নাকি সব চিনতে পারব। ফিরে এলে বাকিটা বলে দেবেন।

চল না। কাশী ঘুরে আসি ক'দিনের জন্যে।

হেম-নলিনীকে কে দেখবে?

কেন? পটল দেখবে।

খুকু। পটলও কাশী যেতে চাইছে—তোমারও দেখাশুনোর লোক লাগবে তো।

দ্যাখো। আমি অতটা অসুস্থ নই। তুমি ছেলেটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছ।

ও ক'টা দিন না হয় মালতী আর সুবালা হেম-নলিনীকে দেখাশুনো করবে। ডালিমের খাওয়াদাওয়ার জন্যেও তো বাজার-রান্না চালু থাকবে খুকু।

পটল মেঝেতে বসে পড়ে খুকুর হাঁটুতে মাথা রাখল। আমি তোমার সঙ্গে কাশী যাব—ও। তোমার গতজন্ম দেখতে পাব।

এবার খুকু পটলকে সরাল না। সে যেন জানলা দিয়ে তাকিয়ে পাশের বাড়িরই খোলা জানলায় নিজের গতজন্মটা দেখতে পাচ্ছিল।

মালতী এসে চা দিল। খুকুকে, কমলেশকে। দু'জন আলাদা আলাদা দুই ঘরে চা খায়। শোয়। পড়াশুনো করে। চায়ের পর কমলেশ জানতে চাইল, অধীর আসছে না কেন?

এসেছিল তো। ছুঁচ ফুটিয়ে গেছে। যেদিন ফোটায় সেদিন ব্যথাটা একটু কম থাকে।

অঘোরিবাবা খুকুকে দেখেই কমলেশকে বললেন, গতজন্মে আপনার সামান্য পদস্খলনের কারণ এই বেটি। এ জন্মে তিনিই আপনার পরিবার হয়ে এসেছেন।

কমলেশ কিছু বলল না। অঘোরিবাবা হেসে বললেন, গত জন্মে এঁকে দেখেই আপনার মন কেন্দ্রচ্যুত হয়।

ওইটুকুই তো বলছেন। গতজন্মের বাকিটুকু তো কিছুই জানাচ্ছেন না।

আমি সব জানি না। কি করে জানতে পাই তাও জানি না। একবারটি বেনারসের গোধূলিয়ায় ঘুরে আসুন তো, কার্যকারিকা শক্তি আপনার হারানো সুতোগুলো জোড়া দিয়ে চেনা দেবে। তখন দেখবেন অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। জীবনের অদৃশ্য মানে আপনার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যাকে বলে জীবন রহস্য কিংবা জন্মমৃত্যু রহস্য।

আমি বাবা একটা কথা বলি?

খুকুর এমন করে বলায় অঘোরিবাবা খুশিই হলেন। বল মা, বল। আমি তোমাদের তুমিই বলি?

বলুন না বাবা। আচ্ছা আমার হাড়ে এই ঘুণ ধরা কি সারবে?

আলবত সারবে। আমি তো তোমার জন্যে একটা ক্বাথ বানিয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের মা আর আমি দুজনে মিলে তোমার জন্যে নবগ্রহ হোম করব। এ রিষ্ট তুমি কাটিয়ে উঠবে। তার আগে দুজনে একবার গোধূলিয়ায় ঘুরে এস। কোত্থেকে এলে? কোথায় যাচ্ছ?

কোথায় যাবে? এসব জানতে চায় না মন?

কমলেশ বলল, মাঝে মাঝে তো মনে হয়। আবার কাজের চাপে প্রশ্নগুলো চাপা পড়ে যায় বাবা—

॥ ছয় ॥

কলেজে কমলেশের সারা হপ্তায় চারটি ক্লাস নিতে হয়। তাও অনার্সের বাকি সময় টিচার্স রুমে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে সে। প্রুফ দেখে। রুটিন করে। এখনও অনেক দিন চাকরি তার। নোট বইগুলো ভালই চলে। সহকর্মীদের কেউ বলেন—দাদা পিয়ারলেস করুন। কেউ বলেন—'জনপ্রিয়'তে টাকা রাখুন। সব কথাতেই কমলেশ ঘাড় নাড়ে। তার মানে কোনওটাতেই সে নেই।

কমলেশ নিজেও ভেবে দেখেছে—সে কোথায় কোথায় আছে এবং কোথায় কোথায় নেই। নেই-এর দিকটাই তার ভারি হয়ে উঠেছে। শুধু নোট লিখে—টাকা আয় করে—প্রয়োজনের গর্তগুলো টাকা দিয়ে বুঝিয়ে রেখে একজনের জীবন পূর্ণ হতে পারে না—তা ভালভাবেই জানে কমলেশ।

কিন্তু কি করলে জীবনটা আরও স্বাদের হতে পারে? এই জিনিসটাই যে আমি জানি না। বাড়িতে গান শোনার ঘরে শুয়ে পড়ে পটলকে যখন বলি রেকর্ড চাপা—তখন পটল জানতে চায়—কোনটা চাপাব? তখনই আমি অসুবিধেয় পড়ি। সত্যিই তো! কোন রেকর্ড ফেলে কোন রেকর্ড চাপাবে? তিলক কামোদ? না পুরিয়া ধানেশ্রী? সব রাগই তো যে যার মত গরিমায় অধিষ্ঠিত।

এই এক বিচ্ছিরি দোটানা।

ডালিম বড় হয়ে যাওয়ায় তার এখন নতুন জগৎ। সেখানে আমার জায়গা নেই। ফলে আমি ডালিমের হিসেবের ভেতর পড়ি না।

এসব ভাবতে ভাবতেই কমলেশ সেনগুপ্ত অসময়ে বাড়ি ফিরে এল। এসে দেখে পটল কয়লা আনতে গেছে। মালতীর দিনাজপুরের ভাইপো আসায় সে পাগলিনী হয়ে তার সঙ্গে শিয়ালদায় গেছে। কে নাকি আসবে দেশ থেকে। এসব খবর শুয়ে শুয়েই দিল খুকু।

কথাগুলো কমলেশের কানে গেল না। সে মন দিয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। অঘোরিবাবার তৈরি ক্বাথ লেপে দেওয়ায় খুকুর পেছনটা সাদা হয়ে আছে। ফিনফিনে ছাপা শাড়ির ভেতর থেকে সাদা ঢেউ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, খুকুর

শরীরটা কেমন। সেখানটার শাড়ি নিচে নামিয়ে দিয়ে খুকুর পেছনে ভারি হাতের ভর দিয়ে অধীর দত্ত আকুপাংচার করছে।

কমলেশের মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে এল, অনেকগুলো সিটিং তো দিলে অধীর। এবারে তোমার ছুঁচ ফোটানো বন্ধ কর। কোনও ফলই তো ফলছে না।

অধীর কোনও জবাব দিল না। বেকায়দায় বসে সে বাঁ হাতের তালু পেতে খুকুর পেছনের শারীরিক তাপ যাচাই করে দেখছিল। আর ডান হাতে খুব সাবধানে খুকু বৌদির শরীরে ফোটানো নিডলের মাথায় সামান্য নাড়া দিচ্ছিল। যাতে কি না নিডল থেকে এক অদৃশ্য ইলেকট্রিক ঢেউ ব্যথার জায়গাগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে অসাড় স্নায়ুতে সাড় ফিরিয়ে আনে।

বুকের নিচে পাশবালিশটা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায় খুকুর পেছনটা বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় খুকু কমলেশের চোখের আর গলার স্বরের বিরক্তির কারণ ধরতে পারল। কিন্তু কিছু করার নেই তার। কেননা, ছুঁচ সমেত তো চিৎ হতে পারে না সে।

অধীর ফ্রি হয়ে বলল, কিছুদিন তো ধৈর্য ধরতে হবে। ফিমার বোনে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট বেড়ে গেছে। দুটো হাড়ে ঠোকাঠুকির দরুন এই যন্ত্রণা—

আমারও আর ভাল লাগে না অধীর।

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে এভাবে কমলেশ বলে ওঠায় অধীর কুঁচকে গেল। সে অবশ্য বেশি বয়সে অল্পদিন হল বিয়ে করেছে। সংসারের কঠিন জায়গাগুলো কেন জটিল হয় তা সে এখনও ভাল করে আন্দাজ পায়নি। তবে কমলেশের কথায় তার যেন কেমন সংকোচ হল। নিজের শরীরের বাইসেপ, ভারী হিলের কাবলি স্যান্ডেল, আর ছুঁচ রাখার চামড়ার ব্যাগ নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

কোনওমতে গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাশের ঘরে বিছানা থেকে খুকু উঠে এল। অমন করলে কেন অধীর ঠাকুরপোর সঙ্গে?

ঠাকুরপো এসে পেছনে হাত না রাখলে ব্যথা সারে না তো!

বিচ্ছিরি মন তোমার। বিচ্ছিরি চোখ তোমার। ডাক্তার যখন—হাত তো রাখবেই। আর কিছুদিন বাদে ছেলের বিয়ে দেবে এখনও আমার গায়ে কে কোথায় হাত রাখল তাই নিয়ে মাথা ঘামাও?

দ্যাখো খুকু। অধীর স্বাস্থ্যবান জেলখাটা পলিটিকস্ করা ছেলে।

বিয়ে করে বসায়—দায়ে পড়ে আকুপাংচার করছে। সংসার চালাতে টাকা লাগে তো! তোমার শরীর আদুর করে ওদের মাথা গরম করা কেন? শরীর মনে চাপ পড়তে পারে।

চাপ পড়লে তোমার পড়বে। ওরা তোমার মত হ্যাংলা নয়।

কি বললে?

পাশের ঘরে যেতে যেতে খুকু বলল, শুধু শুধু ঠাকুরপোর মনটা খারাপ করে দিলে।

সেদিন সন্ধেরাত থেকেই কমলেশ সেনগুপ্ত টেবিলে খাতাকলম নিয়ে বসল। পাশের ঘরের খুকু পা ছড়িয়ে বসেছে। পিঠ বুক খোলা ব্লাউজের বাইরে নিওন আলো থমকে দাঁড়াল। খাটের ওপর পটল বসেছে। তার দু'পায়ের ভেতর খুকুর মাথা হেলানো। পটলের হাতে সন্না। সে চুলের ঢাল সরিয়ে সরিয়ে পাকা চুল খুঁজছে। আর একটা দৃশ্য দেখে আরামও পাচ্ছিল।

দৃশ্যটা এইরকম—

পাশের ঘরের মাঝের পর্দাটা তোলা। কমলেশ টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কাজে বসেছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চোখ অন্ধকারের ভেতরেও আন্দাজ করতে পারছিল খুকু। টেবিল ল্যাম্প থেকে আলোর তাপ কমলেশের চোখের নিচে এসে পড়ছে।

চুল বাছতে বাছতে পটল মা-মি-ই-মা-আ- বলে খুকুর মুখের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল।

খুকু ঝাঁঝিয়ে উঠল। ও কি রকম গায়ে পড়ামি করছিস। ঠিক হয়ে বোস।

পটল যেন মামিমার আজকের গলায় আদেশের কোনও চিহ্ন পেল না। শাড়ির আঁচল ফ্যানের হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছিল। খুকু নিজের মুখের ওপর নিজের হাসির চেহারাটা আন্দাজ করে নিতে পারছিল।

তখন পাশের ঘর থেকে কমলেশ বলল, কাঁচা চুল তুলছিস কেন বেছে বেছে?

পটল বৈঠকী হাসি হেসে বলল, জান মামাবাবু—তোমার বউয়ের মাথায় অনেক চুল পেকে গেছে।

খুব আনন্দের কথা। তুই এবারে অন্য কাজে যা তো।

না। যাবিনে—বলে খুকু পটলের দু পায়ের সাঁড়াশির ভেতর পিঠ আর মাথা আরও বেশি করে ধরিয়ে দিল।

তারপর বলল, পাকা চুলে আজকাল আমার মাথা চুলকোয়।

তোমার আবার চুল পাকল কবে?

পটল ভরাট গলায় হেসে উঠল। দ্যাখো। চুল পাকবে না? বয়স হলে সবারই পাকে।

কমলেশ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মারব এক চড়। যাঃ। হেম নলিনীকে আলাদা করে খেতে দে। নলিনীকে হেম খেতে দেয় না আজকাল। খেয়াল করিস এসব?

না। পটল এখন যাবে না। বলে এমন করেই বসল খুকু—যাতে বালকের দুই হাঁটু তার দুই হাতের নিচ দিয়ে উঠে আসে।

দৃশ্যটি কমলেশের জন্যে সাজিয়ে খুকুর বেশ আরাম লাগছিল।

নিরুপায় কমলেশ আবার নিজের জায়গায় বসে পড়ল। জোরে কথা বলার উপায় নেই! মানে মন খোলসা করে কথা বলা যাকে বলে। পরের ঘরখানাতেই ডালিম মন দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল খাতা বানাচ্ছে। একটু আগে দেখে এসেছে কমলেশ।

রাত সওয়া এগারোটা নাগাদ কমলেশের ঘরে এল খুকু। আমি শুয়ে পড়ছি। তুমি খাবে না?

তুমি খেলে আমি খাব।

রাতে না খেলে আমি ভাল থাকি।

এস না একসঙ্গে দুজনে খেতে বসি। মালতী তো পরিবেশন করতে পারে।

এত রাত অব্দি কোন বাড়ির কাজের লোক থাকে বল!

ক'জনই বা লোক আমরা খুকু। সন্ধের পর সারা বাড়িতে আলো জ্বলে। কারও কোনও কথা নেই। যেন হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে আছি।

আমি শুয়ে পড়ছি।

আমিও রাতে খাব না খুকু। ডালিম তো খেয়ে নিয়েছে নিশ্চয়।

হুঁ। ঘুমিয়েও পড়েছে। পটল মশারি টাঙিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

তাহলে এস। আজ আমরা একসঙ্গে শুই।

না। আমার ভাল লাগে না। বলে খুকু পাশের ঘরে যাচ্ছিল। খালি গায়ে শাড়ি প্যাঁচানো। ব্লাউজ হাতে মুঠো করে পাকানো।

কমলেশ উঠে গিয়ে পথ আটকাল।

কি ভাল লাগে না? আমি পুরনো হয়ে গেছি?

তুমি মানুষকে আনন্দ দিতে জান না। আমি শুয়ে পড়ছি—বলে পাশের ঘরে গিয়ে আলো নেভাল খুকু।

এঘরে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের অন্ধকারকে কমলেশের মনে হল একদম সলিড অপমান। সে নিজের জায়গায় এসে আবার বসে পড়ল। কয়েকটা মডেল কোশ্চেনের আনসার লেখা বাকি। তাহলেই পনের নম্বর ফর্মা ছাপতে যেতে পারে। পাশের ঘরে অন্ধকার বিছানার দিকে তাকিয়ে ভারী চেরা গলায় স্পষ্ট করে খুকুকে বলল, তুমি এর দাম দেবে খুকু। তোমাকে এর দাম দিতে হবে—

অন্ধকার সলিড অপমানের ভেতর থেকেই খুকু কথা ফিরিয়ে দিল। জীবন তো একটাই। দিতে হলে দেব।

বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পটল ট্রেন থেকে বেনারস স্টেশনে নামল। এখানে আমি ছিলাম গতজন্মে। —বলে বাতাসের গন্ধ নিতে গেল কমলেশ। যদি তাতে গতজন্মের কিছু গুঁড়ো থেকে থাকে।

পটল আগে আগে। পিঠে ব্যাগ। তারপর খুকু। সেও বাতাস থেকে গতজন্মের আভাস পাবার চেষ্টা করছিল।

রিকশায় উঠে কমলেশ বলল, গোধূলিয়া। তারপর খুকুর দিকে ফিরে বলল, আগে একটা ভাল বাঙালি হোটেলে উঠব। অঘোরিবাবা তো বলেছিলেন গোধূলিয়া ঢুকতেই ভাল ভাল হোটেল আছে।

পেছনের রিকশায় কিটব্যাগ, জলের ফ্লাস্ক, হাতপাখা নিয়ে পটল আসছিল। রিকশায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও মামাবাবু। তোমার গতজন্মের জায়গাটা বেশ সোন্দর। ওই তো নদী দেখা যায়—

খুকু বলল, গঙ্গা। নে নমস্কার কর।

কমলেশ ভাবল, ভাল জ্বালাতন তো।

অঘোরিবাবা যা বলেছে—সব মনে করে রেখেছে। তাই পেছন ফিরে চোখ পাকিয়ে বলল, পড়ে যাবি। ঠিক হয়ে বোস। এখানে এসে অসভ্যতা করলে চড় কষাব।

কমলেশের ধমকানিতে একটুও ঘাবড়াল না পটল। ঐ দ্যাখো সে নদী। গঙ্গা—

দেখেছি।

খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বেরুতে বেরুতে খুকুদের বেলা আড়াইটে তিনটে হয়ে গেল। পটল বলল, আমিও যাব মা-মি-ই-মা-আ-

কমলেশ বলল, ও থাক্ না। হোটেলের দোতলা বারান্দা থেকে শহর দেখবি। গঙ্গা দেখবি।

না। আমি যাব।

খুব আস্তে বলল, নতুন জায়গা তো। ছেলেমানুষ—নিয়ে চল। নয়তো হাবসে মরবে।

আমরা না হয় গতজন্মে যাচ্ছি খুকু। ওরও কি?

মানুষ যখন—ওরও নিশ্চয় গতজন্ম ছিল।

তিনজন বলে টাঙায় উঠতে হল। পটল বসল টাঙাওয়ালার পাশে। সামনের দিকে মুখ করে। কমলেশ আর খুকু পেছন দিকে মুখ করে। দেবালয় এলাকায় পৌঁছতে বিকেল চারটে বেজে গেল। গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে চোখ পড়ল জলে। কমলেশ হিসেব করে দেখল, অন্তত চল্লিশ ফুট নিচে জল। পাড় ভীষণ উঁচু করে বাঁধানো। আবার পাড় থেকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে সব মন্দির। জায়গায় জায়গায় গলি নেমে গেছে মন্দিরের গা বেয়ে নিচের দিকে। পাতালে। আসলে পাতাল নয়। গঙ্গার জলের লেভেলেও বসতি আছে। টাঙাওয়ালা বলছিল—শহরটা কয়েকশো বছর ধরে তৈরি।

গলির মুখে এসে টাঙার মুখ ঘোরাতে হচ্ছিল। ও মামিমা—ওই দ্যাখো একটা সিনেমা হল। ছবি দেখবে?

অনেকদিন আগে একবার কি কাজে খুশি হয়ে কমলেশ পাঁচ টাকা দিয়েছিল পটলকে সিনেমা দেখতে।

পটল লাইন দিয়ে দুখানা টিকিট কেটে এনে বলেছিল, চল মা-মি-মা-আ-। আমি আর তুমি পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখব। অমিতাভর ছবি—দারুণ মারপিট—

তুই কি করে ভাবিস তোর সঙ্গে আমি সিনেমায় যাব?

কেন? আমরা গরিব বলে?

খুব পাকামি বেড়েছে। দাঁড়া ডালিম এলে বলে তোকে মার খাওয়াব।

আজ কিন্তু গতজন্মের শহরে বিকেলবেলায় খুকুর মনটা ভাল ছিল। সবই ভাল লাগছিল। বলল, বেশ তো নাইট শোতে দেখা যাবে।

তাহলে টিকিট কাটব মামাবাবু?

দাঁড়া, খুব চেনা জায়গার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় নাকি দেখি আগে!

খানিকটা বিশ্বাস আর অবিশ্বাস—মিলিয়েই কমলেশ তার গতজন্মের জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে। জায়গায় জায়গায় ভাঙের দোকান। আর প্যাঁড়া

।লাইয়ের তো কথাই নেই। একজন বাঙালি ডাক্তারবাবুর চেম্বার পড়ল ান হাতে। পাথরের বাড়ি। রাস্তা থেকে কোনও কোনও ঘরের সিলিং াখে পড়ে। বড্ড নিচু। পড়তি বিকেলের ছায়া আসছিল দশাশ্বমেধ াটের দিক থেকে। টাঙাওয়ালা বলল, মণিকর্ণিকা ঘাটে যাইবে না জৌর ?

না, ভাই, কাল যাব। আজ একটু পায়ে হাঁটি।

উঁহা কভি আগ নেহি নিভতা—।

শ্মশান তো দেখব একসময়। নামো খুকু। পটল নাম।

খুকু নামতে নামতে বলল, মণিকর্ণিকা দেখবে না ?

দেখব। সবসময় মড়া পুড়ছে। তাই কোনও সময় আগুন নেভে া। লোকের বিশ্বাস ওখানে পুড়লে ফিরে আর জন্মাতে হয় না। ওই ্যাখো—

চোখ তুলেই খুকু নামিয়ে নিল। একজন দেহাতী তার প্রিয়জনের ড়া দাঁড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—রিকশায় বসে। খুকুর মন ঘুরিয়ে দেবার ন্যে বলল, চল না, বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দিকে হেঁটে যাই। রাস্তাটা বেশ। দখতে দেখতে যাওয়া যাবে—

পটল ফট করে বলে বসল, ওটাই কি তোমাদের গতজন্মের রাস্তা ামাবাবু ?

চুপ কর তো।

পান, ভাঙ, প্যাঁড়া—সব জিনিসেরই দোকান। দু'জন কুস্তিগীর াটিমাখা অবস্থায় হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের পেছন পেছন বাচ্চা ছেলের ল। কাছাকাছি কোথায় দঙ্গল হয়েছে—বা একটু বাদেই হবে। সারি সারি াইকেল রিকশায় লাইন। হঠাৎ রিকশায় এক বাঙালি ভদ্রলোককে দেখে কমলেশ খুকুর হাত ধরে টানল। দ্যাখো—দ্যাখো—

কি ?

ওই যে রিকশা থেকে এক ভদ্রলোক নামছেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। ঙ্গে বছর দশেকের একটি ফুটফুটে ছেলে—

হুঁ। তা কি হয়েছে ? খুকু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার খুব চেনা লোক। আমাদের কলেজের ক্যাশিয়ারের দাদা। ছর পনের আগে শুনেছিলাম—বউ, তিন ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ য়েছেন—

নিরুদ্দেশ ?

সবাই ভেবেছিল—এখনও তাই জানে সবাই—পরিতোষবাবু খুন হয়েছেন।

ওই তো তিনি দিব্যি বেঁচে আছেন। ছেলেকে নিয়ে দোকানে ঢুকছেন তোমাদের পরিতোষবাবু—

তাইতো দেখছি খুকু। দোকান থেকে বেরুলে দোকানিকে জিজ্ঞাস করব।

কি সব কিনে ঝোলা ব্যাগ হাতে পরিতোষবাবু রিকশায় উঠলেন তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, বাঙালিটোলা চল।

কমলেশ দোকানে ঢুকে মুদিকে বলল, একটু আগে যিনি সওদ করলেন—উনি কি পরিতোষবাবু—

হাঁ হজৌর। পরিতোষ ঘোষ আছেন উনি। খুব রইস আদমি। দুই ছেলে। হামার দুকনেসে মাল নিচ্ছেন দশ-বারো সাল হয়ে গেল মালবিয়াজির ইয়ুনিভার্সিটিতে চাকরি করেন।

খুকু পাশেই ছিল। দোকান থেকে বেরিয়ে কমলেশকে বলল, এক জীবনে দুটো জন্ম! কলকাতারটা গতজন্ম!

কমলেশ কোনও কথা বলতে পারল না। পটল আগে আগ তার পেছনে খুকু তারপর কমলেশ। গলিটা সরু হয়ে নিচের দিকে নেমেছে ডান পাশে মন্দিরের চুড়ো খাড়াই উঠে গেছে। কমলেশ ভাবছিল— মধ্যবয়সে নতুন জায়গায় এসে পরিতোষবাবু নতুন করে সংসার পেতেছেন। আশ্চর্য! পেছনের সংসারের ছেলেমেয়ে—স্ত্রীর জন্যে কোনও পিছুটান নেই। কলকাতায় গেলেও হয়তো গোপনে যান। গোপনে ফিরে আসেন। এদিককার বউ ছেলেদের ভেবে বসে আছে—পরিতোষবাবু খুন হয়েছেন কিংবা সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন। নিশ্চিন্ত হতে না পারা পরিতোষের শ্রাদ্ধও করতে পারেনি ছেলেমেয়েরা।

মামাবাবু। দ্যাখো। সব পাথরের বাড়ি।

হুঁ। এটাই বোধহয় চুনাগলি।

দ্যাখো।—বলে খুকু দাঁড়িয়ে পড়ল। জায়গাটা আমার খুব চে লাগছে কিন্তু।

কমলেশ বলল, আমারও। কেমন চেনা চেনা গন্ধ—

পটল হেসে ফেলল। পাথরের আবার গন্ধ আছে নাকি?

খুকু ওর কথায় কান না দিয়ে বলল, হয়তো চুনার থেকে পাথ এসেছিল—তাই দিয়ে ঘরবাড়ি—দেওয়াল—সেজন্যে নাম চুনাগলি।

ঠিকই ধরেছ—বলতে বলতে পাথরের একটা খোলা দরজা দিয়ে বাঁ হাতে ঢুকে পড়ল কমলেশ। সঙ্গে সঙ্গে পটল আর খুকু কমলেশের কাছাকাছি চলে গেল। পাথরের ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে। কমলেশ চেঁচিয়ে উঠল, আমি এখানে ছিলাম খুকু। মনে পড়েও পড়ছে না। এই উঁচু জায়গাটায় বসতাম।

খুকু একটা নিচু জায়গার পাশে গিয়ে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আমি একদিন চুল বেঁধেছি। গঙ্গার পাড় এত উঁচু ছিল না তখন।

অ্যাঁ—মা-মি-ই-মা-আ- তোমরা এ বাড়িতে থাকতে আগে?

খুকু খুব আস্তে বলল, হুঁ।

বিকেলের আলো অল্পই ঢুকছিল। অবশ্য নিচু একটা জায়গা দিয়ে অজানা কোনও ফাঁক থেকে আলো এসে পড়ছে। খুকু—এই তো দেওয়ালে আমার হাতের দাগ। আমি চিনতে পেরেছি।

পটল ভয় পেল কমলেশের চোখ দেখে। এ পোড়োবাড়িতে তোমরা ছিলে?

তখন তো পোড়ো ছিল না রে। বলতে বলতে অন্ধকার সিঁড়ি ধরে আরও অন্ধকারে নেমে গেল কমলেশ। ওখানটায় ছাত্রদের নিয়ে পড়াতে বসতাম আমি—

কমলেশের গলার স্বর গমগম করে ওপরে উঠে আসছিল। সেদিকে আন্দাজ করে খুকু যেই নামতে যাবে—অমনি তার হাত শক্ত করে ধরল পটল। না। তুমি যাবে না মা-মি-ই-মা-আ।

ছাড় বলছি। হাত ছাড় বাঁদর—বলে খুকু সিঁড়ি বেয়ে নামতে গেল। নিচের দিকটা একদম অন্ধকার।

পটল উল্টো দাঁড়িয়ে খুকুর নাভিতে মুখ লাগিয়ে দু হাতে তাকে জাপ্‌টে ধরল। আমি তোমায় নামতে দেব না কিছুতেই। চল ওপরে চল। ফিরে চল মা-মি-ই-মা-আ। তোমরা দুজনে পাগল হয়ে গেলে নাকি?

তখন আরও নিচু থেকে কমলেশের গলা গমগম করে উঠে আসছিল। গলা ঠিক নয়, গলার স্বর। কথাগুলো আলাদা করা যায় ন। একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে যাচ্ছিল।

ছাড় বলছি। আমি যাবই। আমরা এখানে ছিলাম যে—

না। কিছুতেই নামবে না। পাগল হয়ে গেছ?

ধস্তাধস্তিতে খুকুর খোঁপা ভেঙে পড়ল। তখন অনেক নিচে পাথরের

ধাপ শেষ হওয়ার পর গঙ্গার পাঁক মাটিতে দাঁড়িয়ে কমলেশ দেখতে পেল—কোন চোরাপথে এই পাথর বাড়িতে আলো আসে।

সামনেই গঙ্গার জল বয়ে যাচ্ছে। জলের লেভেল গিয়ে পাথরের গাঁথুনির শেষ। সেখানে লোহার আংটায় একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা। অল্প ঢেউয়ে একটু একটু করে দুলছিল নৌকোটা।

এতো আমার নৌকো।—বলেই কমলেশের মনে পড়ে গেল নিত্য দিন এ নৌকোয় করে সে কাশীর পুরনো ঘাট অব্দি যেত। অস্পষ্ট স্মৃতির ভেতর থেকে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। একটু একটু করে। অঘোরিবাবার একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কমলেশ স্বস্তি পেল। মানস সরোবরে যাওয়ার পথে রাবণ হ্রদের কাছাকাছি এক গুরুভাই তাঁকে দুখানা পাথর সরিয়ে এক গুহায় নিয়ে গিয়েছিল। অঘোরিবাবা ভেতরে ঢুকে দেখলেন—গঙ্গা গোপনে সেখান দিয়েও ঝরনা হয়ে বয়ে চলেছে। ধ্যানী সাধু বসেছিলেন সেখানে। যোগাসনে। তাঁর পাশেই আরেকটা অসন সাজানো। ফাঁকা পড়েছিল। যোগী বললেন, কেয়া বেটা। সব ভুল গিয়া?

বাকিটুকু অঘোরিবাবা বাংলায় বলেছিলেন—এ আসন তোর জন্যে দুশো বছর হল সাজানো পড়ে আছে। সেই যে গিয়েছিলি আর এতকাল পরে ফিরে এলি? নিমকহারাম—

পরে রাবণ হ্রদের আশেপাশে অনেক করে খুঁজেছেন জায়গাটা। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাননি অঘোরিবাবা। একই পথ। একই জায়গা। অথচ ওর কোনও জায়গায় যে সে জায়গা—তার হদিস পাননি তিনি। হাজার চেষ্টা করেও খুঁজে পাননি জায়গাটা।

কমলেশ একা একা বলে উঠল, কী ভাগ্য আমার! নিজেই একবারে খুঁজে পেলাম। ও খুকু? খুকু—বল পেছন ফিরে কমলেশ সেনগুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেল।

থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। কোনটা দিয়ে নেমেছিল ঠিক করতে পারল না। একই রকমের তিনথাক পাথুরে সিঁড়ি তিনদিকে উঠে গেছে। কোনটা দিয়ে উঠলে তার খুকুদের ওখানে ফিরে যাওয়া যায়? এক মুহূর্তে সব গোলমাল হয়ে গেল কমলেশের। নৌকোটা বাঁধা অবস্থায় এখনও একটু একটু দুলছিল। গাঁথুনির গায়ে লোহার আঙটাটায় নৌকোর জংধরা শেকলটা অবিরাম ক্যাঁচকোঁচ করে চলেছে।

ও খুকু—বলে ডাক ছেড়ে অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেল কমলেশ সেনগুপ্ত। তখন পাতালের নিচে থেকে উঠে আসা একটা

পচা গন্ধ পটলের নাকে এসে ধাক্কা দিল। সে ডবল জোরে খুকুকে জড়িয়ে ধরে ওপর দিকে ঠেলতে লাগল। আর কেঁদে ফেলল। বেশ জোরে, আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না। ওঠো। ফিরে চল মা-মি-মা-আ-। কী বিচ্ছিরি আঁশটে পচা গন্ধ নিচের থেকে উঠে আসছে। ফিরে চল হোটেলে মা-মি-মা-আ-আ-। মামি-মাগো-পায়ে পড়ি তোমার।

ততক্ষণে খুকুর আঁচল খসে গিয়ে পুরনো পাথরের ধুলোয় মাখামাখি।

পটলের সঙ্গে যুঝতে যুঝতেও খুকু বলল, ও নিচে গেল যে—এখনও উঠল না। আমি যাব —আমি যাই পটল। ছাড় আমাকে—আমরা যে এখানে ছিলাম।

পটল কোনও কথা না বলে খুকুকে পেছন দিক থেকে ওপরে ঠেলেই যাচ্ছিল। আর পিছোতে পিছোতে খুকু ওপরের উঠেই চলেছিল।

অন্য সিঁড়িটা কিছুটা ওপরে উঠে আবার নিচে নেমেছে। এক সময় পাথরের ধাপও শেষ হল গঙ্গার পাঁক মাটিতে গিয়ে। সেখানেও জংধরা কড়ায় জংপড়া শেকলের ঘসটানিতে অবিরাম ক্যাঁচকোঁচ। অবিকল আরেকটা নৌকো একটু একটু দুলছে। শেকলে বাঁধা।

কমলেশের মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে এল—সব রেডি। পরক্ষণেই মনে পড়ল খুকুকে। ও খুকু-উ-বলে আবার ওপরে উঠতে লাগল কমলেশ সেনগুপ্ত। পড়িমড়ি করে—।

পটল ততক্ষণে খুকুকে ঠেলতে ঠেলতে পাথরের খোলা দরজা দিয়ে চুনাগলির মুখে এনে তুলেছে। বাইরে সন্ধে হতে আর বিশেষ বাকি নেই। দেবালয়ের দিক থেকে কাঁসর ঘণ্টার বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে আসছিল। দু'জনেই ঘেমে একাকার। খুকুর কপালের ওপর দিয়ে চুলের গুছি ঝুলে পড়েছে। ওর ভেতরেও খুকু নিচে নামবে বলে আবার এক ধাপ এগিয়ে এল। সর প-ট-অ-ল—আমরা এখানে ছিলাম যে—

বালক পটল সাবালক হয়ে গেল। সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে খুকুর পেছনে খাড়াই বিশ্বেশ্বর মন্দির দেখতে পাচ্ছিল। চুড়ো সমেত। পরিষ্কার গলায় বলল, এক জেবনে দুটো জন্ম চাইছ কেন মা-ম্মি-ই-মা-আ-।

নয়ন

আপনার বাবা তো বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন?

তা ছিলেন। কিন্তু তাতে হলো কি!

আপনার বাবার নামে একটা পুরস্কার দিন। ফি বছর একজন কৃতী গবেষক সেই পুরস্কার পাবেন।

দিলাম।

এক লাখ টাকা পুরস্কার দিতে আপনার আটকাবার কথা নয়। কিন্তু এক সময় এক টাকাও ফেলনা ছিল না। বুঝলে। তখন ট্রামের মান্থলিখানা পকেটে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরেতাম। বলতাম-কৃপাসিন্ধুর এই তালমিছরি মায়েদের হাতে তুলে দিন। দেশের কোনও বাচ্চার আর কফকাশি হবে না।

নিত?

সব ওষুধের দোকানে গিয়ে বলতাম। ওরা ভাবত আমি কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি কারখানায় কাজ করি। কেউ জানত না—আমি কৃপাসিন্ধুবাবুর ছোট ছেলে নয়নসিন্ধু রায়।

তা এখন তো আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন। ছেলে বসছে—নাতি বসছে—আর আপনার অফিসে বসে লাভ কি? বরং আপনার বাবা কৃপাসিন্ধু রায় কী সামান্য পুঁজি নিয়ে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের বীজ বুনে গিয়েছিলেন—দেশের জন্য। কী করেছিলেন—কত লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন সে সব কথা গবেষণা করে একখানা বই লেখা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু টাকা দিন। তাঁর নামে চেয়ার হোক। লোকে জানুক সেই দেশকর্মীর কথা—যাঁর স্বপ্নকে আপনি এই সত্তর বছর ধরে একনাগাড়ে খেটে বাস্তব জন্ম দিয়েছেন।

বলছ?

আমি আপনার সামান্য কর্মচারী। আপনাদের বিজ্ঞাপন বিভাগে তালমিছরি আর কৃপাসিন্ধু পাচনের কপি লিখি। আমার মনে হয়

তালমিছরি আর পাচনের পেছনে যদি আপনার বাবার একটা ইমেজ হ্যালো যুক্ত হয় তো আমাদের প্রোডাক্টেরই বিক্রি বাড়বে।

বিক্রি বাড়বে কি করে! প্রোডাকশন কোথায় হৃষিকেশ! তোমরা তো ওভারটাইম ছাড়া কাজে মন বসাতে পার না।

দরকার হলে দেবেন। আমাদের বাদ দিয়ে তো আপনার ব্যবসা নয়।

কখনো নয় হৃষিকেশ। বাবা তো তালমিছরির বোরা মাথায় করে এক সময় দোকানে দোকানে গেছেন। তখনকার পুরনো হিতবাদী-বেঙ্গলীর পাতায় বিজ্ঞাপন দেখলে জানতে—বাবা এক গ্রোস তালমিছরির মাঝারি শিশি কিনলে পাইকারদের দুখানা করে গামছা বোনাস দিতেন। এ বোনাসের কথা তিনি বিজ্ঞাপনেই লিখে দিতেন। তখন বাবার পাশে কারা ছিল? কেউ না। আমার ঠাকুর্দা বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। তিনি বিধবা বিয়েতে চটে গিয়ে রাধাকান্ত দেবের দলে ঢুকে পড়েন। তালমিছরির ব্যবসায় তাঁর তো ঘোর আপত্তি ছিল।

আপনারা দীর্ঘায়ুর বংশ।

তা বলতে পার। আমি বাবার অষ্টম সন্তান। আবার শেষ সন্তানও বটে। তাঁর পঞ্চাশ বাহান্ন বছর বয়সে আমি জন্মাই।

আপনার এখন বয়স কত?

সাতানব্বই।

লোকে যে বলে—একশো দশ।

যারা ও কথা বলে—তারা আমায় জন্মাতে দেখেছে? যে কথা বলছিলাম। বাড়ি থেকে বাবা বেরিয়ে এলেন। গ্র্যাজুয়েট হলেন। আর আমার বাবা তালগাছ জমা নিতে লাগলেন গাঁয়ে গাঁয়ে—সেটা বোধহয় সিপাহী যুদ্ধের বছর ছিল।

কি করে জানলেন?

পুরেনো বাড়িতে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে বছর তিরিশেক আগে কয়েকখানা চিঠি দেখেছিলাম।

সেগুলো কোথায়?

হারিয়ে গেছে হৃষিকেশ।

এই তো আপনাদের মুশকিল। বাঙালির ইতিহাস বোধ নেই।

কি হবে ইতিহাস করে। সবাই যে যার মত আলাদা মানুষ হয়ে যাচ্ছে। কারও খোঁজ নেয় না কেউ। আমরা এই ফড়েপুকুরে আছি একশো

তিরিশ বছর। এখানে এক সময় সবাই সবাইকে চিনতাম। এখন কেউ কাউকে চিনি না।

চিনবেন কি করে। আপনার চেনাশুনোরা কেউ আছে কি?

তা অবিশ্যি। কেউ তো নেই। ঘোড়ায় টানা ট্রাম উঠে যেতেই টাউন স্কুলে ঢুকলাম হৃষিকেশ। তখনকার বন্ধুদের সঙ্গে ট্রামরাস্তায় গাদি খেলেছি একদিন। তাদের একজনকে মনে হল, সেদিন গঙ্গার ঘাটে দেখলাম। মুখের আদলটা দেখে মনে হল—থার্ড ক্লাসের রোল ইলেভেন—বিনোদ ঘোষ—খুব বাঘের ডাক ডাকত সংস্কৃত ক্লাসে।

কি করছিলেন?

গঙ্গার ঘাটে চোখ বুজে সন্ধে করছিল। যাক গিয়ে, যা বলছিলাম তাতে ফিরে আসি। বাবার কর্মচারীরাই বাবার পাশে জেগে বসে থাকতেন সব সময়। তেমন কয়েকজনের নামও মনে আছে আমার। নীলুকাকা। জগন্নাথ দত্ত। কপালি জ্যাঠা। এরা বাবার মিছরি জ্বাল দেওয়া থেকে প্যাকিং দেখত। বাবা তো শেষ বয়সে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কেত্তন ধরলেন। দেশশুদ্ধু সবাই তাকে তখন ভক্তিবিনোদ বলে ডাকে। কৃপাসিন্ধু নামটা শুধু তালমিছরি আর পাচনের বোতলের লেবেলেই থেকে গেল।

আপনি বিশ্বভারতী, কলকাতা যাদবপুর—সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার নামে টাকা দিয়ে চেয়ার করে দিন।

কেন? ওখানে কি তালমিছরি জ্বাল দেওয়া শেখানো হবে নাকি?

তা নয়। ওর নামে বিখ্যাত বিখ্যাত লোক এসে গুরুগম্ভীর বিষয়ে বক্তৃতা দেবে। কাগজে বেরোবে। লোকে পড়বে। ভাববে—কৃপাসিন্ধু তালমিছরিতে না জানি কি আছে। লাইন দিয়ে কিনবে।

অনেক বিখ্যাত লোক আসতেন আমাদের বাড়িতে। সবাইকে আমি দেখিনি। তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু—ওঁরা তো বাবার তালমিছরি খেতেনই। শোনা কথা—দেবেন ঠাকুর তাঁর বড় ছেলে দ্বিজুবাবু-ওঁরাও নিয়মিত তালমিছরি খেয়েছেন, গান্ধীজির নামে মাসে দু শিশি নিয়মিত আমিও ওয়ার্ধায় পাঠিয়েছি।

রামকৃষ্ণ? বিবেকানন্দ? ওঁরা খেয়েছেন কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি?

তা জানি না হৃশিকেশ। তবে বাবা যখন আমাদের ছোটবেলায় মিছরি ডিস্টিল করার বিলিতি মেশিন বসালেন— তখন একদিন সিস্টার নিবেদিতা ভিজিট করেছিলেন। স্যার জগদীশ সঙ্গে করে এনেছিলেন ওঁকে।

কোনও ফটো আছে?

না।

ওঁদের দেওয়া কোনও প্রশংসাপত্র?

এমনি ভাল বলে চিঠি দিতেন মতিলাল নেহরু। কিন্তু সেসব চিঠি তো রাখিনি হৃষিকেশ। পুরনো বাড়ি থেকে কারখানা উঠে এল নতুন বাড়িতে। তখনই তো সব হারিয়ে যায়। ওই পুরনো বাড়িতে এ সময় বাবা-কাকারা আমাদের নিয়ে সংসার করেছেন। কলকাতায় এসে বালগঙ্গাধর তিলক একবার ওই পুরনো বাড়িতে আমাদের কারখানা দেখতে এসেছিলেন।

ছবি তুলে রাখবেন তো!

কোথায় ক্যামেরা তখন! গুচ্ছের কাঠ আর কয়লা থাকত। বড় বড় কড়াইয়ে সারাদিন জ্বাল হচ্ছে। আমরা ছোটরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ি। তিনি এসেই পেটাতেন। এটাই ছিল ভাল মাস্টারের লক্ষণ! আর সাত বৌদির সংসার তখন। সারা বাড়ি যেন গঙ্গার ঘাট।

নতুন বাড়িতেও তো পঞ্চাশ বছর হল উঠে এসেছেন।

তার বেশি হৃষিকেশ। ও বাড়ি তৈরি থার্টি ফাইবে। আমার নিজের হাতে করা। গান্ধীজিকে দিয়ে ওপেন করাই। তখন এ আই সি সি হলে মোটা চাঁদা ধরে দিতাম। নতুন বাড়ি করে থার্টি ফাইবে কলকাতার বাইরে এই বাগানটা কিনি। তারপর আস্তে আস্তে আশপাশের জায়গা কিনে এই সিন্ধু গার্ডেন তৈরি হয়েছে। এই যে তে-মহলা বাড়ি দেখছ-একদিনে হয়নি। আস্তে আস্তে হয়েছে। আমি একটা একটা করে ফলের গাছ বসিয়েছি। নাবি জমি দিঘি কেটে ভরাট করেছি। দিঘিতে মাছ ছেড়েছি। নৌকো ভাসিয়েছি। একবার সে নৌকোয় সুভাষ এসে চড়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুদিন আমার বাড়ি কাটিয়ে যায় এখানে। ঠিক ত্রিপুরি কংগ্রেসের আগে।

পুরনো বাড়ির সামনে নতুন বাড়িও তো পুরনো হয়ে যাবে।

কেন? কেন হৃষিকেশ?

বাঃ! আপনার ছেলে—আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনি যে আরেকটা বাড়ি তুলছেন। সে বাড়িও তো কমপ্লিট হয়ে এল। মাটির নিচে তিনতলা সেখানে মডার্ন প্ল্যান্ট বসবে। ওপরে দশতলা।

কুসুমসিন্ধুর বাড়ি?

হুঁ। ও বাড়িতে কারখানা, অফিস উঠে গেলে আপনার বানানো নতুন বাড়িকে তো সবাই পুরনো বাড়ি বলবে।

তাও তো বটে হৃষিকেশ। এটা তো ভাবিনি। দ্যাখ— আমার বাবা কৃপাসিন্ধু রায়— রাজা দিগম্বর মিত্তির—চেনো ?

কোত্থেকে চিনব ?

রাজা দিগম্বর মিত্তির মাইকেল বিলেত গেলে তাঁর বিষয় সম্পত্তি দেখার ভার নিয়েছিলেন। কথা ছিল মাইকেলকে সময়মত টাকা পাঠাবেন। তা তো ফেল করলেন। যে জন্যে মাইকেল বিদেশে বিপদে পড়েন। তা বাবা রাজা দিগম্বর মিত্তিরের কাছ থেকে জায়গাটা লিজ নিয়ে সেখানে সুরকি আর ঘেঁষ দিয়ে দোতলা বাড়িটা তোলেন। ওই বাড়িই ছিল তাঁর নতুন বাড়ি। ওখানেই জয়েন্ট ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেন। মিছরি জ্বাল দিতেন। আবারও বাড়ি থেকেই তিনি ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সাহেবরা বিলেতে বসে জোট পাকাল। বাবার মিছরি চললে ওদের শিশি ভর্তি কফ সিরাপ চলে না। ছোটলাট ডেকে পাঠালেন বাবাকে।

আজ উঠি। অনেকটা পথ যেতে হবে, এমন জায়গায় সিন্ধু গার্ডেন বানালেন।

কেন ? পরিস্কার বাতাস। কোনও গোলমাল নেই। এখানে বসে আমার ছোটবেলার প্রিয় বইগুলো পড়ি। আচ্ছা হৃষিকেশ—আমায় এককপি 'দারোগার ডায়েরি' জোগাড় করে দিতে পার ?

ও বইয়ের নামই শুনিনি।

তা শুনবে কোত্থেকে ! ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগের ছেলে বুড়ো সবারই ও বই ছিল হট ফেবারিট।

হৃষিকেশ—হৃষিকেশ বসু—বয়স তেতাল্লিশ—কৃপাসিন্ধু তালমিছরির বিজ্ঞাপন এক্সিকিউটিভ এতক্ষণ সিন্ধু গার্ডেনের ভেতরে বিরাট তেতলা বাড়ির একতলার ঢাকা বারান্দায় বসে নয়নসিন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল। দেওয়ালে ঘেরা প্রায় দেড়শো বিঘার সিন্ধু গার্ডেন। এখন বেলা প্রায় বারোটা। রোদে আরাম। মাঘ মাস। নয়নসিন্ধুর মাঠ থেকে ধান কেটে চাষিরা ফিরছে। মাথায় ধানের বোঝা। তার ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ। এল টাইপের বিরাট বারান্দার আরেক দিকে একটা কালার টিভি খোলা। গাভাস্কার ছক্কা মারল। তার সামনে কয়েকটা ধানের বস্তা। ধানের বস্তার পাশে চাষিবাড়ির কচিকাঁচারা অবাক চোখে ক্রিকেট খেলা দেখছে। যে খেলার তারা কিছুই বোঝে না। সিন্ধু গার্ডেনের বাইরে হাইওয়ে দিয়ে বাস যাচ্ছে বনগাঁয়। ফিরছে কলকাতায়। তাদের ইলেকট্রিক হর্ন।

হৃষিকেশ বুঝতে পারল না—বাড়িতে আর লোক আছে কি না।

এটা তো ঢাকা বারান্দা। তাকে এগিয়ে দিয়ে সাতানব্বুই বছরের নয়নসিন্ধু রায় সেই বারান্দায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, তার চেয়ে নয়নসিন্ধু মাত্র চুয়ান্ন বছরের বড়। নয়নসিন্ধুর কলকাতা, লখনউ, কানপুর, এলাহাবাদ, জামশেদপুর কারখানা ধরলে মোটামুটি চার হাজার কর্মচারী। এই চার হাজারেরই একজন হৃষিকেশ। তাকে এগিয়ে দিতে নয়নসিন্ধুর সিঁড়িতে এসে না দাঁড়ালেও চলত। বয়স মান সম্মান ক্ষমতা সব দিকেই নয়নসিন্ধু তার চেয়ে অনেক বড়।

একবার সন্দেহ হল - নয়নসিন্ধু বোধহয় জানেন না-তিনি কতটা বড়। শীতের রোদের নরম আরাম নয়নসিন্ধুর গায়ের গরম শাল থেকে ঝরে পড়ছে যেন। সাতানব্বুই বছরের পুরনো পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যান্ডেল। গায়ের ফতুয়াটি উলিকটের। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল হৃষিকেশ। অর্ধেক নামিয়ে দেওয়া পর্দার মতই দুই চোখেই দুটি পাতা অর্ধেক নেমে এসে আজ তিরিশ বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। চোখ বুজতে পারেন না নয়নসিন্ধু। ডান চোখে জল কাটছে সবসময়। একটু বা পিচুটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সিবা কোম্পানির নেমন্তন্ন রাখতে সুইজারল্যান্ড বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন সিবার চেয়ারম্যান নয়নসিন্ধুকে নিয়ে বরফঢাকা সুদূরপাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যান। হিমবাহ দেখাতে। ঠাণ্ডায় তখন চোখদুটো জখম হয়। তারপর বয়স। এখন অমন চোখ খোলা রেখেই ঘুমোন নয়নসিন্ধু। ঘুম এলে বড়জোর একখানা কালো সিল্কের রুমাল চোখের ওপর ফেলে রাখেন।

ঠাণ্ডায় তখন চোখ দেখে নয়নসিন্ধুকে বোঝার উপায় নেই কোনও। মুখে হাসি। সরু ঠোঁট। টিকালো নাক। চিবুকের নিচে কোনও মেদ জমেনি বা জমলেও তা শুকিয়ে এসেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে।

কাছেপিঠে কোথাও কেউ নেই। দেওয়ালে নয়নসিন্ধুর বউয়ের ছবি। তিনি নেই তাও বিশ বাইশ বছর হয়ে গেল। ছেলে কুসুমসিন্ধু সকাল সকাল চানটান করে সেই যে গাড়ি নিয়ে বেরোন-সারাটা দিন কলকাতায় থেকে ফেরেন রাতে। নাতি-নাতনিদের বিয়ে সব সারা। তারা সবাই থাকে সাউথ ক্যালকাটায়। সব আটদশ তলার ফ্ল্যাটে।

একতলা রসুইঘর আলাদা। তার সামনে একটা হরিতকি গাছ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিজেই বাতাসে পাতা মেলে দিয়ে কাঁপছে। গাছতলায় একজন লোক হাতা খুন্তি বের করে দিল।

হৃষিকেশ ফস করে বলল, আপনার কত টাকা আপনি জানেন?

না। তুমি জানো নাকি ?

আমরা জানব কোত্থেকে।

আমাদের খরচা কত জানো ? মাস গেলে মাইনে দিতে হয় তোমাদের। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, মেডিকেল— সব টাকার ব্যবস্থা করতে হয় হৃষিকেশ। এর মধ্যে আছে তোমাদের গো স্লো, স্ট্রাইক। কাজের সময়টা বসে থেকে পরে ওভারটাইমে কাজ করা। সবই তো জানো।

আপনার কত কর্মচারী জানেন ?

না ! এখন আর জানি না। বছর চল্লিশেক আগে একবার কলকাতার কারখানার আটচল্লিশ জনকে স্ট্রাইকের পর ছাঁটাই করতে হয়েছিল। তখন সব জানতাম। এখন তো আমায় সব জানানো হয় না। এলাহাবাদে একবার প্ল্যান্ট বন্ধ রেখে দিই পাকা একবছর। তাতে তিনশোর মত ওয়ার্কার ছেড়ে চলে যায়।

অসম্ভব।

আপনার হাতে কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি ব্যবসা দশগুণেরও বেশি বেড়েছে। দিন না আপনার বাবার নামে একটা গবেষণা বৃত্তি। যাকে বলে একটা স্কলারশিপ বা প্রাইজও দিতে পারেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আপনার বাবার ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন করব—

যুগজয়ী কপালকুণ্ডলার স্রষ্টার সহপাঠীর অমর সৃষ্টি।

ভাল বলেছ তো হৃষিকেশ। বাবার তালমিছরি কপালকুণ্ডলার মতই টিকে আছে বাজার। কত তালমিছরি এই একশো বছরে এল গেল। আমিই তা দশবারো রকমের তালমিছরি দেখলাম। তারা এল। আবার চলেও গেল।

তাহলে কৃপাসিন্ধু প্রাইজ চালু করছেন ?

না ! এক লাখ টাকা পেয়ে নয়ছয় করবে। যাকে প্রাইজ দেব তার মাথাটি খাওয়া হবে। কি দরকার ! বেচারা এখন তবু করেকম্মে খাচ্ছে।

আমি চলি আজ।

আমার লাইব্রেরি দেখবে না ?

আরেকদিন এসে দেখব।

তাহলে আমগাছগুলো দেখে যাও। সব কলমের আম। ল্যাংড়া, কোহিতুর।

—আবার তো আসছি। তখন দেখব। আজ আসি।

॥ দুই ॥

এই যে টেলিফোনটা দেখছ — এটা তুললেই বাবার সঙ্গে কথা বলা যায়।

হৃষিকেশ এসেছিল সিটি অফিসে। ফাইলপত্তর নিয়ে। নর্দার্ন টেরিটোরির হিন্দি কাগজগুলোয় কৃপাসিন্ধু তালমিছরির ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন কেমন যাচ্ছে তাই দেখাতে।

কাঠের প্যানেল লাগানো ঢাউস ঘর। এয়ারকন্ডিশনড। বাইরে এখন চৈত্র মাসের জ্যান্ত বি-বা-দি বাগ দপ দপ করছে। ভেতরে পেল্লাই এক হর্স সু টেবিলের একদম সেন্টারে দশাসই কুসুমসিন্ধু বসে। নাভি থেকে মাথা অব্দি লোকটা তিন ফুটের বেশি হবে। পা থেকে মাথা অব্দি ধরলে সওয়া ছ ফুট লম্বা। বছর পঁয়ষট্টি বয়স। দেখলে বোঝার উপায় নেই। এখনও দিনে তিনশো বৈঠক আর তিনশো বুকডন দিয়ে থাকেন কুসুমসিন্ধু। তাই তো শুনেছে হৃষিকেশ। রীতিমত পেটানো শরীর। খদ্দরের কলার তোলা পাঞ্জাবি। নিচে চাপা পাজামা।

হৃষিকেশ বসু বলল, এই দশ মাইল রাস্তা হট লাইন বসানো?

হুঁ। বাবাই ব্রিটিশ আমলে গভর্নরকে বলে এই ব্যবস্থা করে নেন। তখন ইংরেজদের এককথায় সব হত। আমরা কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়েছি আবার ব্রিটিশ ওয়ার ফান্ডেও চাঁদা দিতাম। কত ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয়। তাঁর পরামর্শ লাগে এখনও। মিছরি কনফেকশনারি জগতে বাবা একজন লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। আর আমার কাছে কে জানো?

না।

আমার কাছে লিভিং গড্।

হৃষিকেশ মনে মনে বলল, তা তো বটেই।

কুসুমসিন্ধু বললেন, দ্যাখো বাবা এখনও নিয়ম করে বেলা দশটায় অফিসে যান। পাঁচটা অব্দি থাকেন। আমার ছেলে অলকসিন্ধু তোমাদের জেনারেল ম্যানেজার। সেও বেলা দশটায় অফিসে যায়। শুধু যাই না আমি। আমি আসলে একটি রাসকেল। ভাগ্যবান রাসকেল। নয়ত এমন বাবা-এমন ছেলে পাওয়া যায়? আমি বেলা বারোটা একটায় এ-অফিসে এসে দাবা খেলি। বিকেল পড়লে দাবার কোট মুড়ে বাড়ি ফিরি। বাই-দি-ওয়ে— তুমি দাবা খেলতে পার?

না। কোনওদিন শিখিনি।

শিখে রাখবে তো। শেখা থাকলে তোমার সঙ্গে বসে খেলা যেত একহাত। যাক। বিজ্ঞাপনগুলো দেখাও।

হৃষিকেশ মেলে ধরল। সব কটা বিজ্ঞাপন দেখে বললেন, কোনও বিজ্ঞাপনেই দেখছি মেয়েছেলে নেই। কেন?

তালমিছরি তো মেইনলি বাচ্চারা আর বুড়োরা খায়।

মেয়েরা খায় না কে বলল তোমায়? এই তোমার বুদ্ধি!

বয়স্ক বুড়িরা খায়।

তাই বলে ওদের ছবি দিও না বিজ্ঞাপনে। অল্পবয়সী মেয়ে বউরা তো তালমিছরি ফুটিয়ে খেতে দিতে পারে।

তা পারে।

তাহলে তাদের ছবি দাও। ভাল ফিগারের মডেল নিয়ে তাদের বউ সাজাও। সাজাও মিছরি ফোটানোর প্যান হাতে ছবি তোল। দরকার বুঝলে দুতিন মিনিটের অ্যাড ফিল্ম তোলাও। কি বলছি বুঝতে পারছ? বউদির বোন-কলেজ গার্লও সাজাতে পার মডেলদের। বুঝেছো?

বুঝেছি।

এই তো চাই। তুমি শার্প ব্রেইনের ছেলে। তুমি সব বুঝবে। আমি চাইছি কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি নিয়ে বিজ্ঞাপনে কিছুটা সফট্ পর্নোও মেলানো হোক। আজ-কাল বউ মেয়েরাই তো বাজারহাট করে। ওই বিজ্ঞাপন দেখলে তারাও ঢলবে। কি বল?

ঠিক বলেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান কি অ্যাপ্রুভ করবেন?

বাবাকে দেখাবার দরকার নেই। তাঁর এখন বয়স হয়েছে। ওঁকে টেনশনে ফেলা উচিত হবে না।

কিন্তু চেয়ারম্যান যে পুরনো লেবেল আঁকড়ে আছেন। বলেছেন মান্ধাতার আমলের ওই লেবেল দেখেই খদ্দের আমাদের চেনে।

খদ্দেরও পাল্টাচ্ছে। ওই লেবেলের খদ্দেররা তো কবেই মরে হেজে গেছে। এখনকার খদ্দের তো এখনকার মত লেবেল চায়। এই নিয়ে মার্কেট সার্ভে করিয়ে নাও না।

বেশ তো।

যতদিন না সার্ভে রিপোর্ট পাচ্ছ ততদিন পুরনো বোতলগুলো থাকুক। আর বিজ্ঞাপনে ওই সফট্ পর্নোর ফরমুলা ফলো কর।

এয়ারকন্ডিশন ঘর থেকে রাস্তায় নেমে ঝরেঝরে রোদের ভেতর পড়ল হৃষিকেশ। অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে। যাতায়াত গাড়িতে। ভাবতে গিয়ে

আশ্চর্য হয় সে। সামান্য তালগাছের দৌলতে এত কাণ্ড। কৃপাসিন্ধু তালমিছরির গ্রস ব্যবসা করে প্রায় পঞ্চাশ কোটির।

অথচ সে তালগাছের জন্য এত কিছু - সেই তালগাছ কটা লোক আর যত্ন করে লাগায়। বেশির ভাগ গাছই তো মানুষের চুষে ফেলে দেওয়া আঁটি থেকে জন্মায়। কিছু আঁটি বাদুড় খেয়ে ছড়িয়ে দেয়। আর খায় শেয়াল। তাল তলার পাকা তাল নিশুতি রাতে শেয়াল এসে খায়। সেই তাল গাছের জটা চেঁছে রস ভরা হয় কলসিতে। কিছু যায় তাড়িতে। বাকিটা গুড়ের লাইন ধরে। ওই রস ধরে প্ল্যান্টে চাপাতে হয়। তাই দানা বেঁধে মিছরি হয়। এই মিছরির দৌলতে কৃপাসিন্ধুর তালমিছরিতে এত লোকের রুজিরোজগার, তার গাড়ি চরা। নয়নসিন্ধুর সিন্ধু গার্ডেন কলকাতার বুক থেকে সিন্ধু গার্ডেন অব্দি কুসুমসিন্ধুর দশ মাইলের হট লাইন। আমাদের মাইনে।

ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মিছরি এ কি তোমার অপার করুণা। তুমি সব পার মিছরি। কত লোহা বেচলে তবে পঞ্চাশ কোটি হয়। কত দুধ, মধু বেচতে পারলে তবে পঞ্চাশ কোটি।

হৃষিকেশ বেরিয়ে পড়লে কুসুমসিন্ধু পাশের ঘর থেকে তার প্রাইভেট সেক্রটারিকে ডাকলেন, ফোন তুলে। ঘরে এসে ঢুকল সুধাংশু গুহ। ঢিলেঢালা জামা গায়ে। হাসিখুশি মুখ।

ডেকেছেন ?

আয় বসে যাই।

এই ফার্স্ট আওয়ারেই দাবা খেলতে বসে যাবেন ?

কেন ? তোর আপত্তি আছে ? তুই আমাদের প্ল্যান্ট ফোরম্যান ছিলি। মিছরি জ্বাল দিতিস।

আমি একজন কেমিকাল ইনজিনিয়ার।

ওই একই হল। মিছরিও তো একটা কেমিকাল। তাই না ?

হুঁ।

তুই মাইনেও পাচ্ছিস-মিছরিও জ্বাল দিতে হচ্ছে না তোকে, তোফা দাবা খেলে যাচ্ছিস আমার সঙ্গে। আবার কি চাই। অ্যালাউন্স পাস সবার চেয়ে বেশি।

তার বদলে আপনার হয়ে কত কাজ করি বলেন।

সে তো কিছু করতেই হবে সুধাংশু। এবার একবার একটা রাউন্ড দিয়ে আয়।

কোথায় ?

গৌহাটি, ভুবনেশ্বর, পাটনায়-ওরাও তো নিচ্ছে কৃপাসিন্ধুকে। দাবার কোট মেলে দিতে দিতে সুধাংশু বলল, নিতেই হবে। না নিয়ে ফসকে যাবার কোনও পথ রাখিনি যে—

সবাই তোর হাত যশ সুধাংশু। ওই জন্যে তোকে ভালবাসি। চেহারাটা অমন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে কেন ?

হবে না ? ষাট তো হল দু বছর।

বাষট্টি হয়েছে তোর সুধাংশু ?

হওয়ার তো কথা। আপনি যখন বঙ্গবাসীতে ফি বছর ফেল করছেন তখনই ফার্স্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হয়ে আপনার কথা শুনলাম।

কী নিয়তি বল তোর ! সেই ফেলু বসের কাছে সারাটা জীবন চাকরি করে চলেছিস।

সাঁইত্রিশ বছর হয়ে গেল।

খেলা যত জমতে লাগল-ততই কথাবার্তা কমে এল। এরপর শুধু এয়ারকুলারের একটানা ঝিমঝিম শব্দ। কৃপাসিন্ধুর তালমিছরির পৃথিবী বিবাদী বাগের এই কাঠের ঘরে ঠাণ্ডায় থেমে থাকল।

খেলতে খেলতেই কুসুমসিন্ধু বললেন, হ্যাঁরে সুধাংশু, অফিসের ক্যান্টিনটা একটু দেখবি !

পারব না। ওসব ঘুঘুর বাসায় হাত দিয়ে হাত পোড়াব ?

তুই দেখলে ঠিক হয়ে যাবে। রাত আটটার পর একখানা টোস্টও পাওয়া যায় না।

ওখান থেকে অফিস নতুন বাড়িতে উঠে না এলে ও রকম অবস্থাই থাকবে।

নতুন বাড়ি কবে হবে বলতে পারেন ?

আর ছমাসের ভেতর কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখিস।

ততদিন ক্যান্টিন ওরকমই থাকবে।

দিনে হাজার তিনেক টাকা সাবসিডি দিতে হয়, তুই একটু দ্যাখ।

পাড়ার ভেতর অফিস থাকায় পাড়ার সব বৌদিরা পনের পয়সায় ডিমসেদ্ধ কিনে নিয়ে যাচ্ছে সব। বাড়ি নিয়ে তোফা ডিমের ডালনা।

বলিস কিরে।

বলছি সত্যি জেনে রাখুন।

তুই তো আবার সত্যি ছাড়া কিছু বলিসই না।

ঠাট্টা করেন করুন। এ বান্দা সত্যি ছাড়া কিছু বলে না জানবেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এটা দাবা খেলা। এ কিন্তু সাধারণ দাবা নয়। এ খেলায় সুধাংশু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এগিয়ে যায় গোড়ায়। তারপর একসময় হিসেব কষেই হারতে থাকে। পাছে কুসুমসিন্ধুর সন্দেহ হয়। তাই ধাপে ধাপে হারতে থাকে সুধাংশু। সে জানে-মালিকের সঙ্গে খেলায় কখনও জিততে হয় না। জেতা উচিত নয়।

খেলতে খেলতেই সুধাংশু এক সময় বলল, কেষ্টবাবুকে ধরার কি হল ? এটা একটা ব্যাড প্রিসিডেন্স হয়ে থাকল কিন্তু।

কুসুমসিন্ধু বলল, হুঁ।

রোজ কেষ্টবাবুকে নিয়ে দাবা খেলতে বসতেন। এদিকে দিব্যি তিন লাখ টাকা চোট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তা তো গেল। বলেই চাল দিলেন কুসুমসিন্ধু।

এবার সামলা—

তা সামলাচ্ছি। কিন্তু কেষ্টবাবুর মত চিটরা যদি শাস্তি না পেয়ে পার পেয়ে যায় তো আপনি অ্যাডমিনস্ট্রেশন রাখতে পারবেন ? একটা নয় - দুটো নয় - তিন তিন লাখ টাকা মেরে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছু হল না।

দাবার কোট ছুড়ে ফেলে দিলেন কুসুমসিন্ধু। কী সেই থেকে ভ্যান ভ্যান করছিস। খেলায় মন নেই। মেরেছে মেরেছে তিনলাখ টাকা। বেশ করেছে। আমরা তোদের মত গরিব নাকি! বেশ করেছে মেরেছে।

ভেতরে ভেতরে খাবি খেয়ে গেল সুধাংশু। সে কৃপাসিন্ধু মিছরিতে সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী। রিটায়ারের পরেও আছে। অত্যন্ত দায়িত্বশীল বিশ্বাসী কর্মচারী। কিন্তু এ কোন বসকে সেবা করছে ? যে কিনা নিজের ভাল বোঝে না। বললে চটে যায়। চটে কারণ, আমদানি এতই বেশি যে দু চার লাখ এদিক ওদিক হলেও কিছুই যায় আসে না। তবু — তবু একটা কথা থেকে যায়।

দু-চার হাজার টাকা এদিক-ওদিক সুধাংশু করে থাকে। কিন্তু তাই বলে তিন তিন লাখ টাকা ? আর সেকথা মনে করিয়ে দিতে এত অপমানের ঝামটা।

মনে মনে গুমরে উঠল সুধাংশু। সে আর কোনওদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে না কিছু। ভুগুক। ভুগে যদি শিক্ষা হয়। বড়লোককে শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন।

॥ তিন ॥

ক্যালকাটা ক্লাবে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল ব্যবসা পরিচালনায়। মেয়র মুখ্যমন্ত্রী দুজনেই মঞ্চে উঠে বসবার সময় নয়নসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাল আছেন তো।

নয়নসিন্ধু বললেন, আর ভাল!

খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার, টি. ভি.-র ক্যামেরাম্যান এত ফ্ল্যাশ ঝলসাতে লাগল — আলোয়, গরমে — ডায়াসের ওপরেই নয়নসিন্ধু ঢলে পড়নে। ভাগ্যিস অনুষ্ঠানের কর্তাদের একজন ধরে ফেলে তাঁকে।

শ্রোতাদের ভেতর বসেছিল অলকসিন্ধু। সে অস্ফুটে বলল, দাদু।

তার পাশেই বসেছিল নয়নসিন্ধুর সেক্রেটারি রঘুনাথ। অলকসিন্ধুকে ঘাবড়াতে দেখে রঘুনাথ বলল, ভয় পাবেন না। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

রঘুনাথ ভিড় এড়িয়ে ডায়াসে চলে এল। তার হাতের ডাকে ক্লাবের দুই বেয়ারা স্ট্রেচার হাতে একদম জায়গায়।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধুকে তাতে শুইয়ে নিয়ে বেয়ারারা ছুটল। ক্লাব অ্যাম্বুলেন্স বলেই রেখেছিল রঘুনাথ। এক ফাঁকে বেলভিউয়ে একটা ফোন। সেখানের নয়নসিন্ধুর নামে আস্ত একটা সুট বুক করা আছে। জ্ঞান হারাবার মিনিট পঁচিশের মাথায় দেখা গেল বেলভিউয়ের দুতলায় নয়নসিন্ধুকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার মাটির নিচে টেলিফোনের তার। সেই তার দিয়ে কুসুমসিন্ধুর গলা ভেসে গেল কৃপাসিন্ধু তাল মিছরির পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে। বাবাকে বেলভিউয়ে নেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ স্যার, রঘুনাথবাবু সভায় ছিলেন। উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন।

ওকে বলে দিও—বাবাকে যেন এমন আর কোনও ভিড়ের জায়গায় নিয়ে না যায়। বয়সের কথা তো ভাবতে হবে।

ওপাশ থেকে ভেসে এল—বলে দেব।

কাল সকালে ফুল পাঠিয়ে দিও বেলভিউয়ে আমার নামে। সঙ্গে বেলফুলের মালা দেবে। বাবা পছন্দ করেন।

নিশ্চয় পাঠাব।

ধড়াম করে ফোনটা ক্রেডলে ফেলে দিয়ে কুসুমসিন্ধু চেঁচিয়ে বললেন, এবার আমার চাল। তাই না?

তিনজন মোসাহেব একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে কুসুমসিন্ধু দাবড়ে উঠলেন। কতদিন বলেছি-দাবা খেলতে

বসে স্যার স্যার করবি না।

দাদু অ্যাম্বুলেন্সে রওনা হয়ে যেতেই অলকসিন্ধু তার নীল রংয়ের নাক নিচু মারুতিতে গিয়ে বসল। গাড়িটা এপথ সেপথ শুঁকতে শুঁকতে নীলমণি মিত্র লেনে একটা মুদিখানা পার হয়ে দাঁড়াল। অলকসিন্ধু বেড়ালপায়ে টুপটাপ করে ওপরে উঠে এল। বাড়িটার সদর সবসময় খোলা থাকে। কারণ, এজমালি বাড়ি।

বাড়ির যে পোরসনে অলক ঢুকবে তার সদর দরজাও খোলা। সামনের ঘরখানায় কোনও ফার্নিচার নেই। একটা ছেঁড়া মাদুরে সেখানে একটি মেয়ে ঘুমিয়ে। তার হাতের পাশে একটি সেতার। মেয়েটির ডান হাতের আঙুলে মেজরাব পরানো।

এই টুকু— ওঠো। ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে বসল মেয়েটি। আমি যাব না।

কী বোকামি করছ। এই সন্ধেবেলায় কেউ ঘুমোয়।

না আমি যাব না।

তুমি তো আসতে বললে। আজ তোমায় বিলায়েতের কাছে নিয়ে যাব। পছন্দ হলে তিনি তোমায় তাঁর ছাত্রী করে নেবেন। কজনের ভাগ্যে এটা জোটে টুকু।

সবই আপনার পরিচয়ে হচ্ছে। বিলায়েত তো আমার বাজনা শোনেননি।

এবার শোনাবে। বোকা মেয়ে। যাও মুখ ধুয়ে চুল বেঁধে এস। তাড়াতাড়ি।

আমি যাব না। আমার ডিভোর্স এখনও হয়নি। সেপারেশন চলছে সবে। শেষে সেতার শেখাতে নিয়ে গিয়ে আপনি আমার প্রেমে পড়ে যাবেন। তখন আরেকটা গোলমাল বাধবে। আমার সাধের সেতার শেখা তখন শিকেয় উঠবে। আপনি যান।

না না। আমি প্রেমে পড়ছি না। আমি ম্যারেড তুমি জানো টুকু। আমার একটি সাত বছরের ছেলে আছে।

ম্যারেডরাই বেশি করে আমার প্রেমে পড়ে অলকবাবু। আমি জানি। এতদিন তাই দেখে আসছি। আমি গোড়া থেকেই সাবধান হতে চাই।

পাশের ঘর থেকে গলা ভেসে এল। কার সঙ্গে কথা বলছিস টুকু ?

অলকবাবু এসেছেন।

ওমা ! বলতে হয়— বলতে বলতে মাঝবয়সী এক মহিলা উঠে

এলেন। দেখলেই বোঝা যায় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। এঘরে এসে বললেন, কখন এসেছোন? টের পাইনি। বোসো। ও টুকু, যা তো মা চা করে আন। গরম সিঙাড়া আনবো? ভাল ভাজে এখানে—

সিঙাড়া খাই না আমি। দেখুন তো বিলায়েতের সঙ্গে কথা বলে সময় ঠিক করে এসেছি-এখন বলছে যাব না।

আমার মেয়ে একটু খেয়ালী আছে বাবা। ক্ষমা করে নিও। ও ঠিক যাবে। এই মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছি। একখানা বড়ির অংশ কামড়ে পড়ে আছি। কোথাও তো যাবার জায়গা নেই। বিয়ে দিলাম— তা ওর সেতারের পিড়িং পিড়িং শ্বশুরবাড়ির সহ্য হল না। ফিরে এল। জামাইয়ের যত বদবুদ্ধি। ভাগ্যিস সময়মত মেয়েটাকে নিয়ে এসেছি।

আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি আছি। ওর বাজনা আমি শুনেছি।

কোথায় শুনলে বাবা?

ওর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমার দাদুর বাড়ি বাজাতে গিয়েছিল গত বছর-সিন্ধু গার্ডেনে।

ও। সেখানে তো আমি ছিলাম। ভিড়ের ভেতর দেখতে পাওনি। কত বড় বাড়ি তোমাদের—

আমরা ওখানে থাকি না। আমি থাকি লেক গার্ডেনে।

মা বাবা?

মা থাকেন ক্যামাক স্ট্রিটে। বাবা দাদুর কাছে থাকেন। দিনের বেলায় মাঝে মাঝে ক্যামাক স্ট্রিটে যান।

কত বাড়ি তোমাদের। এই সেতার বাজনা নিয়েই ওর সঙ্গে শাশুড়ির লাগল। জামাইয়ের মশল্লাপাতির দোকান। একদিন বাড়িতে কজন ব্যবসাদার নিয়ে এসে টুকুকে বাজাতে বলল। বোতলটোতল দেখে টুকুর তো চক্ষুস্থির। বলল, এখানে আমি বাজাবো না। অমনি মারধর। সেতার ভেঙে দিতে চেয়েছিল।

সময়মত নিয়ে এসে খুব ভাল করেছেন। নযতো একটা প্রতিভার মৃত্যু হত।

কি বললে?

প্রতিভা। ট্যালেন্ট।

অ। আমি বলি কি বাবা—বাঙালির ঘরের মেয়ে। দেখতে শুনতে খারাপ নয় আমার মেয়ে—

খারাপ কে বলেছে।

ওর বাবার কাছে সেতার শিখেছিল। তা উনি তো অকালে চলে গেলেন। বয়সটাও এখন খারাপ টুকুর। তারপর সেতার বাজায়। তোমরা বলছ দেখতে খারাপ নয়—

আলবত।

তাই বলছিলাম — এই মেয়ের ভেসে যেতে কতক্ষণ বাবা।

তা কেন? সেতার শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

কোথায় দাঁড়াবে? মাটি কোথায়? তাই বলছিলাম — তোমার পায়ে যদি ওকে একটু জায়গা দিতে—

তড়াক করে পিছিয়ে গেল অলকসিন্ধু। আমি বিবাহিত। আমার একটি ছেলে আছে।

জানি। আমি সব শুনেছি টুকুর মুখে। আর শুনতে হবে কি। তোমাদের এতবড় নামকরা পরিবারের কথা সবাই জানে। আমার বাবাই তো কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি খেয়ে গেছেন সারা জীবন। আমি নিজে খুকিটি থাকতে দেখে এসেছি।

লোকে কি বলবে? আইন?

আইনে না গেলেই হল। আর লোকের কথা। একটাই তো জীবন। তোমাদের পয়সা আছে। বৃহৎ কাঠে দোষ বর্ষায় না বাবা। টাকা সব মুছে দেবে। টুকুকে না হয় এখানেই রাখলে। খরচ খরচা দিলে। আমি দেখাশোনা করব। চোখের ওপর থাকবে মেয়েটা। তুমিও আসবে যাবে। জামাই যেমন যায় আসে।

কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। হ্যাঁ বাবা— তোমার কাছে কিছু টাকা হবে? টুকু সেতার শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ালে তোমার পাই পয়সা শোধ করে দেব। দাও। তাড়াতাড়ি দাও। এরপর টুকু এসে গেলে অনর্থ হবে।

অলকসিন্ধু পকেট থেকে না গোনা একগোছা একশো টাকার নোট টুকুর মায়ের হাতে তুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা আঁচল বেঁধে ফেললো। তখুনই টুকু চায়ের কাপ হাতে ঢুকল। দেখুন তো চিনি ঠিক হল কিনা। আপনার তো আবার লাইট লিকার চাই।

এক চুমুক দিয়ে অলকসিন্ধু বলল, পারফেক্ট। এবার তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও তো।

সন্ধে নাগাদ খবরটা অফিসে চলে আসে। বড়সাহেব অসুস্থ। বেলভিউয়ে হৃষিকেশ টেলিফোন করল দূরদর্শনে। আকাশবাণীতে। খবর এলেই জানাব। যদি কিছু এখুনি হয়ে যায় তো আমরা গিয়ে খবর দিয়ে আসব। বেশি রাতের বুলেটিনে ধরিয়ে দিতে হবে। এক লাইন হলেও ধরিয়ে দেবেন কপিগুলি।

ছ ছটা প্যাকেটে ছবি সমেত অবিচুয়ারি রেডি করা আছে। তিনটে বাংলা-আর তিনটে ইংরেজি কাগজের জন্য। জন্ম ১৮৯০। পিতা কৃপাসিন্ধু রায়। আট ভাইয়ের ভেতর সর্বকনিষ্ঠ। কৃপাসিন্ধু তালমিছরির বড় হয়ে ওঠার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম। আজ যা কিনা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে একটি হাউজহোল্ড নাম। যেখানেই খোকাখুকু— যেখানেই বুড়োবুড়ি — সেখানেই কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি।

নিজের লেখা অবিচুয়ারির ভেতর থেকে এক একটা এমন হৃষিকেশের চোখে উঠে আসছিল। এখনও নিশ্চয় মারা যায়নি নয়নসিন্ধু। খুবই কাঁচা বয়সে সেই প্রায় আশি বছর আগে যুবা এই নয়নসিন্ধুই কৃপাসিন্ধু তালমিছরির ভার নিয়েছিলেন। তার মাত্র তিন বছর আগে কৃপাসিন্ধু এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তখন নয়নসিন্ধুর সম্বল গোটা কয়েক ঢাউস লোহার কড়াই। তারও আবার তাদের জোড় খুলে এসেছে। এখন সেই কড়াইগুলোর ভেতর একটা কড়াই কাচের শোকেসের ভেতর ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা আছে। রোজ সকালে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির একজন কর্মচারী কাচের দরজা খুলে সেই কড়াইয়ে ধুপধুনো দেয়। এটাই তার ডিউটি। সেজন্যে তার প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ইনক্রিমেন্ট — সবই আছে।

হৃষিকেশ ঠিক করল, একবার নার্সিং হোম ঘুরে তবে বাড়ি যাবে।

বেলভিউয়ে গিয়ে লিফটের মুখে দেখা হয়ে গেল রঘুনাথের সঙ্গে। কেমন আছেন ?

এবার ধাক্কা সামলে উঠবেন বড়সাহেব। এখন আর গিয়ে কি করবেন। কাল সকালে আসুন।

সকালে ঠিক পারল না হৃষিকেশ। লিফটে করে ওপর উঠে নয়নসিন্ধুর সুটে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বারোটা হয়ে গেল হৃষিকেশের। মিন্টোপার্কের দিকে বড় একখানা ঘর। তার মাঝখানে দুধশাদা বিছানায় বসে সুপ খাচ্ছেন নয়নসিন্ধু। আরও দুখানা ঘর লাগোয়া। পার্কের দিকে ঝুলবারান্দা। একটা পুরো ফ্ল্যাট নিয়ে নয়নসিন্ধু সাত তলায়। এখন তার

হাতে বিরাট একখানা চামচ। গলায় বিফ। পাছে স্যুপ লেগে যায় বুকে।

কি হয়েছিল ?

মাথাটা ঘুরে গেল। অত আলো। গরম—

এখন কেমন আছেন ?

যেমন দেখছ।

ভালই তো দেখছি। বলে চারদিকে তাকিয়ে দেখল হৃষিকেশ। পাশের ঘরে ছোট টেবিলে বসে নয়নসিন্ধুর সেক্রেটারি খুব মন দিয়ে কিসের হিসেব লিখছে যেন।

সারাটা ঘর ঝকঝক করছে। ফুলদানিতে রজনীগন্ধার তোড়ার গলায় বেলি ফুলের মোটা একটা মালা। দেওয়ালের আয়নায় নয়নসিন্ধুর মাথা, মুখ। কালো চুল, কালো ভ্রূ, কালো গোঁফ।

ফস করে হৃষিকেশের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, আবার রং করেছেন।

পরিহাসরসিক নয়নসিন্ধু বললেন, ডাক্তারের অর্ডার। কি করব বল।

কেন ? অর্ডার কেন ?

রং না দিলে আয়নায় দেখব মাথাটা শাদা। দেখে মন খারাপ হবে। তাই রং করতে হয়।

অ। বলে নয়নসিন্ধুর হাত থেকে স্যুপের খালি প্লেটটা নিতে গেল হৃষিকেশ। পাশের ঘর থেকে রঘুনাথের জলদ গলা ভেসে এল। উঁহু। আপনি রাখতে যাবেন না হৃষিকেশবাবু। বড়সাহেব নিজে রাখবেন। তাহলে ওঁর হাতের ব্যথা সারবে। হাতও খুলবে। নিজের হাত পিছিয়ে নিল হৃষিকেশ। কিন্তু রঘুনাথও তো কৃপাসিন্ধু তালমিছরির একজন কর্মচারী। সে এমন চড়া গলায় অর্ডার করে বড়সাহেবকে ? হোক না হোলটাইম সেক্রেটারি। বড়সাহেবের ভাল চেয়েই না হয় এই চড়া গলা। তবু। তবু একটা তবু থেকে যায় কোথায়। হাজার হোক মাইনে করা কর্মচারী তো বটে।

পারব না রঘু। হাত কাঁপছে। শেষে চাদর নষ্ট হবে।

উঁহু খুব পারবেন। রাখুন বলছি। ডাক্তারের কথা তো শুনবেন।

হৃষিকেশ দেখল রঘুর গলা শুনে পাশের ঘর থেকে নার্স ছুটে এসেও দোরে দাঁড়িয়ে আছে।

নয়নসিন্ধু অনেক কষ্টে হাত কাঁপতে কাঁপতে প্লেটটা ঠং করে রাখলেন টিপয়ে। এবার নার্স এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কর কি ? কর কি ?

বাধা দিচ্ছেন কেন? মুছে দিক। আপনার তো এখন স্পঞ্জ করানোও বারণ।

এই যে চুলে রং দিয়ে দিলে। সব উঠে যাবে যে রঘু।

যাবে না। ওটা পাকা রং।

তাই বল।

আপনি এত কথা বলবেন না আজ। কাল সন্ধেবেলাতেও আপনাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছিল— মনে রাখবেন।

রঘুর গলায় ধমকানি যতই শোনে হৃষিকেশ ততই চমকায়। একি কর্মচারীর গলা? না মালিকের? কিন্তু এখানে মালিক তো বড়সাহেব। তবে সেই নয়নসিন্ধু? হৃষিকেশ অবাক হয়ে দেখল, রঘুর চোখে নিজের ঘোলাটে দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষটা রীতিমত কুঁকড়ে যাচ্ছে।

এ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। এরকম কিছু শোনা ছিল হৃষিকেশের। কিন্তু এতটা যে তা সে ভাবতেও পারেনি। রঘুর শরীর স্বাস্থ্য ঝকঝক করছে। বয়স এই পঁয়তাল্লিশের ভেতর। পায়ে মোকাসিন। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি, গায়ে হাত গোটানো ফুলশার্ট। চোখে ঘষা কাচের চশমা। লম্বা-চওড়া চেহারা। একমাথা কালো চুল। বছর দশেক হল— নয়নসিন্ধু বিপত্নীক হওয়ায় রঘুনাথ তাঁর সর্বক্ষণের সেক্রেটারি। নয়নসিন্ধুর ওপর রঘুর যে এতটা দাপট তা জানা ছিল না হৃষিকেশের। কয়েক হাজার কর্মচারী নিয়ে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির চেয়ারম্যান নয়নসিন্ধু নিতান্ত নিরুপায় হয়ে রঘুর দিকে তাকিয়ে।

রঘু এবার হৃষিকেশের দিকে তাকাল। আপনাকে বড়সাহেব ভালবাসেন। আপনি থাকলেই বকবক করবেন। আপনি উঠুন।

॥ চার ॥

কলকাতার বিখ্যাত মেস বাড়ি। তেতলায় দক্ষিণমুখে ভাল দুখানা ঘর নিয়ে বিখ্যাত গায়ক শচীকান্তর চল্লিশ বছরের ওপর ঘর-সংসার। বিশ-বাইশ বছর বয়সে একটা হারমোনিয়াম হাতে এখানে এসে বোর্ডার হয়েছিলেন তিনি। একটু একটু করে নাম ছড়াতে থাকলে শচীকান্ত লাগোয়া এই দুখানা ঘর নিয়ে একদিন সংসার পাতেন। খাওয়াটা মেস থেকেই আসে। ঘরের সামনে একটু খোলা ছাদই তাঁর সংসারের উঠোন। এখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছে। পর পর দুই ছেলে হয়েছে। তারা পড়াশুনো করে

বড় হয়ে চাকরি পেয়েছে — বিয়ে করেছে — দূরে চলেও গেছে। তাদের নিজের পছন্দমত বউ এক একজনের। বড় ছেলে তার কাজের জায়গা রাঁচিতে মাকে নিয়ে গেছে এই দিন তিনেক হল।

কাল তিন জায়গায় গাইতে হয়েছে শচীকান্তকে। বজবজ, নিশ্চিন্তপুর আর বাগেরহাট। শেষ জায়গায় গান শেষ করতে রাত ফরসা। ভোর ভোর মেসে ফিরে টানা ঘুমিয়ে এই বেলা দুটো নাগাদ সেই ছোট ছাদে বসে থুপ থুপ করে নিজের গেঞ্জি রুমাল কাচছিলেন। শীতের দুপুর। নিচে একতলায় ট্রাম থামার শব্দ। নিচে তাকালে গাদা-গুচ্ছের পুরনো বাড়ির ছাদ — চিলেকোঠা, কার্নিশ। এরই ভেতর — ঠিক কোন জায়গা দিয়ে — বুঝতে পারছিলেন না শচীকান্ত — তাঁর সাত পুরনো এক রেকর্ডের গান ভেসে আসছে। অন্তত তিরিশ বছর আগের গলা। চেহারাটা তখন সুন্দর ছিল শচীকান্তর। গলাও ছিল তরতাজা। সেই সুবাদে সন্ধ্যারানী আর ভারতী দেবীর অপজিটে তিন-চারখানা বাংলা ছবিতে তাঁকে হিরো হতে হয়েছিল। সেই সময়কার গান। কে বাজাচ্ছে রেকর্ড। বিবিধ ভারতীতে নয়তো। ট্রানজিস্টার বাজিয়ে যে শুনবেন তারও উপায় নেই। ব্যাটারি নেই।

গেঞ্জি কাচা থামিয়ে চুপচাপ নিজেরই ভেসে আসা গান মন দিয়ে শুনতে লাগলেন শচীকান্ত।

তুমি চাঁদ হয়ে থেকো আকাশে
আমি রব শিউলি শিশিরে

এরকম আরও কয়েকটা লাইন। নিচে বাসের ইলেকট্রিক হর্ন সব ছিঁড়েখুঁড়ে দিল। নিজের গাওয়া গানের কলি নিজেই মনে করতে পারলেন না শচীকান্ত। পায়ে স্যান্ডেল। সিল্কের লুঙ্গিতে শীত করছে। এই গানটা গাওয়ার সময় ছবিতে যে ড্রেসে ছিলেন তিনি — ধুতি পাঞ্জাবি সেই ড্রেসেই তাঁকে ছবির পোস্টারে আঁকা হয়েছিল। কী পপুলারিটি তখন তাঁর। সন্ধ্যারানী শচীকান্ত, ছবি বিশ্বাস, প্রভা, নীতিশ। এই ভাবেই তখন নাম হত পরপর।

কড়া নাড়ছে কে ? সময়-অসময়ে ফ্যাংশনের জন্যে লোক আসে। দর বাড়ানোর জন্যে শচীকান্ত গোড়ায় জানতে চান, হলঘর ? না, প্যান্ডেল ?

যদি প্যান্ডেল হয় তো বলেন, এই বয়সে তো যেতে পারছি না ভাই। খোলা প্যান্ডেলে গান গেয়ে গলা নষ্ট করতে পারব না।

একথা বলার পর পার্টি রেস্ট বাড়িয়ে দেয়। কেননা, কষ্ট করে শচীকান্ত প্যান্ডেলে গাইতে রাজি হয়েছেন।

আবার যে পার্টি বলে হল ভাড়া করেছি। আপনার কোনও ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই—তাদের শচীকান্ত বলেন, মাপ কর ভাই— হলঘরে ভিড়ের চাপে গাইতে বসে গলায় ঘাম বসাতে পারব না। অন্য কাউকে দ্যাখো। অনেককে পাবে।

তখন পার্টি রেট বাড়িয়ে দেয়। কেননা, শচীকান্ত হলঘরে গাইতে রাজি হয়েছেন।

দরজা খুলে শচীকান্ত অবাক। একজন অত্যন্ত সুন্দর মাঝবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। দামি পারফিউমের গন্ধ। গায়ের রং টুকটুকে ফরসা। দামী শাড়ি। হাত ভর্তি ঝকঝকে করছে চুড়ির গোছা।

কোত্থেকে আসছেন?

মহিলা কোনও জবাব না দিয়ে চোখ তুলে শচীকান্তকে পা থেকে মাথা অব্দি জরিপ করলেন। নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিলেন শচীকান্ত। অন্য সময় খালি গায়েই দরজা খুলে দেন। আজই দরজা খেলার আগে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে নিয়েছেন। নয়তো মহিলার সামনাসামনি আতান্তরে পড়তেন। বিশেষ এক ধরনের গান গাওয়ার জন্যে শচীকান্তকে বাইরের জগতের সামনে সব সময় একটা রোমান্টিক ইমেজ বজায় রাখতে হয়। নয়তো বাজার নষ্ট হয়ে যায়। দরকার কি ষাট বাষট্টি বছরের ভাঙাচোরা শরীরটাকে সবার সামনে তুলে ধরার?

আমি তো চিনতে পারছি না আপনাকে।

মহিলা খুব আস্তে বললেন। আমি মাধবী।

মাধবী?

শেয়ালদা রেল কোয়ার্টারের মাধবী। চিনলে না?

ভেতরে এস।

মহিলা বেশ কষ্ট করেই ভেতরে এলেন। বোঝাই যায় — সিঁড়ি ভেঙে এমন ঘরে ঢোকার অভ্যেস নেই মহিলার। নিজেই চৌকিতে বসে বললেন, তোমার স্ত্রী?

কলকাতায় নেই। বড়ছেলের ওখানে গেছে। — বলতে বলতে শচীকান্ত জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন, ফুটপাত ঘেঁষে বিরাট একটা বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

তোমার ছেলেদের বিয়ের কথা আমি 'প্রসাদ' পড়ে জেনেছি। তোমার

একটা ইন্টারভিউ থেকে।

ওসব এখনও পড় নাকি!

তোমার কথা যেখানে যা বেরোয় তা আমি খুঁজে খুঁজে এই চল্লিশ বছর ধরে পড়ে আসছি।

তোমার বিয়ের তো এই চল্লিশ বছর হল। তাই না?

হ্যাঁ। শচী। আমার বিয়ের পরের বছর তুমি বিয়ে করলে।

দেখতে দেখতে অনেক বছর হল মীরা। এখন তো গায়ক হিসেবে আমি মুছেই গেছি।

কে বলল? আমাদের বয়সীরা তোমার কত ফ্যান।

ফ্যান! সে তো তুমি আমার এক নম্বর ফ্যান ছিলে রেল কোয়ার্টারে। সবে একটা দুটো ফাংসনে গাইছি তখন। রেকর্ড হয়নি একখানাও। তখন থেকেই—

হ্যাঁ। তখন থেকেই। আজও। আমার স্বামীও তোমার গান ভালবাসেন।

গান শোনার সময় পান তিনি? কৃপাসিন্ধু তালমিছরির মত এতবড় এমপায়ার তাঁকে দেখতে হয়।

ও একা দেখে নাকি। আমার শ্বশুর রয়েছেন। আমার ছেলে বসছে কারখানায়।

তোমার ছেলের বিয়ের খবর কাগজে দেখেছিলাম। গভর্নর এসেছিলেন।

অনেকেই আসেন আমাদের বাড়ি। শ্বশুরমশাই তো লোকজন খুব ভালবাসেন। বল তো আমাদের সিন্ধু গার্ডেনে তোমার গানের জলসা করি একদিন। আমি, আমার স্বামী, শ্বশুর, ছেলে, নাতি--সবাই সামনে বসে তেমার গান শুনব।

না মীরা।

কেন?

তোমাদের বাড়ি আমি গাইব না।

তোমার যা রেট তাই আমরা দেব।

টাকা নিয়ে তো আরও গাইব না।

এটা তোমার প্রফেশন শচী।

ওসব থাক। এস আমরা অন্য কথা বলি। কিছু খাবে?

না। বরং তোমার একটা গান শুনি তোমার সামনে বসে।

সারা রাত গেয়ে গলার ঠিক নেই।

তাহলে তোমার একটা রেকর্ড বাজাও।

আমার রেকর্ড আমি বাড়িতে রাখি না।

একখানাও না।

না মীরা।

কাছের কোন বাড়ি থেকে সেই রেকর্ডখানা কে আবার বাজাচ্ছে। মীরার চোখে কেঁপে উঠল। সে কান পেতে গানটা ধরতে চেষ্টা করতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

কৃপাসিন্ধু তালমিছরির নতুন বাড়ি বলে যে জায়গায় প্ল্যান্ট, অফিস, ডেসপ্যাচ, ডাকঘর—সে বাড়িরও বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তার ঠিক উল্টোদিকেই আগেকার পুরনো বাড়ি। সেখানে এখন বেশিটাই গোডাউন, গ্যারেজ, জানলা দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। যেখানটায় ডিস্টিলারের একটা বড় খোল পড়ে রয়েছে—এখানটার আজ থেকে নব্বই বছর আগে তাঁকে আর দাদাদের দিয়ে মাস্টারমশাই পড়াতে বসতেন। তখন সকালে জলখাবার ছিল মুড়ি আর গুড়। খাবার সময় চিবুকে সাদা মুড়ি আটকে থাকত। আর সেই বয়সে মাস্টারমশাইয়ের হাতে মার খেতে খেতে তাকে শুনতে হয়েছিল—ছেলের আর কি হবে! বিদ্যাসাগরমশাই-ই চলে গেলেন। সেই সময় ওই পুরনো বাড়িতেই বাবা কাকাদের এজমালি সংসার। তালগুড় জ্বাল দিয়ে কষাবার উনুন কড়াই—সবই তখন ও- বাড়িতে। বেলা দেড়টায় সারা অফিস গমগম করছে। এরপর বড় হয়ে নয়নসিন্ধু হিসেব কষে দেখেছেন—তাঁর জন্মের পরের বছরই বিদ্যাসাগর গত হন। বাবা কৃপাসিন্ধু নাকি বিদ্যাসাগরের কড়া ক্রিটিক ছিলেন। তাঁর শীতের বনবাসকে বাবা বলতেন— কান্নার জোলাপ। আর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে গর্বিত বঙ্কিমের অনুরাগী। ফি বছর একখানা করে নতুন 'বিষবৃক্ষ' কিনতেন। বাবার আলমারিতে নয়নসিন্ধু এরকম সতরোখানা বিষবৃক্ষ পান। তিনি নাকি বিষবৃক্ষ রিডিং পড়ে শোনাতেন সবাইকে। বঙ্কিমচন্দ্র যতদিন বেঁচে ছিলেন—কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি খেয়ে গেছেন। ক্লাসফ্রেন্ডকে কয়েক শিশি করে পাঠাতেন কৃপাসিন্ধু। সেই শতাব্দীও নেই— নেই মানুষজনও নেই। তখনকার গাড়িঘোড়া, লোকলশকর, রাস্তা ঘাট নয়নসিন্ধুও বালক বসে দেখেছেন। তার কিছুই আর নেই। সব মুছে গেছে। নতুন শতাব্দীও ফুরিয়ে এল।

অথচ নতুন যুবক হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সময়—পরিষ্কার মনে পড়ে— নিজেদের মনে হত টাটকা বিংশ শতাব্দীর টাটকা মানুষ।

শেষে স্যার গুরুদাস গেলেন। গেলেন দেশবন্ধু, স্যার আশুতোষ, সুরেন বাঁড়ুজ্যে— রবীন্দ্রনাথও চলে গেলেন। তাও তো পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

নিখিলের অগোচরে
যে গান অবিরত ঝরে

কার গান মনে করতে পারলেন না নয়নসিন্ধু। গানখানি তাঁর মনের ভেতর মাথার ভেতর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। শেষে এই বসার ঘর ছাড়িয়ে এই নতুন বাড়ির করিডরে ছড়িয়ে পড়ল। যেন কেউ জোয়ারী দিয়ে গাইছে গানখানা। এ বাড়িও পুরনো হয়ে যাবে—এ দেহও জীর্ণ হয়ে যাবে—তাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গান—মৃত্যু অবিরাম বয়ে চলেছে। সেই কথাই সুর হয়ে কিংবা মৃত্যু সুরে সুরে বেজে চলেছে।

নিজের অজান্তে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে সেই সুরে তাল দিয়ে বাজিয়ে উঠলেন নয়নসিন্ধু। পাখোয়াজ বাজানো পাকা আঙুল। তিন তালে কাঠি পড়ার মত নয়নসিন্ধুর আঙুলগুলো বেজে উঠল।

অ্যান্টিরুম থেকে রঘুনাথ ছুটে এল। করছেন কি?

কি হল?

আবার মনে মনে সুর ভাঁজছেন। মনে মনেও কোনও রকম পরিশ্রম করা আপনার বারণ।

অ। আচ্ছা। সুধাংশুকে ডাকাও, কালেকশনের কি হল?

সুধাংশু এসে দাঁড়াতেই খুব গোপনে মনে মনে একটা দশকোশী তাল ঠুকে নয়নসিন্ধু বললেন, ইউ পি, রাজস্থান টেরিটোরিতে এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ডিস্ট্রিবিউটরদের ঘরে পড়ে আছে বাবা।

আপনি ভাববেন না। আমি ব্রাঞ্চ অফিসগুলোয় মেমো ধরিয়ে দিয়েছি।—

নিখিলের অগোচরে
যে গান অবিরত ঝরে-এ-এ-

গানটা এক চক্কর খোলাখুলি গেয়ে উঠে তেহাই দিয়ে আচমকা থামলেন নয়নসিন্ধু। থেকেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন, সাউদার্ন টেরিটোরিতে সাতাত্তর লক্ষ টাকার কালেকশন পড়ে আছে। তার কি হবে?

হকচকিয়ে গেল সুধাংশু। একি মালিক রে বাবা। তালে নির্ভুল গাইতে গাইতে টাকার কথা পাড়ে।

আমি নিজে যাব শনিবার। আপনি রাতের ভেতর টেলেক্স পাবেন।

তাই যাও। তাই যাও। কালেকশনের টাকা জমতে দিতে নেই কখনও।

সুধাংশু যেমন এসেছিল—তেমনি চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ বের করে বলল, সই করে দিন।

কিসের কাগজ ? বলে পাশে দাঁড়ানো রঘুর দিকে তাকালেন। আতশ কাচখানা নিয়ে কাগজের লেখাগুলো বড় করে দেখতে দেখতে বললেন, ওরে বাবা, এ যে দেখছি অনেক কথা লেখা ! রেখে যাও। পড়ে দেখবখন। কাল নিয়ে যেও—

সুধাংশু একটু অনিচ্ছুক ভঙ্গিতেই কাগজখানা তুলে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধু হো হো করে হেসে রঘুর দিকে তাকালেন রঘুনাথও সেই হাসিতে যোগ দিল। তারপর থেমে তারিফ দিয়ে বলল, শাবাশ ! যা বলেছি তাই করেছেন—

একদম পারফেক্ট। তাই না ?

একদম পারফেক্ট। এতবড় কোম্পানির চেয়ারম্যান আপনি। সই করতে বললেই করতেন ? সাপ ব্যাঙ কি আছে দেখবেন না ? যা বলেছি ঠিক সেই করেছেন। কাগজখানা আমি পড়ে দেখব। আমি বললে তবে আপনি সই করবেন। কোনও কাগজে হড়বড় করে সই দেবেন না কক্ষনো।

তাতে যদি কাজ আটকে যায় !

যায় যাবে !

রঘুকে খুশি করতেই যেন নয়নসিন্ধুও দেখাদেখি বলে ওঠেন, যায় যাবে।

বড় জংশনে গাড়ি আটকে যায় না ?

সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধু বললেন। আটকে যায় না !

থামুন। অত হাসবেন না। হাসার কি রয়েছে এত ? বেশি হাসলে নার্ভের পরিশ্রম হয়। কোনওরকম পরিশ্রম বারণ আপনার। দাঁড়ান—মুখটা তুলুন— চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

একেই চোখে কম দেখেন। একটা চোখে প্রায়ই জল কাটে। সেই হিমবাহ দেখতে গিয়ে ঠান্ডা লেগেছিল। এখন দুচোখই জলে ভরে আসায় তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। চোখ বুজে কোনও অদৃশ্য আয়নায়

সব দেখতে পাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। বিলিতি তুলো রঘু তার গালের ওপর চেপে সাবধানে চোখের জল শুষে নিচ্ছে। ঘষলে পাছে মুখের কোঁকড়ানো কাগজ পারা চামড়া উঠে আসে হাতে! আজ তিনি রঘুর মনোযোগ পাবার জন্যে রঘুকেও সায় দিয়ে চলেন। তাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করেন। অথচ এই বিশাল কৃপাসিন্ধু তালমিছরি তার নিজের হাতে গড়ে তোলা। এর এক এক খোপে বসে আছে তাঁরই সব ময়না। ছেলে-ছেলের বউ— নাতি নাত-বউ—ওদের ছেলে। বেলভিউ থেকে ফেরার পর কেউ একবার তাঁর কাছে আসেনি। ঠাণ্ডা লাগলে কোন ডাক্তার— গরম লাগলে কোন ডাক্তার— অজ্ঞান হলে কোন নার্সিংহোম— সব আগাম ঠিক করা আছে। কিন্তু কাছে কেউ আসে না। লোক ঠিক করা আছে। এটা একটা প্রতিষ্ঠান। এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানকে দেখে। নজর রাখে। হেসে বা ভেবেও যাতে কোনও পরিশ্রম না হয় তাও এখানে লক্ষ্য রাখা হয়। লোক দিয়ে। কিন্তু তাঁর নিজের আমদানি পাখিগুলোর কেউ কাছে আসে না নয়নসিন্ধু।

চোখ খুলল। অক্ষয়বাবু বই নিয়ে এসেছেন আপনার জন্য।

বই ? অক্ষয়! কোথায় ?

আপনার সামনে বসে।

রঘুর এ কথায় অক্ষয়ের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল নয়নসিন্ধুর চোখে। ফিকে গোলাপি আভার ছোপানো ধুতি পাঞ্জাবি। সেই রংয়ের উড়ুনি গলায়। উড়ুনির নিচে কণ্ঠি বেরিয়ে। অক্ষয়ের গায়ের রংটি বরফ। ঠোঁট শুকনো পানের রসে ছোপানো সব সময়। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে তাঁর জন্যে পুরনো হারানো সব বই জোগাড় করে আনে। বিয়ে থা করেনি। ভাইপো ভাইঝির সংসার। বই দিয়ে ক্যাশ থেকে যা বিল পায় তাতেই অক্ষয়ের চলে যায়। ওই বিলের টাকাতেই গত তিরিশ বছরে একখানা বাড়িও করেছে অক্ষয়।

কি বই অক্ষয় ?

অজ্ঞে বিপিন গুপ্তর পুরাতন প্রসঙ্গ—

পেয়েছ ?—নয়নসিন্ধু ভাবলেশহীন চোখ বলে উঠতে চাইল। ও বইতে অক্ষয় বাবার কথাও আছে।

সে জায়গাগুলো দাগিয়ে এনেছি।

আঃ। দাগাতে গেলে কেন ?

আপনি পাতা ওল্টাতেই পেয়ে যাবেন।

তার চেয়ে আমি পড়তে পড়তে পেয়ে গেলে কত আনন্দের হত ভেবেছ ?

আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।

এ বই আমার ছিল অক্ষয়। কে যে নিয়ে গেল।

পাঁচ কপি এনেছি।

বাঃ! বাঃ! এই তো চাই। আর কি পেলে ?

রোনালড্‌সের—

কথা শেষ হল না অক্ষয়ের। চেয়ারে প্রায় উঠে বসেন নয়নসিন্ধু।

রঘু প্রায় দাবড়ে ওঠে। ও কি হল ? আপনার উত্তেজনা বাড়ছে।

একটু তো উত্তেজিতই হব রঘু। এমন দিনে পুরাতন প্রসঙ্গ আর রোনালড্‌সের ভল্যুমগুলো পেয়ে কার না উত্তেজনা হয়! বিলিতি কেচ্ছার গোডাউন হল গিয়ে রোনালড্‌সে।

ওটাও পাঁচ কপি পেয়ে গেলাম। দাম একটু বেশিই পড়ল।

তা তো পড়বেই।

এমন সময় হৃষিকেশ এসে ঘরে ঢুকল। একই বই পাঁচ কপি করে টেবিলে দেখে জানতে চাইল, পাঁচখানা করে ? কি ব্যাপার ?

হৃষিকেশকে ভাল লাগে নয়নসিন্ধুর। হেসে বললেন, আমার বিষয়সম্পত্তি বলতে বই হৃষিকেশ। সারা জীবন কিনে আসছি।

তা বলে একই বই পাঁচখানা ?

আনন্দের হাসি হাসলেন নয়নসিন্ধু। কারণ আছে।

বুঝলে—এক কপি সিন্ধু গার্ডেনে থাকে। লখনউ, এলাহাবাদ, জামশেদপুরের বাড়িতে এক কপি করে রাখি।

মোট চার কপি হল। আর এক কপি ?

চোরের জন্য! চোরের জন্যে এক কপি রাখি।

এটা আপনার বাজে খরচ বলব।

তা বলতে পার হৃষিকেশ। এটা আমার বাবুয়ানি বলতে পার। একটা বয়স ছিল—যখন অঢেল স্বাস্থ্য ছিল। বয়স কম ছিল। কাজের আনন্দ ছিল। রোজই নতুন কিছু আয় করছি—অভিজ্ঞতা, টাকা, সম্মান, ভালবাসা। তারপর একদিন বুড়ো হয়ে গেলাম। আর আনন্দ হয় না হৃষিকেশ। ক্ষয় দেখতে পাই সর্বত্র। কিছুই বাঁচানো যাবে না মৃত্যুর হাত থেকে। আগে রোজ সকালে আনন্দ হত। এখন এক এক সময় চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

আপনি আর কথা বলবেন না তো।—রঘু এগিয়ে এসে নয়নসিন্ধুর হাত থেকে বইগুলো নিয়ে তাকে তুলে রাখল। আপনার নিশ্চয় প্রেসার বাড়ছে।

হৃষিকেশ জানতে চাইল, আপনার প্রেসার কত?

আজকাল আর মাপি না। ডাক্তার মাপে। ডাক্তার জানে।

আপনি জানেন না?

আগে জানতাম। ছেচল্লিশ বছর আগে শেষ মেপে ছিলাম। তার আগে তিনবার মাপাই। নাইনটিন থার্টি সভেনে টোয়েন্টি সিক্স আর নাইনটিনে। সব কবারই নরমাল ছিল। নিচে আশি, ওপরে তিরিশ থেকে একশো চল্লিশের ভেতর। খুব অপমান লাগল।

কেন?

এত লোকের কৃপাসিন্ধু তালমিছরি আমি চালাই আর আমার বলবার মত কোনও প্রেসার নেই— টেনশন নেই— বড় লজ্জার কথা! প্রেসার তো হৃষিকেশ একটা স্ট্যাটাস। প্রেসার মনে পড়লেই মরমে মরে যেতাম।

আপনার এবারের জন্মদিনে সব কটা ডেইলি কাগজে ফুল পেজ সাপলিমেন্ট বেরবে। আপনার সম্বন্ধে লেখা বেরবে। কাদের দিয়ে লেখাব বলুন তো?

এই তো মুশকিলে ফেললে। কে লিখবে। যারা জানত সবাই তো মরে গেছে।

গড়িয়ার নুটু দত্ত? উনি তো আপনাকে জানতেন—

উঁহু। নুটুকে দিয়ে হবে না। ও জল বানান ছয় রকম লেখে। তার চেয়ে তুমিই লেখ। আর দ্যাখো বাপু—আমার অল্প বয়সের ছবি ছাপতে দিও। অল্প বয়সের কত মজা জানো?

কি রকম?

একবার ট্যান্টামাউন্ট কথাটা শুনলাম। শুনে তো খুব ভাল লাগল। তখনও আমার বিয়ে হয়নি। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগের কথা। ট্যান্টামাউন্ট কথাটা নিয়ে মনে মনে লোফালুফি করি আর খুব আনন্দ হয়। কেন? না আমার মনে ট্যাটামাউন্ট কথাটা আছে।

একদিন এক সাহেবকে লেখা চিঠি টাইপ করছি। দিলাম তার ভেতর ট্যান্টমাউন্ট কথাটা বসিয়ে। সাহেব তো চিঠি পেয়ে ছুটে এল। এ টুমি কি লিখিয়াছ বাবু? প্লিজ এক্সপ্লেইন। আমার তো গলদঘর্ম দশা। সাহেব নাছোড়।

আর একটি কথাও নয়। আপনি খুব বেশি হাসছেন। এবার আপনার রেস্ট দরকার। আপনি উঠুন হৃষিবাবু। নইলে বড়সাহেব কথা বলেই যাবেন—

হৃষিকেশ উঠল। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল— এই তালমিছরি সাম্রাজ্যের সম্রাট যেমন কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করেও নিজেকে কখনও সাধারণের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না— তেমনি আবার ট্যান্টামাউন্টের মত একটা শব্দ স্টকে থাকলে নিজেকে ধনী জ্ঞান করেন। আলাদা আনন্দ হয় তাঁর।

॥ ছয় ॥

ফাল্গুন পড়তে না পড়তেই শীত একদম নেই। সারাদিন পাগলা বাতাসে সিন্ধু গার্ডেনের গাছপালা এলোপাথাড়ি দুলছে। বেনারসী ল্যাংড়ার কলমের গাছটার গা ভরে বউল। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে খুঁত খুঁত করে উঠলো নয়নসিন্ধু। সব যে ঝরে যাবে রঘু—

পাশেই দাঁড়ানো রঘু। পাম্পসু উথলে পায়ের পাতায় মাংস। চোখে ভারি কাচের চশমা। সেই অনুপাতে লম্বা চওড়াই চেহারায় কুর্তা পাজামা। গম্ভীর চালে বলল, যত দোলে তত ঝরে না।

আপনি চুপটি করে বসুন তো। এখুনি আপনার ছেলে আসবেন।

আমার ছেলে আমার কাছে আসবে— তাতে কি হয়েছে? যা বললাম— তার জবাব এই হল?

আঃ! বুঝছেন না কেন? আপনি বাগান করেছেন কিন্তু আমি তো মাঠের ছেলে। বোঝেন কিনা?

হ্যাঁ। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে— আমি ধরে এনে তোমায় সেক্রেটারি করেছি আমার।

আমি এই সিন্ধু গার্ডেনের গায়ে মাঠে মাঠে বাপ খুড়োদের গরু চরাতাম। আমি মাঠের ধর্ম জানি। এ বাতাসে সব বউল ঝরে গেলে সারা দেশে একটা আমও হত না। বুঝলেন—

তুমি এত বোঝাও কেন আমায় বলতো রঘু?

চটছেন কেন? আপনার জন্যে আজ আমার সব আপনাকে ভুল করতে দিতে পারি আমি? বলুন?

বুঝলাম।

আপনার জন্যে আজ আমার দুখানা মিনিবাস, আন্দুল-মৌরী লাইনে একখানা প্যাসেঞ্জার বাস। কলকাতা শহরে একখানা বাড়ি।

ওসব কথা তুলব কেন রঘু?

আমি গ্রেটফুল বড়সাহেব। আপনার কাছে আমার টিকিটি বাঁধা বড়সাহেব। দশ বছরে আমার জীবনটা আপনি পাল্টে দিয়েছেন।

তা তো বুঝলুম। এত কথা আসছে কোত্থেকে? এখন তো তুমি বিষয়সম্পত্তিওয়ালা মানুষ। বিয়ে করেছ। দেশে মেয়ে হয়েছে। বাপভাইয়ের কুঁড়েঘর থেকে পাকা বাড়িতে এনে তুলেছ।

তা এনেছি। রাতে বাড়ি ফিরে মিনিবাস— বাসের টিকিট বিক্রির হিসেব দেখতে হয়। অথচ দশ বছর আগে লাঠি হাতে গরু চরাতাম।

এখন কেমন লাগে রঘু?

ঘুম হয় না বড়সাহেব। বিছানায় উঠে বসে থাকি। মিনিবাসে চুরি হচ্ছে জানি। কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছি না। করতে হলে মিনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়।

তোমার তো চলে যাচ্ছে?

তা যাচ্ছে বড়সাহেব।

তাহলেই হল। বাকিটা চোখ বুজে থাক। আমাকে দ্যাখো না। আমি তো কিছুই দেখি না।

আপনার সঙ্গে আমার কথা পাশাপাশি বলবেন না।

ওই একই তো। সেই প্রপার্টি। অথচ আমি তো সারাদিন ঘুমের ভেতর ডুবে থাকি।

আমাদের ব্যাঙের আধুলি সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়।

ভুল করছ রঘু। সবার সম্পত্তিই ব্যাঙের আধুলি।

ওই আপনার ছেলে আসছেন। কুসুমবাবুকে ঘরের কথাটা একবার বলবেন কিন্তু।

বলার ফাঁক পেলে তো। এত তড়বড় করে ছেলেটা

তবু বলবেন। নতুন বাড়িতে সবার নামে নামে ঘর উঠছে। আপনি বললে কুসুমবাবু কি সেকথা ফেলবেন—

কুসুমসিন্ধু এদিকেই আসছিলেন। এ কি বাবা এখনও রেডি হওনি? ও রঘু, তোরা করিস কি সারাদিন। সিংহাসনটা নামাতে বলিসনি? মাসের একটা দিন বাবার অভিষেক তা নাকি কারও মনে থাকে। দুধ কোথায়?

ওই তো—বলে বড় হাঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে নিজেই আবার বলে উঠল,

বিশ কেজি আনালাম—

বেশ করেছ। চন্দন? চন্দন কোথায়?

বাটিতে রাখা আছে।

গামলা? বড় গামলাটা? ওই তো। এসে গেছে। জানিস রঘু— মা আমাকে ওই গামলায় চান করাতেন—এই আট দশ মাস বয়সে

অত বড় গামলায়?

বাঃ! আমিও যে তখনই রীতিমত লম্বা নয়তো এই ছ ফুট চার ইঞ্চির খাঁচা হয়।

তারিফের ভঙ্গিতে নয়নসিন্ধুর একমাত্র ওয়ারিসানকে দেখছিল রঘু পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও রীতিমত পাঠান জোয়ান যেন কুসুমসিন্ধু। টকটব করছে গায়ের রং, রোজ সকালে নাকি টক দইয়ের সঙ্গে খানিকটা মুক্তাভস্ম খান কুসুমসিন্ধু। চওড়া কাঁধ। সিংহ কটি। মাথার চুল পর্বতশৃঙ্গ। গলার রুদ্রাক্ষ বুক অব্দি। হাত দুখানা তালমিছরি জ্বাল দেবার বেলচা হাতা সবুজ ঘাসের ওপর পা দুখানা ডেবে বসে গেছে। রঘুর মনে হল এ মানুষটা অমর। কোনওদিন নয়নসিন্ধু হবে না। এর কাছ থেকে নতুন বাড়িতে নিজের বসার জন্যে একখানা ঘর আদায় করা কঠিন। খুব কঠিন।

বাবা যেমন বসে আছ থাক। পা দুখানা শুধু গামলার ভেতর এগিয়ে দাও। এবার দুধ ঢালব।

আমার ঠাণ্ডা লাগবে যে।

চোপ। দুধ দিয়ে পুজো করছি, তাতে খুশি নয়!

নয়নসিন্ধুর কোমরে ধুতি। খালি গা ফ্যাকাশে ধরনের হাড়ে মাসে শরীর। গলা থেকে হাঁটু অব্দি সেলোফেন পেপার দিয়ে মোড়া। মাথাতেও সেলোফেনের টুপি। এটা আগাগোড়া রঘুর ব্যবস্থা। কুসুমসিন্ধুর পক্ষে দুগ্ধস্নানে অভিষেকও হল—আবার নয়নসিন্ধুর গায়ে ঠাণ্ডাও লাগল না।

একটা সোনা বাঁধানো ঘটিতে দুধ তুলে কুসুমসিন্ধু নয়নসিন্ধুর মাথায় ঢালল।

আঃ! ঠাণ্ডা লাগবে যে—

কথা বল না বাবা। এখন তোমায় পুজো করছি।

পুজোই করিস—আ যা—ই করিস—এ বয়সে ঠাণ্ডা লাগলে নিউমোনিয়া হবেই।

চোপ। পুজোর সময় ভগবানও কথা বলে না বাবা। একটু চুপ

করে থাকতে পার না! তোমাদের মোটে ধৈর্য নেই। দেখছ পুজো করছি।

ধৈর্যের কথায় হেসে ফেললেন নয়নসিন্ধু। মনে মনে বললেন, ধৈর্য না থাকলে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির মত শেয়ার হোল্ডার কোম্পানিকে এই অবস্থায় ঠেলে তুলতে পারি? বাবা কি রেখে গিয়েছিলেন? এক গাদা দেনা আর গণ্ডায় গণ্ডায় পোষ্য। বাড়ির খুকিটিরও শেয়ার ছিল। কোম্পনিকে বড় করেছি। আর পাশাপাশি এক একজনের শেয়ার কিনেছি জলের দরে। সব শেয়ার তোর জন্যে এক জায়গায় করেছি। ধৈর্য নেই আমার! তুই আমার চোখের মণি। তুই যখন এতটুকু তখন থেকে তোর নামে শেয়ার ট্রান্সফার করে চলেছি। তবে না কৃপাসিন্ধু তালমিছরি এখানে। তবে না আজ বাজারে এতবড় গুডউইল। নইলে সবই তো বারোভূতে লুটে খেয়ে কোম্পানি ফোঁপরা করে ফেলত।

এবার পা এগিয়ে দাও। দিয়েছ? বলে খুব সাবধানে আরেক ঘটি দুধ ঢালতে লাগলেন কুসুমসিন্ধু। মাথার সেলোফেনের টোপর টপকে দুধ নয়নসিন্ধুর সেলোফেন ঢাকা বুক বেয়ে হাঁটু ছাড়াল। সেখানেও সেলোফেন। তারপরই খালি পা। পা ধোয়ানো দুধ গিয়ে পড়ল গামলায়। সেখানে গামলার ওপর একট রুপোর কাপ বসানো।

এইভাবে দুধ ঢালতে ঢালতে কাপ দুধে ভরে যেতে কুসুমসিন্ধু থামলেন। থেকে বললেন, নে রঘু এবার বাবার গা মুছিয়ে জামা পরিয়ে—

রঘু গা মোছাচ্ছিল। কুসুমসিন্ধু রুপোর কাপ ভর্তি দুধটা এক ঢোকে খেয়ে নিয়ে নয়নসিন্ধুর এগিয়ে দেওয়া পায়ে তিনবার মাথা ঠেকালো। তারপর বুক পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও।

ওটা কি?

পুজো করে প্রণামী দিতে হয়। জানো না?

নয়নসিন্ধু বললেন, ভগবান কি হাত পেতে নেয় কখনও? ওখানে রেখে দে—

কুসুমসিন্ধু একশো টাকার প্রণামীর নোটখানা রুপোর কাপ দিয়ে চাপা দিলেন।

তখনই শার্টে মাথা গলাতে গলাতে নয়নসিন্ধু বললেন, নতুন বাড়িতে আমার ঘরের লাগোয়া একখানা ছোট ঘর রাখবি।

সে দেখা 'যাবে—

না। দেখা যাবে নয়। রাখতে হবে। আমার লোকজন বসবে

কোথায় ?

তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। বলেই মশ মশ করে ঘাসের ওপর দামি পাম্পসুর মশ মশ শব্দ তুলে কুসুমসিন্ধু বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

নয়নসিন্ধু খুব অস্ফুটে বললেন, দেখলি তো।

দেখব কি ? আপনার গড়ে তোলা কোম্পানি— আপনি যদি জোর দিয়ে কিছু না বলেন—

এর চেয়ে বেশি কি জোর দেব ! কুসুমও তো কোম্পানির সর্বেসর্বা।

তাই বলে আপনার ওপরে তো নয়।

ওরে শোন। কেউ ওপরে-কেউ নিচে নয়। ও না থাকলে তো আমার এসব গড়ে তোলাই মিথ্যে হয়ে যায়।

বালাই। তা বলিনি বড়সাহেব। কিন্তু আপনার ইচ্ছেটাও তো ফেলে দেবার নয়।

তা তো বটেই।

নয়নসিন্ধুর সেক্রেটারি ঠিক বুঝতে পারল না, বড় সাহেব কোন কথাটা সিরিয়াসলি ধরেছেন।

॥ সাত ॥

ডাক্তার ব্লাড রিপোর্ট দেখে বলল, আপনার ব্লাড সুগার তো বেশ ভাল রকম রয়েছে। এত কম বয়সে—

আমার এই চল্লিশ-একচল্লিশ।

খুব চিন্তা করেন বুঝি ?

খুব একটা নয়। তবে বোঝেন তো মিনিবাস দুটো, বাসটা গ্যারেজে না ফিরলে রাতে শুতে পারি না। ভয় হয়— কোথাও আবার অ্যাকসিডেন্ট করল না তো।

রঘুর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, চিন্তার দিকটা কমাতেই হবে। আপনি তো ভাল চাকরিও করেন।

কৃপাসিন্ধু তালমিছরির চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমি।

এছাড়া এত কম বয়সে কলকাতায় বাড়ি করেছেন।

তা করেছি।

তাহলে তো স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেইন থাকবেই। প্রপার্টির একটা চাপ সব

সময়ই থাকে। আর আপনি তো সব এই সামান্য বয়সের ভেতরে করেছেন।

এর চাপ তত নয়— তার চেয়ে মনের ওপর চাপ পড়ে বেশি— নিচ অপমান সহ্য করতে হলে।

যেমন ?

একটা এগজামপেল দিচ্ছি ডাক্তারবাবু। আমাদের নতুন অফিস তৈরি হচ্ছে বিরাট বাড়ি। হেঁজিপেঁজির জন্য সেখানে চেম্বার হচ্ছে। কিন্তু আমি বাদ।

কেন ?

আমি যে বড়সাহেবের পেয়ারের লোক। বড়সাহেবের অনুগ্রহে আমার বাড়ি, মিনিবাস, বাস হয়েছে, মাইনে পাচ্ছি কোম্পানির সিনিয়র স্কেলে। এতে সবার চোখ টাটায়। বড়সাহেবের ছেলের কাছে আমার নামে লাগানি ভাঙানি করেছে নিশ্চয়। ওসব ভাবলে খুব যন্ত্রণা হয় মনে।

উঁহু এসব ভুলতে হবে রঘুবাবু। কার্বোহাইড্রেট আর খাবেন না।

সেটা কি ?

এই ভাত, রুটি — এইসব আর কি।

গরিবের ছেলে। ভাত খেয়ে বেড়ে উঠিছি। ভাত ছাড়া থাকবো কি করে ডাক্তারবাবু।

থাকতে হবে। এখন তো অবস্থা ফিরেছে। মাংস খাবেন। মাছ খাবেন।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোবার আগে রঘু বলল, জানেন ডাক্তারবাবু যাদের চোখ টাটায়—তারা জানে না—বড়সাহেবের জন্যে আমাকে কতক্ষণ থাকতে হয়। রাতে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি বাড়ি ফিরি।

কত বয়স হল নয়নসিন্ধুবাবুর ?

কুলোকে বলে একশো সাত বছর, কিন্তু আসল বয়স সাতানব্বই। ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন তাও প্রায় বিশ বাইশ বছর হল। দেখার কেউ নেই।

টাকাই দেখে ওঁকে।

একরকম তাই বলতে পারেন। ছেলে খোঁজ নেন ফুল পাঠিয়ে। আর মাসে একবার পাদোদক খেতে আসেন বাবার—

এত ভক্তি।

খাঁটি ভক্তি। তাতে কোনও ভেজাল নেই। পুত্রবধূ, নাতি, নাতবউ, সবাই ব্যস্ত। কেউ আসে না। বড়সাহেবের মন খারাপ হলে আমি। মন ভাল থাকলেও আমি।

মন খারাপ হলে কি করেন?

ওঁকে এদিক সেদিক— ওঁর পছন্দের জায়গা ঘুরিয়ে আনি।

আনন্দ হলে?

ওঁর যাদের কে পছন্দ তাদের এক একজনকে ধরে আনি।

তা নয়নসিন্ধুবাবুর বয়সের বন্ধুরা কেউ কি এখনও আছেন? একজনও নেই। কিন্তু তাদের বংশধররা আছে। তাদের কাছে গিয়ে বড়সাহেব বন্ধুর কথা বলেন — বন্ধুর কথা শোনেন। গঙ্গার ফেবারিট ঘাটে গিয়ে বসেন। নয়তো প্রিয় বই পড়েন।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসেই রঘু ড্রাইভারকে বলল, দক্ষিণেশ্বর চল। বলেই খেয়াল হল, কতকাল পায়ে হাঁটা হয় না তার।

সেখানে গিয়ে মন্দির চাতাল পেরিয়ে রঘু গিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসল। জল এসে সিঁড়িতে আছাড় খাচ্ছে। সে বেশ অল্প বয়সেই একজন সফল বিষয়ী মানুষ। ইদানীং তার এক চিন্তা হয়েছে। বড়সাহেব যতদিন ততদিন এই চাকরি। বড়সাহেব আর কতদিন! হাত থেকে ছড়ি খসে পড়ে ঘন ঘন। এক চোখে অনবরত জল কাটে। কিছু শুনতে পান না। দেখতে পান আরও কম। প্রায়ই অজ্ঞান হচ্ছেন। বড়সাহেব চলে গেলে তার কি হবে? তখন তো কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না। এখন যে করেই হোক বড়সাহেবকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

কোনও কথা ছিল না — কোনও চিন্তা ছিল ছিল না — যদি বড়সাহেব যেতে যেতেই সে তাঁর জায়গায় কুসুমসিন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে পারত। কিন্তু কুসুমসিন্ধুর ভেতর জবুথবু হয়ে পড়ার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং বয়স আন্দাজে কুসুমসিন্ধু বেশি বেশি করে তাজা টাটকা। বুড়ো হয়ে পড়ার কোনও চিহ্নই নেই। অথচ বড়সাহেবের সঙ্গে থেকে তার যা কিছু ট্রেনিং বুড়োমানুষকে নিয়ে। বুড়োমানুষের শখ। বুড়োমানুষের প্রাণের কথাটি জানা। বুড়োমানুষের মন খারাপ এইসব সে জানে। নতুন কোনও বুড়ো না পেলে তার এই শিক্ষাই মিথ্যে। তখন কী করবে এই জ্ঞান নিয়ে? সিন্ধু গার্ডেনের লাগোয়া ধানক্ষেতে সে হোল ফ্যামিলির গাইগরু চরাতো বেশি বয়স অব্দি। বিদ্যে কোনওরকমে ক্লাস এইট। এখন তার বাচ্চারা পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে। অভিভাবকদের বার্ষিক সভায় সে রীতিমত বক্তৃতা দেয় সেখানে। তাকে ইংরাজিতে বলা হয় — গার্ডিয়ান।

তাই এই সম্মান — প্রতিমত্তি সব ধুলোয় মিশে যাবে — নতুন

বাড়িতে অফিস উঠে যাবার পর তার কপালে যদি আলাদা একখানা চেম্বার না জোটে।

গঙ্গার ওপারেই বেলুড়। সেদিকে আলোর মালায় তাকিয়ে রঘু হাত জোড় করল। —ঠাকুর। একটু মুখ চেয়ো। আমি রঘুনাথ গুহ। বিবেকানন্দর মত আমরাও কুলীন কায়েত। তুমি তো সবই জানো ঠাকুর।

এদিকে ঠিক এই সময় হৃষিকেশকে নিজের লাইব্রেরি দেখাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। হৃষিকেশ নোট বই নিয়ে সিন্ধু গার্ডেনে এসেছিল। নয়নসিন্ধুর এবারের জন্মদিনে যে সুভেনির বা স্মরণিকা বেরবে তার বিষয়বস্তুই স্বয়ং নয়নসিন্ধু। এমন কি কৃপাসিন্ধু তাল মিছরিতে নতুন ক্যামপেনেও নয়নসিন্ধুর মুখের কথা দিয়েই বিজ্ঞাপন হবে। সে সব টুকে নিতেই হৃষিকেশের এতটা আসা।

কিন্তু কথায় কথায় কথাবার্তা যেই কৃপাসিন্ধুতে গিয়ে ঠেকল— অমনি বিশাল উনিশ শতাব্দীর দরজা জানলা ওদের দুজনের সামনে খুলে গেল।

নয়নসিন্ধু নিজের লাইব্রেরি দেখাতে দেখাতে বলছিলেন, তুমি বোধহয় জানো— বিদ্যাসাগরমশায় বাবাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। বাবাকে মনে করতেন ক্যানটাং ক্যারাম!

কেন?

আসলে বিরোধটা ছিল অন্য জায়গায়, উনিশ শতকের দিকে ভাল করে তাকালে বুঝতে পারবে— সারা শতাব্দীকে উদ্যোগী বাঙালি তিনভাবে নিয়েছিল। একদল বাঙালি গেল ইংরেজের চাকরিতে। যেমন— বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কিশোরী মিত্তির, বঙ্কিমচন্দ্র, আরেক দল বাঙালি চলে গেল বড় ব্যবসায়-দ্বারকানাথ, রামদুলাল, দেবেন্দ্রনাথ— এইসব আর কি। আরও একদল বাঙালি ছিল। তাঁরা না গেলেন বড় ব্যবসায় না গেলেন বড় চাকরিতে। আমার বাবা কৃপাসিন্ধু ছিলেন এই দলে। এরা বড় ব্যবসায় না গিয়ে নিজের বিশ্বাস মত সংস্কার— সমাজ বদলাবার জনমত গড়তে নামলেন। তখন তো তালমিছরি খুব একটা ইন্ডাস্ট্রি নয়। বাবা তো প্রথম পনেরো বছর টাকা লোকসান দিয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথা নিজের মত করে বলার জন্যে ওঁরা যুদ্ধ করেছিলেন।

হৃষিকেশ নয়নসিন্ধুকে এভাবে কোনওদিন কথা বলতে দেখেনি। সে যা দেখেছে— তা হল— নয়নসিন্ধু সবকিছুই হাসিঠাট্টা কৌতুকের চোখে দেখে থাকেন। খুব গুরুতর ব্যাপারও নয়নসিন্ধু হাসির হররা দিয়ে হাল্কা করে নেন। আজকে তার সামনে এ এক অন্য নয়নসিন্ধু।

তুমি বোধহয় জানো না হৃষিকেশ-নাইনটিথ সেঞ্চুরির শেষদিকে কলকাতায় মিউনিসিপাল ভোটে সাধারণ মানুষের হাতে ভোটের অধিকার তুলে দিতে আমার বাবা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন তালমিছরির ব্যবসায়ীর একাজ করার কথা নয়। সেজন্যেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বেধেছিল। বোধহয় তাই বিদ্যাসাগরমশায় বাবাকে ক্যানটাংক্যারাম মনে করতেন।

বিদ্যাসাগরমশায় কি ইংরেজদের জো হুজুর ছিলেন? তা তো নয়।

নয় তো বটেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরমশায় ছিলেন অনেকটা The King Cannot bear a brother near the thronel.

মনে মনে নয়নসিন্ধুকে তারিফ না করে পারল না হৃষিকেশ। এর চেয়ে ভাল করে আর বলা যায় না। মানুষটির মস্তিষ্ক স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। সে আবার সেই পুরানো কথাটাই ফিরে বলল, এবার থেকে কৃপাসিন্ধু গবেষণা বৃত্তি দিতে থাকুন। তাতে দেশের লাভ। লাভ আপনাদের তালমিছরির।

এসব কথায় কান না দিয়েই নয়নসিন্ধু বললেন, এই দ্যাখো— প্রথম দিন থেকে পেপার-স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন-সব এখানে পাবে।

এসব কার কালেকশন?

বাবার। আমিও কিনেছি অনেক। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাঁকিপুর কালেকশন পুরোটাই কিনে এনে এখানে রেখেছি।

বই আর দেখল না হৃষিকেশ। পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের ছড়ানো ঢেউগুলো অজানা মানুষেরা এভাবে কিনে কিনে সংগ্রহ করে রাখে। বেশির ভাগই সেইসব মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পোকার খাবার হয়ে দাঁড়ায়। শেষ অব্দি সবই কালের অতলে।

॥ আট ॥

ডবল বেডের বিছানায় এদিক-ওদিক আধোখোলা বই পড়ে আছে। ফেব্রুয়ারি মাসের বেলা বারোটা। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের রেলশহর- বিলাসপুর। 'মৃগয়া' হোটেলের তেতলায় ডবলঘরের দক্ষিণমুখো বড় ঘরখানা এখন কদিনের জন্যে নয়নসিন্ধুর আস্তানা। তিনি এখানে এসেছেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের নিমন্ত্রণ রাখতে।

এই বিলাসপুরে রেল কোম্পানি যখন জঙ্গল কেটে রেললাইন বসাচ্ছিল

তখন বাঙালি ঠিকাদারদের সঙ্গে সঙ্গে কৃপাসিন্ধুও এসেছিলেন। হয়তো তাঁর তালমিছরির ডিস্ট্রিবিউটর খুঁজতে, কিংবা এমনিতেই ঘুরতে আসা। না হয় কোনও তীর্থধর্মের ব্যাপারে। এখানে এসে কদিন থেকে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে এখানে কৃপাসিন্ধু রায় একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় খোলেন। এসব নয়নসিন্ধুর জন্মের আগের কথা।

সেই চিকিৎসালয় একশো বছরের ওপরে চলছে। কৃপাসিন্ধু চালিয়ে এসেছেন। তারপর চালু রেখেছেন নয়নসিন্ধু। ওখানে একশো বছরের ওপর সাধারণ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে এসেছে। রেসিডেন্সি এলাকা- টাউন কোতোয়ালি এলাকা - সব জায়গার মানুষ জন্ম থেকেই এই মৃত্যুঞ্জয় চিকিৎসালয় দেখে আসছে।

কৃপাসিন্ধুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে রাজ্য সরকারের নেমন্তন্নে কৃপাসিন্ধু মার্গে এক ফলক বসালেন আজ নয়নসিন্ধু। এজন্যে ভোপাল থেকে রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী এসেছিলেন। খুব পরিশ্রম গেছে। এখন খেতে বসবেন নয়নসিন্ধু। খেতে বসার আগে রঘুকে ডাকলেন, হৃষিকেশ কোথায় ? ডাকো। আমি একা খেতে বসতে পারিনে—

হৃষিকেশবাবু এলেন বলে। খবর দেওয়া আছে। এইতো এসে গেছেন।

হৃষিকেশ কখনও কখনও নয়নসিন্ধুর সফরসঙ্গী হতে হয়। গল্পগাছা করবার জন্যেই হৃষিকেশকে নিয়ে থাকেন। ড্রাইভার, রঘু, দুজন খিদমদগার নিয়ে নয়নসিন্ধু লম্বা লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে থাকেন। অর্ডার মত হোটেলের লোকজন খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেছে। সে খাবার দেখে হৃষিকেশের তো চক্ষুস্থির।

ফুলকপি, কড়াইশুঁটির তরকারি, মুড়িঘণ্ট দিয়ে ডাল, ভাত, আলুভাজা, দুখানা রুই মাছের গাদা ভাজা— এছাড়া ছোট একটি মুরগির স্টু, একবাটি ক্ষীর, দুটি কলাকন্দ। প্লেটে আলাদা করে নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো।

করেছেন কি ? এতসব খাবেন নাকি ? এতো একজন জোয়ান লোক খেয়ে হজম করতে পারবে না।

নয়নসিন্ধু মুখটা কাঁচুমাচু করে বললেন, এই খেয়েই তো আছি হৃষিকেশ এতেই খিদে যাবে পেটের। বাঁচবো তো।

বড়সাহেবের পেছন থেকে রঘু বলল, কনস্টিটিউট হৃষিবাবু। বড় সাহেবের কনস্টিটিউশনই আলাদা।

নয়নসিন্ধু ভাত মেখে খেতে খেতে বললেন, ডাক্তার বলেছিল—সকালে দুটো করে ডিম খাবেন। তবে ডিমের সাদাটুকু খাবেন। বোঝো! সাদাটুকু খেয়ে হলদেটুকু কি ডাক্তারের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব?

তা করেছেন কি?

সবটা খেয়ে নিয়েছি। আমার আবার ব্লাডপ্রেসার নিচেরটা গত পঞ্চাশ বছর সেই আশিতে দাঁড়িয়ে আছে। কমেও না বাড়েও না!

সে তো সবচেয়ে ভাল ব্লাডপ্রেসার শুনেছি।

শুনেছ? তবে খেয়ে যাই—কি বল?

হৃষিকেশ বুঝল, নয়নসিন্ধু তাকে নিয়ে রসিকতা করছেন। বিছানার আধখোলা ছড়ানো বইগুলো কি তা জানে সে। নয়নসিন্ধু নিজের দশবারো বছর বয়সে—তার মানে ১৮৯৯/১৯০০ সালে যেসব গল্পের বই পড়েছেন—সেগুলোই বহুকষ্টে অক্ষয়বাবু জোগাড় করে দিয়েছেন। সেই সব বই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়েন নয়নসিন্ধু।—আর পড়তে পড়তে চলে যান সেই সময়ে। এছাড়া ওই বিছানায় থাক থাক সাজানো রয়েছে—মানসী, বালক, মর্মবাণী। চামড়ার বাঁধাই, ওগুলোর ওপর নয়নসিন্ধু এক এক সময় শুধুই আঙুল বোলান।

খাওয়া শেষ হতেই দুজন খিদমদগার এসে বড়সাহেবের পায়ের পাতলা মোজা খুলে নিয়ে গেল। তারপর ভিজে তোয়ালে দিয়ে পায়ের তলা মুছিয়ে দিতে লাগল। শার্ট তুলে পিঠ, নাইকুণ্ডুলী, ঘাড় গলা মুছিয়ে দেবার পর নয়নসিন্ধু কয়েকটা পাশবালিশ দিয়ে বানানো বালিশ দেওয়ালে হেলান দিলেন।

আচ্ছা বলতে পার হৃষিকেশ একটা কথা?

কি কথা? এখনও তো বলেননি।

কোনও গূঢ়— বড় মাপের কথা নয়। খুব সাধারণ কথা।

বলুন।

এত লোকের গাছে লিচু হয়। তারা লিচু পায়। আমি আমাদের সিন্ধু গার্ডেনের কোনও লিচু গাছেরই লিচু পাইনি কোনওদিন। এরকম হয় কেন?

এসব কথা কখন মনে হল?

সকাল থেকেই মনে হচ্ছে হৃষি। বিশেষ করে আমবাগানের সারিতে দক্ষিণ প্যাঁচে ঘুরে এলে প্রথম যে লিচুগাছটা পাবে—ওর কথাই সকাল থেকে মনে হচ্ছে। গাছটাও সব দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। এই শীতে

ওর যখন একটা পাতা খসে তখন ভাবি—মাটির নিচে ওর পুরনো শেকড় কি তা টের পায় ?

এসব কথা রঘুর কোনওদিনই ভাল লাগে না। কেমন অস্পষ্ট। সে চাঁছা গলায় বলল, এবার আপনি ঝাড়া চল্লিশ মিনিট ঘুমোবেন। আমি ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছি।

হৃষিকেশ উঠে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকার নয়নসিন্ধুর পুরনো শরীরটাকে ঘুমের ভেতর গুঁজে দেবার আয়োজন হচ্ছে। কোথায় সিন্ধু গার্ডেন আর সে গার্ডেনের লিচু গাছ। আর কোথায় বা রেল শহর বিলাসপুরের এই হোটেল ঘরে বড়সাহেবের ঘুমপাড়ানি অন্ধকার আর মৃত্যুঞ্জয় চিকিৎসালয়ের সামনের কৃপাসিন্ধু মার্গ।

এখন তো মানুষটার মা নেই। বাবা নেই। বউ নেই, আছে ডালপালা। আর আছে তালমিছরির সাম্রাজ্য—যা কিনা নিজের গতিতেই আপনা আপনি বেড়ে চলেছে। এখান থেকে দেখা যাবে না কিন্তু পৃথিবীর কোনও এক জায়গায় পড়ে আছে সিন্ধু গার্ডেন। সেখানে লিচু গাছটার কাণ্ডে শেকড়ে, ফলে পাতায়—গাছটার চেয়ে বুড়ো অনেক বুড়োমানুষটার মন পড়ে আছে।

॥ নয় ॥

বছর ঘুরে আবার বিশ্বকর্মা পুজো এসে গেল। কৃপাসিন্ধু তালমিছরির প্ল্যান্টে বেশ বড় পুজো। প্রসাদ খুব সিম্পল। ডাল, ভাত, তরকারি আর মাংস। রাতে অফিসের সামনের গলিতে সিনেমা। কর্মচারীরা সারা ফ্যামিলি নিয়ে পেট পুরে খেয়ে এই দিনটায় সিনেমা দেখে।

কুসুমসিন্ধু ঠিক করেছেন—এই ছুটির ভেতর অফিস শিফট করবেন নতুন বাড়িতে। বাড়ির কাজ অনেক বাকি। সেখানে অফিস একবারে নিয়ে ফেলতে পারলে বকেয়া কাজ সব ধীরেসুস্থে তুলে দেওয়া যাবে।

সেইমত সিন্ধু গার্ডেনে ফোন এল। নয়নসিন্ধু ফোন, বিবাদি বাগের অফিস থেকে কুসুমসিন্ধু ফোন করছেন। সিন্ধু গার্ডেনে এখন বেলা এগারোটা। গাছে গাছে চাদ্দিক ছায়া। তার ভেতর দিয়ে পাখিদের ধুলোখেলা--মাটিতে নেমে আবার গাছের কচিপাতার খোঁজে ওদের দলবেঁধে ডালে ওঠা সবই টের পাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। কিছুই দেখতে পান না। কানে শোনেন আবছা। তবু সেই আবছা শব্দ ধরে ধরে ব্যাপারগুলো টের পাচ্ছিলেন।

এর ভেতর ফোন। রঘু ধরেছিল।

কুসুমসিন্ধু বললেন, দে—বাবাকে দে।

ফোন কানে নিয়ে নয়নসিন্ধু বললেন, কে গো!

বাবা। অফিস শিফট হচ্ছে। তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে বল রঘুকে।

বুঝলাম। রঘুর ঘর?

ওপাশ থেকে কুসুমসিন্ধুর গলা ভেসে এল, পাগল হয়েছ বাবা। এক স্কোয়ার ফুট যেখানে একুশশো টাকা সেখানে আবার রঘুর ঘর কি? নাও নাও, সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও। একদিনে এতবড়--অফিস শিফট করা কি সোজা কথা বাবা।

এক সঙ্গে অনেক কথা মনে আসছিল নয়নসিন্ধুর। যেমন--অফিসটা এত বড় করল কে? কিন্তু কিছুই না বলে নয়নসিন্ধু ফোন নামিয়ে রাখলেন।

কাছাকাছি মুখিয়েই ছিল রঘু। সে জানতে চাইল, কি হল বড়সাহেব?

নয়নসিন্ধু কোনও জবাব দিলেন না। আস্তে আস্তে দুপাশে মাথা নাড়লেন। তারপর খুবই চাপা গলায় বললেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে বাবা সেদিন ফেল হলেন— না জানি কী তাঁর মনের অবস্থা হয়েছিল।

আপনি কথা তুললেই— হয় বিদ্যোসাগর না হয় বঙ্কিম— তার নিচে নামতে পারেন না।

অস্থির হচ্ছ কেন রঘু? ও বাড়ি যদি আমি যাই তো তুমি যাবে।

আপনার নিজের হাতে বড় করা কোম্পানি— আপনি তো যাবেনই। আপনি যাবেন না কেন?

আর ইচ্ছে হয় না রঘু। এখন ছোটবেলার মত ঘাসে শুয়ে শুয়ে শুধু আকাশ দেখতে ইচ্ছে যায়।

বড়লোকের অমন নানান ইচ্ছে হয়।

আমায় শুধু বড়লোক দেখলে রঘু। আমারও মন খারাপ হয়। কান্না পায়। এসব কাকে বলব? কেউ তো নেই আর। কুসুমের মা থাকলে তবু দু একটা কথা বলতাম।

মন খারাপ করবেন না। ওতে আপনার শরীর খারাপ হয় বড়সাহেব।

বাঃ! আমি কি সিন্দুক? আমার ভেতরে কিছু ঢুকতে পারবে না?

মন খারাপ কেন?

তা জানি না রঘু। বড্ড খারাপ লাগে। পারো যদি আমাকে একটু ১৯১৬-য় নিয়ে যাবে?

যাবেন? বেশ তো চলুন।

তাহলে হৃষিকে একটা খবর দাও।

ইংরেজ ১৯১৬ সনে নয়নসিন্ধুর বয়স ছিল ছাব্বিশ। তখন দেশবন্ধু, আশুতোষ এঁরা সব তাঁদের মধ্যগগনে। আলিপুর বম্ব কেসের পর অরবিন্দ চলে গেছেন পণ্ডিচেরি। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কৃপাসিন্ধু তালমিছরি বাঙালির গেরস্থ ঘরে একটি অতি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবিবাবু দেশে বিদেশে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখন ছ বছর হল সত্যবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নয়নসিন্ধুর। কৃপাসিন্ধু তালমিছরি থেকে তখন তাঁর জন্যে ট্রামের একখানা অল সেকসন মান্থলি টিকিট বরাদ্দ হয়েছে।

কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় মোটর সারাই গ্যারাজ থেকে লেদমেসিন শপ—সব জায়গাতেই বিশ্বকর্মা পুজো বলে মাইক বাজছে। সিন্ধু গার্ডেন থেকে নয়নসিন্ধু চলেছেন ১৯১৬-য়, গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে পাখির মত পা দুখানা সামনের সিটের কাঁধে তুলে দিলেন নয়নসিন্ধু। মাথার কাছে সদ্য কেনা কয়েকখানা ছোটদের বই। ডান পাশে হৃষিকেশ। সামনে ড্রাইভারের পাশে রঘু। তারই কথায় গাড়ি এক এক জায়গায় থামছে। রঘু স্টেশনারি দোকান থেকে কী সব কিনে প্যাকেট করে আবার গাড়িতে ফিরে আসছে।

শেষমেশ গাড়ি এসে থামল রডন স্ট্রিটে। দুপাশে দুটো হাইরাইজ বাড়ি উঠছে। বারো চোদ্দতলা এক একটা। তাদের মাঝখানে একটি দোতলা বাড়ি। দুই তলাতেই টালির ছাদ লাগানো বাংলো প্যাটার্নের বারান্দা। জানলা দরজা ঢাউস। বাড়ির সামনে আগাছার ভেতর একটা বুড়ো অষ্টাবক্র আম গাছ—যাকে দেখলেই বোঝা যায়—অযত্নে, বয়সের ভারে গাছটা বহুকাল হল আর আম দেয় না।

বারান্দায় উঠে হৃষিকেশের চোখ গেল দরজার পাশের দেওয়ালে। সেখানে ধুলোকালি মাখানো পাথরে খোদাই করে লেখা লেফটেন্যান্ট কৃষ্ণকমল দত্ত, অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এমপায়ার।

যেদিকে তাকিয়ে নয়নসিন্ধু উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, আমার বন্ধু কেষ্ট— ফ্রান্সে রানিমেডের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানদের গ্যাসে মারা যায়। মরবার আগে অব্দি ষোলঘণ্টা একা ট্রেঞ্চ ছাড়েনি। জার্মানিরা ওভাররান করার

সময় ওর বড়ি পায়। আমরা দুজনেই টাউন স্কুলে রসময়বাবুর ছাত্র ছিলাম।

কড়া নাড়তে হল না। আপনা আপনি দরজা খুলে দুই মহিলা দাঁড়িয়ে। ও দাদু এসেছ। ভেতরে এস।

তোরা কেমন আছিস দেখতে এলাম।

ভেতরে আসবে তো! এস।

ভেতরে ঢুকে হৃষিকেশ অবাক হয়ে গেল। চেয়ার, টেবিল, ডিভান, আলো সবই অন্য রকমের। ডিভানটা শুয়ে শুয়ে গা ছড়িয়ে দেবার। তাতেই বসলেন নয়নসিন্ধু। হেলান দিয়ে বললেন, আজ তোরা কি খাবি ? রঘু কি এনেছে জানি না।

রঘু দুটি প্যাকেট খুলে দিল। একটায় বড় কেক। অন্যটায় পুরো এক শিশি আচার।

মহিলাদের একজন বছর পঁয়তাল্লিশ। অন্যজন এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। মুখ ভর্তি পাউডার দুজনেরই মুখে। ঠোঁট টকটকে লাল। গায়ে লতাপাতা আঁকা জংলা শাড়ি। দুজনেই চুল টান টান করে বেঁধে জোড়া বেণী করেছে।

আচারের শিশি দেখে ছোটজন রঘুর হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিল। নিয়ে বলল, দাদু ঠিক জানে—আমি কোনটি ভালবাসি।

বড়জনের দিকে তাকিয়ে নয়নসিন্ধু বললেন, কি বড়কি—কেক নিবি নে—

জানি। কেক নিলে এখন তোমায় চা করে দিতে হবে। তা দিচ্ছি—

তা না হয় দিলিই। আমি তো তোদের ঠাকুর্দার বন্ধু।

ওই দ্যাখ ছবি থেকে তাকিয়ে আছে কেষ্ট।

সত্যিই লেফটেনান্ট কৃষ্ণকমল দত্ত বিশাল একখানা ছবি থেকে এদিকেই তাকিয়ে আছে। কোমরে তলোয়ার। মাথায় চোখ অব্দি টেনে নামানো টুপি। বুকে মেডেল।

ছোটজন বলল, আমরা ঠাকুর্দাকে দেখিনি। আমার জন্মের পর মা মারা যেতেই বাবা সেই যে চলে গেলেন ইউরোপে— তারপর থেকে তুমিই আমাদের দেখাশোনা করছ দাদু।

ভুল বকছিস ছুটকি। আমি দেখব কি ? দেখছে তোদের ঠার্কুদার টাকা। ঠার্কুদার বাড়ি। ঠার্কুদার মিলিটারি পেনশন। তাও তো তোদের বিয়ে দিতে পারিনি।

বড়কি ছুটকি এক সঙ্গে বলে উঠল, বিয়ে না হয়েছে দাদু ভালই

হয়েছে। এই বেশ হয়েছে। দ্যাখো না—ঠাকুর্দার ভাইদের অন্য নাতি নাতনিরা বসতবাড়ি মোটা টাকা পেয়ে বেচে দিয়ে উঠে গেল। সেখানে এখন পেল্লায় সব বাড়ি উঠবে।

তোরা বেচিস নি তো?

না!

বেশ করেছিস।

সন্ধের মুখে ঘরের সিলিং থেকে ঝোলানো ঝাড়ের ভেতর লুকোনো ডুম জ্বলে উঠল। দক্ষিণের দেওয়াল জুড়ে লাস্ট সাপারের একখানা প্রিন্ট কাচ দিয়ে বাঁধানো। সিলিং সেই পনেরো ফুট উঁচুতে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির তলপেটটা সাদা গাঢ় রংয়ে পালিশ করানো। ঘরের কোণে হ্যাট স্ট্যান্ড।

আর এসবের মধ্যে দাঁড়ানো কেষ্টর দুই অবিবাহিতা নাতনি। বড়কি আর ছুটকি। ওদের দুখানা মুখই পাউডারে সাদা। ঠোঁট রাঙানো। কাজকরা পুতুলের মতই হাসি হাসি দুখানা মুখ ট্যাপাটোপা—গলার স্বর অব্দি অন্য রকম। ওরা একই সঙ্গে বলে উঠল দাদু—আজ তুমি অনেকদিন পরে এসেছ। ঠাকুর্দা ঠাকুমার গল্প শুনব আমরা। চা করে আনি।

চা এলে নয়নসিন্ধু শুরু করলেন। কেষ্ট তো মারা গেল ফ্রান্সের রানিমেডে। অনেকে বলে রুনিমেড। এদিকে তোদের ঠাকুমার তখন বড়জোর কুড়ি বছর বয়স। পরমাসুন্দরী। কোলে তোদের বাবা। সে বেচারা জানেই না— তার বাবা বিদেশে যুদ্ধের মাঠে মারা গেছে।

ঠাকুরমাকে দেখতে কেমন ছিল?

দুর্গাপ্রতিমার মত। বড় বড় চোখ। আমায় দাদা বলে ডাকত। বেশিদিন বাঁচল না। তোদের বাবা স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠতে না উঠতেই মাতৃহীন হল। আমি ডাকতাম— বৌঠান বলে।

তোমার বন্ধু কেষ্টর গল্প বল। তোমার বৌঠানের গল্প বল। পারলে আমাদের মা-বাবার গল্পও বল।

তোদের মা বাবার গল্প তো আমি বিশেষ জানি না। যদিও তোদের বাবার বিয়েতে আমিই বরকর্তা ছিলাম। কেন যে অভয় বিলেতে চলে গেল তা আজও জানি না। শুনেছি—তোদের মায়ের মৃত্যুর পর ওর এখানে কিছুই ভাল লাগছিল না। আমাদের তালমিছরিতে জয়েন করতে বললাম। রাজি হল না ও।

থাকগে ওসব কথা। দাদু কেমন ছিলেন?

কেষ্ট? খুব হাশিখুশি। স্কুলে আমাদের সবাইকে হাসাতো। বি এস সি পাশ দিয়ে ও যে গোপনে পল্টনে নাম লেখাবে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। খিদিরপুর থেকে যেদিন জাহাজে মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে রওনা হল—সেদিন জাহাজঘাটায় আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

তোমরা দুজনে খুব বন্ধু ছিলে?

হরিহর আত্মা। আমি ছিলাম নরম ও শক্ত। স্কুলে থাকতেই ও ঘুষোঘুষি খেলত। বীরত্বের জন্যে কৃষ্ণকমল সব কিছু করতে পারত। আমার আগে বিয়ে হয়। ওর বিয়েতে আমার স্ত্রী এয়োস্ত্রী ছিল, সারারাত আমরা দুজন বাসর জেগেছিলাম। হৈ হুল্লোড় করে কত গান গাইলাম আমি।

আজ একটা গান শোনাবে দাদু?

না রে। গলা নেই। গাইলে বুক কাঁপে আজকাল।

তাহলে থাক। দাদু বেঁচে থাকলে কত বয়স হত?

আমরা এক বয়সী। কেষ্টর এখন সাতানব্বই পার হয়ে যেত—বলতে বলতে হঠাৎ পাশে তাকিয়ে নয়নসিন্ধু বললেন, কী হৃষিকেশ কেমন লাগছে?

চমৎকার।

তাহলে একটা ঘটনা বলি। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে কেষ্টর খুব নাম হয়েছিল। স্বয়ং ব্রিটিশ সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ট্রেঞ্চের ভেতর নেমে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেন। সে ছবি বসুমতী ছেপেছিল। সেই ছাপা ছবি নিয়ে কলকাতায় কী তুলকালাম কাণ্ড। স্কুলে গিয়ে রসময়বাবুকে সে ছবি দেখাতেই তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

চায়ে কেক ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাও।

সারা ব্রিটিশ এমপায়ারের ভেতর তখন আমাদের বুক ফুলে এতখানি। কৃষ্ণকমলের ডেথ নিউজ কলকাতায় এসে পৌঁছলে আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায় দুদিন। আমি বৌঠানকে সাহস দিই। সরকারি খরচায় নার্সিং পড়ার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন বড়লাট বাহাদুর। তা বৌঠান নেননি। তিনি তখন শোকে অধীর। সেই সময় থেকেই উপোস দিয়ে দিয়ে রাজরোগটি বাঁধান। অজয় যখন থার্ড ক্লাসে—তখন রক্ত উঠে বৌঠান মারা গেলেন। অভয় ছিল হোস্টেলে। সেই থেকেই তোদের বাবা একা একা। মনের কথা কাউকে বলত না। বড়জোর আমার বউকে দুএকটা বলত। আর কাউকে না।

বড়কি আর ছুটকি পঁয়তাল্লিশ বছরের দুই কুমারী। তারা দুজনেই

নয়নসিন্ধুর মুখে তাকিয়ে প্রতিটি কথা গ্রোগাসে গিলছে। এই মানুষটি তাদের দুই পুরুষের অভিভাবক।

হৃষিকেশ দেখল—অনেকদিন পরে মহাতৃপ্তিতে হাসতে হাসতে চায়ে কেক ডোবাচ্ছেন নয়নসিন্ধু। মুখে চিন্তার কোনও রেখা নেই। রেখা যা-তা বয়সের। আমরা টিসু পেপারের মত ফিনফিনে শতাব্দীর বয়সী। রগড়ালেই বুঝি কুঁচকে যাবে। ছিঁড়েও যেতে পারে।

মানুষের শরীর এত পলকা অথচ সেই শরীরের ভেতরে কত গল্প-কত সুখ—কত দুঃখ। সেই শরীরের গোঁফে, চুলে, ভ্রূতে নয়নসিন্ধুকে আবার রং দিতে হয়। নয়তো যে একেবারে থুরথুরে বুড়ো দেখাবে তাকে।

কথা বলতে বলতে নয়নসিন্ধু ঝুঁকে পড়ে বড়কি আর ছুটকিকে দেখলেন। দেখে বললেন, হ্যাঁরে তোরা কেমন সেজেছিস?

কেন দাদু? যেমন সেজে থাকি অন্যদিন তেমন সেজেছি।

সে কেমন রে?

মায়ের একখানা ছবি ছিল। আর নেই তা। ঠাকুরমার একখানা ছবি ছিল। আর নেই তা। সেইসব ছবির ধাঁচে দাদু। যেমন—এই জোড়া বেণী, আঁচল ফিরে শাড়িপরা—সবই বজায় করে রাখি আমরা। সেইসব ছবির মত সাজি আমরা। বাইরে তো কোনওদিন বেরোইনি। শাড়ি দুখানা সেই আমলের।

সেই আমলের? কোথায় পেলি?

মা ঠাকুরমার প্যাঁটরা ঘেঁটে। আচ্ছা দাদু—সেই যে তোমরা ঠাকুরদার খারাপ খবর পেলে—তখনকার এই কলকাতা কেমন ছিল?

সব কি দিদিভাই মনে আছে? তবে আমরা—আমি আর কেষ্ট ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ির সবার সঙ্গে গিরীশ ঘোষের প্রফুল্ল থিয়েটার দেখতে গেছি। তখন তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। দম রাখতে পারেন না। একটা ডায়ালগ দিয়ে হাঁপাতে থাকেন। দানিবাবুকে আমরা উঠতে দেখেছি। শিশিরবাবুকে মনে হয়— এই তো সেদিনের— কলকাতায় তখন মোটমাট বারোখানা মোটরগাড়ি। সে তুলনায় ঘোড়ারগাড়ি হাজার কয়েক।

॥ দশ ॥

সিন্ধু গার্ডেনের এই বাড়িটা একেবারে তৈরি হয়নি।

কৃপাসিন্ধু তালমিছরি যেমন বড় হয়েছে—বাড়িটাও তেমন তৈরি

হয়েছে। সত্যবতী এই বাড়িটাকে একটু একটু করে বড় করেন। কিন্তু কুসুমের বউকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। কারণ, কাউকে তিনি তেমন পাননি কাছে। এ বাড়ির সুলুক সন্ধান সবই তিনি জানতেন।

আর এখন তা জানেন মাত্র দুজন। একজন নয়নসিন্ধু নিজে। আর অন্যজন কুসুমসিন্ধু। বাঁধানো থাক থাক পাঞ্চ আর স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে বোঝাই বইয়ের র‍্যাকটা সরালেই বাড়ির পেছন দিকে আবার একটা বড় ঘর। আগাগোড়া কাঠের প্যানেল মেঝে থেকে মানুষ প্রমাণ দেওয়াল ধরে উঠে গেছে। মেঝেতে লাইনোলিয়ম। এ ঘরখানার দেওয়াল চল্লিশ ইঞ্চি। সেই দেওয়ালের গা কেটে জং পড়ানো টিনের বাক্স বসানো থাক থাক। সেইসব বাক্সে টিনের দেরাজ, তাতে পাউডার ছড়ানো। পাছে পোকামাকড় আসে।

বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। বারান্দায় বসে সিন্ধু গার্ডেনের গাছপালার নিচে তাকিয়ে ছিলেন নয়নসিন্ধু এতক্ষণ। আশ্বিনের আজ কত তারিখ? মনেও পড়ল না। সকালবেলা। এখন এখানে বড় বড় গাছের নিচে বড় বড় ছায়া। ছায়াদের ফাঁক ফোকরেই রোদকে এখানে দেখা যায়।

ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে মনের ভেতর ভেসে আসা ছবিগুলোকে নয়নসিন্ধু যেন ওইসব গাছতলার ছায়ায় থিয়েটারের রিহার্সেলের মতই অভিনয় হতে দেখতে থাকলেন।

পুরনো বাড়ির উঠোনে প্রাইভেট টিউটর এসে মাদুর বিছিয়ে বসলেন। সন্ধেতেও হেরিকেন নিয়ে পড়ুয়া নয়নসিন্ধু বই হাতে পড়তে বসল। কী একটা বানান ভুল হতেই প্রাইভেট টিউটর বিরাশি-শিক্কার থাপ্পড় মারলেন। বালক নয়নসিন্ধু সেই থাপ্পড়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়ল। বউদিরা ছুটে এসে নয়নকে নিয়ে গেলেন। কানের নিচে ঠাণ্ডা জলের সেঁক নিয়ে নয়ন আবার এসে পড়তে বসল।

স্কুলে রসময় মাস্টারমশাই ফেল করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আর ক্লাসফ্রেন্ড কৃষ্ণকমল পাখোয়াজ বাজিয়ে কীর্তন গাইছেন। রসময় মাস্টারের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

ফ্রাঙ্করসের ওষুধের দোকানে যুবক নয়নসিন্ধু তালমিছরির গুণাগুণ বুঝিয়ে বলছে। সাহেব ডাক্তার মন নিয়ে শুনে বললেন, গিভ মি ফিউ স্যাম্পেল।

এখনকার নতুন বাড়ি গাঁথুনির কাজ চলছে। তদারকি করছেন। এক মহিলা। হাতে ছাতা। আকাশে ঝাঁঝালো রোদ। ছাতার ফাঁক দিয়ে মহিলার মুখ দেখা গেল। এ যে সত্যবতী! নয়নসিন্ধুর সহধর্মিনী।

এবার নয়নসিন্ধু টের পেলেন। এতবড় বাড়ির ফাঁকা বারান্দায় বসে বসে তিনি একা একা কাঁদছেন। পাশে কেউ নেই যে—তুলো দিয়ে তাঁর ভিজে গাল তাকে ব্লট করে দিতে বলবেন।

ছড়ি ভর দিয়ে বড় ঘরে ঢুকলেন। তারপর স্ট্রান্ড আর পাঞ্চ ম্যাগাজিনে বোঝাই পাল্লাটা আস্তে সরিয়ে তার পেছনের সেই লুকোনো ঘরখানায় ঢুকে পড়লেন নয়নসিন্ধু।

এঘরে পাইপ দিয়ে পাশের ঘর থেকে সবসময় বাতাস ঢোকে। বাইরের বইয়ের পাল্লা সরিয়ে এঘরে ঢুকতে গেলেই আপনাআপনি নিওন আলো জ্বলে ওঠে।

ঘরখানা বাইরের তুলনায় ঠাণ্ডা। কোনও শব্দ ঢোকে না এখানে। নয়নসিন্ধু একেবারে সামনের দেরাজটা টানলেন। এটা বোধহয় সন ইংরাজি উনিশশো তেতাল্লিশের দেরাজ। ভেতরে তাকালেন তিনি। যুদ্ধের সময়কার একশো টাকার নোটের থাক। লাট দিয়ে সাজানো।

ঝুঁকে পড়ে পাশের দেরাজটা টামলেন। এখানে সন ইংরাজি উনিশশো সাঁইত্রিশ শুয়ে আছে। চার দেওয়াল জুড়ে দেরাজের পর দেরাজ। উনিশশো সতেরো থেকে হালের সাল অব্দি আলাদা আলাদা দেরাজ। এসব দেরাজের কথা অলকসিন্ধু এখনও জানে না। তাকে তা একদিন জানাবে তারই বাবা কুসুমসিন্ধু। তখন অলকসিন্ধুকে দাদুভাই বলে ডাকার জন্যে এই দুনিয়ায় থাকবেন না। এই ব্যবস্থাই নিজের ছেলের সঙ্গে মন্ত্রগুপ্তির মত স্থির হয়ে আছে নয়নসিন্ধুর।

সন ইংরাজি উনিশশো বেয়াল্লিশের আগেকার দেরাজগুলো অবরে সবরে খোলা হয়। তখনকার একশো টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নিয়েছে সরকার। ওসব নোট বাজারে ছাড়লে সবাই তাকিয়ে থাকবে। তাই ব্যবস্থাটা কিছু অন্যরকম।

ইন্ডিয়া তখন স্বাধীন হচ্ছিল—যখন এইসব একশো টাকার নোট নয়নসিন্ধু বড়বাজারে তেতাল্লিশ টাকা দিয়ে ভাঙাছিলেন। একশো টাকার নোট দিয়ে সাতান্ন টাকা পেতেন। পরে জেনেছেন তুলোর ফরওয়ার্ড কারবারিরা সেসব নোট ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডে জমা দিয়ে একশো টাকায় একশো টাকাই পেত। এই নোট কিনে নিয়ে বড়বাজারের একটা দিক রাতারাতি বড় হয়ে যায়। মহাযুদ্ধ থেমে যাওয়ার দুবছরের মাথায় সাধারণ লোকের অনেকের হাতেই এই একশো টাকার নোট ছিল। যারা ভাঙাতে পারেনি—তাদেরটা বাতিল হয়ে গেছে। সবাই তো ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডে

জমা দিয়ে ভাঙাতে পারে না। সবাই ফরওয়ার্ড কারবারিও নয়।

টাকার সমাধি ভারি অদ্ভুত লাগে নয়নসিন্ধুর। একশো টাকার শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে নোট হাতে নিয়ে বসে থাকায় কেউ হল ফকির। আর বড়বাজারের কিছু ফকির বাট্টায় কিনে সেইসত শ টাকার নোটে শ' টাকাই পেল। দুনিয়ার বাজারে যাদের তুলোর কারবার ছিল তারা আর কি।

দেরি হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু নোট নয়নসিন্ধু তখন ভাঙাতে পারেননি। কৃপাসিন্ধুকে এসব উটকো ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

নয়নসিন্ধু আর তার মত কিছু কারবারি, যাদের সঙ্গে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির নিয়মিত লেনদেন আছে—নিজেদের ভেতর তারা একটা আপস রফা করে নিয়েছেন। এ ওর জিনিস কিনলে ওই নোটে লেনদেন হয়। পাঁচ ছ ঘর কারবারি ভেতর ওই একই নোট বারবার হাত বদল হচ্ছে। বাজারে বাতিল কারেন্সি নোট ওদের নিজেদের ভেতর চালু রেখেছেন ওরা। ফলে মূলধনে টান পড়ার ভয় নেই। টাকাটাও জলে গেল না। কাজটাও দিব্যি হয়ে যাচ্ছে।

নানা সাল সনের রকমারি নোটের কয়েক কোটি টাকার গদির ভেতর খানিকক্ষণের জন্য তম্ময় হয়ে পড়েছিলেন নয়নসিন্ধু। পাল্লা সরাবার একটা সামান্য ক্যাঁচ শব্দে তটস্থ নয়নসিন্ধু 'কে'? বলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

দিনের বেলায় এখানে ঢুকছ কেন?

ওঃ! তুমি তা বেশ। কিন্তু আমার খোঁজে এত ভেতরে কেন?

একথায় কুসুমসিন্ধু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। এ কোন নয়নসিন্ধু? একে তো সে চেনে না। তার বাবা নয়নসিন্ধু চিরকালই পুত্রগত প্রাণ। পর পর দুদিন কথা না বললে নয়নসিন্ধু তার দিকে ফিরে তাকাবেন—আর বলবেন—ও কুসুম বাবা! আমি আবার কী দোষ করলাম বেশি বয়সে—যে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিলি? আমি তো আর সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারিনে বাবা—তুই যে আমার একটাই ছেলে আর আমার কেউ নেই—

আর এখন, কুসুমসিন্ধু দেখলেন, তাঁর বাবার চোখের ঘোলা দৃষ্টিতে একটা অপরিচয় এসে থানা গেড়েছে। মাথার ওপর থেকে কয়েক গোছা চুল কপালে। সরু পাতলা ঠোঁটে ওপরের পাটির দুটি বাঁধানো দাঁত যেন চেপে বসল।

কেন? তোমার খোঁজ নিতে এখানে আসা আমার বারণ?

কোনও বারণ নেই। কিন্তু শুধু শুধু আর কেন বাবা বলে ডাকো আমায়।

তুমি আমার বাবা। তাই বাবা বলে ডাকি। এবার বলতো দিনের বেলায় এখানে ঢুকেছ কেন?

আমার কিবা দিন কিবা রাত। দ্যাখো আমরা দুজন আলাদা মানুষ। এই যা কিছু দেখছ—এই সবই আমার আয় করা। এই টাকা কৃপাসিন্ধু মিছরির খোলা খাতায় দেখানো অসম্ভব।

এত পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে আসল কথা বলে ফেল বাবা—

দরকার আছে। কারণ এই সব টাকাই আমারই বুদ্ধিবলে কৃপাসিন্ধু মিছরি আয় করেছিল।

জানি। তখন আমার বয়স হয়নি। তুমিই সব দেখতে বাবা। বাবা কথাটা জলন্ত গোলা হয়ে নয়নসিন্ধুর বুকে গিয়ে সিধে বসে যাচ্ছিল।

তিনি চিড়বিড় করে বলে উঠলেন, এত বাবা ডাকার দরকার দেখি না।

আমারও বয়স হয়েছে বাবা। আমাকেও একদিন ছেলের মুখোমুখি এ ঘরে এসে দাঁড়াতে হবে। বাবাকে তো আর দাদা ডাকতে পারি না।

তখন তাকে বলো—এই সব টাকা তোমার বাবার একার উপার্জিত।

তা তো বোঝা গেল। কিন্তু এতগুলো বাতিল টাকার ভেতর বসে কী সুখ পাচ্ছ?

যে কথা বলছিলাম—আমি আর তোমার বাবাও নই—দাদাও নই। আমরা দুজন আলাদা মানুষ। সংসার করতে গিয়ে আমি তোমার বাবা। তুমি আমার ছেলে। তোমার বাল্যকাল কবেই কেটে গেছে। আমিও সাধারণ মানুষের তুলনায় দেড়গুণ বেশি বেঁচে আছি।

তা তো বুঝলাম। এ সবই আমার জানা বাবা। তুমি আর রঘু মিলে নতুন বাড়িতে তোমার চেয়ার পত্তর নিতে দাওনি।

ওই চেয়ার কখানাই আছে আমার, আর কি আছে কিছু?

তোমার রঘুনাথ বাহন আছে বাবা। তার কথার উঠছ বসছ।

দ্যাখো কুসুমসিন্ধু— এই কৃপাসিন্ধু তালমিছরি আমার হাতে উঠেছে, আমি কাবও কথায় উঠি না বসি না, তুমি আমার চোখের মণি। তুমি আমার দিক থেকে শুধুই আদর, ভালবাসা, সিকিউরিটি সব পেয়ে এসেছ। পেতে পেতে এমনই অভ্যস্ত হয়েছো যে— আমি যে একটা মানুষ— আমি যে তোমার বাবা— আমিই যে কৃপাসিন্ধু তালমিছরিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলাম একথা তুমি একদম ভুলে বসে আছ।

কার ওপর অভিমান করছ বাবা। আমার এখন পঁয়ষট্টি। ব্লাড সুগার প্রায় চারশো। হয়তো তোমার আগেই আমি চলে যাব।

কার ডাক কখন পড়ে কেউ আগাম বলতে পারে না। তুমি প্রৌঢ় হয়েছ। তুমি নিশ্চয় জানো—এখন আর তোমার আগের মত সম্পর্কগুলো—টান ভালবাসা জোরালো লাগে না। জীবনে এমন কিছু নেই যা তুমি পাওনি। ছেলেবেলা থেকে সবই আমি তোমাকে দিয়েছি। এমনকি ব্যবসা বড় করে তোলার ধাক্কাও তোমার গায়ে লাগতে দিইনি। এখন যদি কেউ আগে যায় তো— কারও বিশেষ বাজবে না।

বাড়ির বাইরে আলাদা করে বানানো ঘর। গাছপালা দিয়ে বাইরে থেকে ঢাকা। অথচ বাড়ির ভেতর থেকে একখানা আলমারি পাল্লাসুদ্ধ সরিয়ে দিলেই এঘরে চলে আসা যায়। পাল্লাটা শুধু শক্ত করে টেনে দেওয়া। এখানে এই ঘরে কৃপাসিন্ধু মিছরির কাঁচামালের মূলধন দেরাজে দেরাজে থাক থাক শুয়ে আছে। চলে যাওয়া সময়ের সচল টাকা—যা কিনা আজ বাতিল তা এই ঘর মানুষের হাতের আঙুলের নাড়াচাড়ায় সচল হয়ে ওঠে। কয়েকঘর কারবারির ভেতরে এই টাকা এখন লক্ষ্মী। নয়তো এদের দাম পুরনো কাগজের চেয়ে বেশি নয়।

কুসুমসিন্ধু নয়নসিন্ধুকে ঘরের একমাত্র চেয়ারখানা এগিয়ে নিয়ে ধরে ধরে বসিয়ে দিলেন। নয়ন কোনও আপত্তি করলেন না। তিনি বসলে তবে কুসুমসিন্ধু ঘরের একমাত্র টুলটা টেনে বসলেন। মেঝেতে লাইনোলিয়াম। দেওয়ালে ড্যাম্প আটকানোর দামী রং। দেরাজগুলো সাঙ্কেতিক নম্বরে নম্বরে চেনা যায়। যে নম্বরগুলো তামার পাতে খোদাই করে কুসুমসিন্ধু আর নয়নসিন্ধুর গলার জপের মালার বড় লকেটের পেটে আলাদা আলাদা করে ভরে দেওয়া আছে।

টুলে বসে কুসুমসিন্ধু বললেন—আমারও সব সম্পর্ক বেশ কিছুকাল আলগা লাগে বাবা। এই যে আমার ছেলে তোমার বউমা সবই কেমন আলাদা হয়ে গেছে অনেকদিন। আমার সঙ্গে কোনও যোগই নেই তাদের।

কানে এসেছিল— দাদুভাই একটি মেয়েকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

তুমি জানলে কি করে বাবা?

তুমি তো জানো কুসুম— এই কৃপাসিন্ধু মিছরির পুরনো ড্রাইভাররা প্রায় সবাই আমার হাত থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে।

ওরা তোমার খবরাখবর দেয় আমি জানি। তা তুমি চিন্তা করো না বাবা।

আমিই তো চিন্তা করব কুসুমসিন্ধু। তোমার বয়স হয়েছে। তোমার ছেলে কী করল না করল— তা আমি ভাবব না?

নিশ্চয় ভাববে। কিন্তু আমি তো তোমারই ছেলে। যা করার তাই করেছিলাম।

কি করেছিলে?

মেয়েটির আবার বিয়ে দিলাম। আমি আর তোমার বউমা মিলে মহা ধূমধামে পাত্র জোগাড় করে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

ও বিয়ে টিকবে না।

তুমি জানলে কি করে? সত্যিই ভেঙে গেছে।

এ মেয়ে দাদুভাইয়ের কাছে আবার ফিরে আসবে কুসুম।

তাহলে কি করব বাবা?

নাতবউকে অফিসে এনে বসাও। দাদুভাই তাহলে নজরে থাকবে।

তুমি এসে অফিসে বোসো, তোমার অফিস বাবা।

না। আমার অফিস নয়। আমি যেকোনও দিন মরে যাব। এখন অফিস অফিস করে আমার নাচানাচি মানায় না। আমি বাতিল। আমাকে এই বাতিল নোটগুলোর সঙ্গে থাকতে দাও।

তা হয় না বাবা। তুমি বাতিল নয়।

আমি বাতিল কুসুমসিন্ধু।

তোমায় ছাড়া হবে না বাবা। এই যে নতুন বাড়ি উঠল তার টাকা তোমার সিন্ধু গার্ডেন মর্টগেজ করে তার ব্যাংক থেকে এসেছে।

জানি। টাকা হলে ছাড়িয়ে নেবে।

সবই হবে বাবা। তোমায় মাঝখানে থাকতে হবে সবকিছুর।

আমায় বাদ দাও কুসুম। আমি এখন পুরানো নোটগুলো দেখব। নেড়েচেড়ে দেখা হয়নি অনেকদিন। এই স্প্রেয়ারটা দাও তো।

কি করবে?

অনেকদিন গ্যামাক্সিন স্প্রে করা হয়নি। পোকা না লাগে শেষে। আমার কষ্টের আয়।

কুসুমসিন্ধু কথা বাড়ালেন না। নিচু হয়ে স্প্রেয়ার তুলে নয়নসিন্ধুর হাতে দিলেন। হাতে পেয়ে নয়নসিন্ধু তাঁর বুকের কাছাকাছি দেরাজটা টেনে খুললেন। তারপর আন্দাজে দেরাজের খোলামুখে স্প্রে করতে লাগলেন।

কুসুমসিন্ধু দেখলেন, তাঁর বাবার হাত স্প্রে করতে গিয়ে কাঁপছে।

অশক্ত কাঁপা হাতের চাপে স্প্রে মেসিনের নল থেকে গ্যামাক্সিন ছড়িয়ে পড়ছিল। এলোমেলোভাবে। খানিক দেরাজে পড়ছে। থাক থাক নোটের বাণ্ডিলের ওপর। কিছু পড়ছে মেঝেয়। নীল লাইনোলিয়মে সাদা গ্যামাক্সিনের গুঁড়ো।

তৃতীয় মেরু

কলকাতায় ভোর আসে সম্রাটের কায়দায়। অন্ধকারে লাল হয়ে পুব দিগন্ত প্রথমে জাগে। তারপর সেখান থেকে আলোর ছটা পাঠিয়ে সূর্য একটা একটা করে অন্ধকার জায়গার দখল নিতে থাকে। গাছের মাথা, দশতলা বাড়ির মুণ্ডু, জলের ট্যাঙ্ক, টিভি টাওয়ার অন্ধকার থেকে ফুটে বেরোয়।

বাড়িওয়ালারা কলঘরের মেশিন চালিয়ে বউকে ডাকে, চা চাপাও। পাড়ার ছাইগাদার হুলো বিড়াল, গাড়িবারান্দাগুলোয় শুয়ে থাকা রাস্তার কুকুররা জেগে উঠেছে। এবার মিষ্টির দোকান থেকে ছানাকাটা পচা জল ড্রেনে ঢালা হবে। তার গন্ধে রাস্তাটায় খানিকক্ষণ হুলো বিড়াল দুটো ঘুরে বেড়াবে। এখন নাইট ডিউটি দিয়ে নার্সিংহোম থেকে ফিরবে একজন মেট্রন। মর্নিং ওয়াকে দু-একজন করে বেরিয়ে পড়বে। ডিপো থেকে হাসতে হাসতে ঘণ্টা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ট্রাম।

কোথাও কিছু নেই, ট্রাম রাস্তার ওপর রিকশা স্ট্যান্ডে শনিঠাকুরের মূর্তির সামনে ডেকরেটরের দোকান থেকে ভাড়ায় আনা বারকোস সাজিয়ে দিল রিকশাওয়ালারা। সবজিওয়ালা, পরামাণিক, বাড়ির দালাল, স্থায়ী বেকাররা শনিঠাকুরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বিশ পয়সা, দশপয়সা বারকোসে ছুড়ে দিয়ে শনিঠাকুরকে প্রণাম ঠুকেই এগিয়ে যেতে লাগল।

রিকশাওয়ালারাও যেন মজা পেয়ে গেল। তারা ভাঙায় আনা মাইক্রোফোনে হিন্দি ছবির চড়া তালের রেকর্ড চালাল রাস্তার আলোর খুঁটি থেকে কারেন্ট নিয়ে। সে গান শুনতে বিশেষ কেউ নেই। শুধু একটা বাতিল বিশাল নিউজার্সি গাই মোড়ের মাথায় বসে গানের তালে কান লটপট করতে লাগল মাঝে মাঝে। তার চোখে তাকালে হয়তো আমেরিকার নিউজার্সির ভুলে যাওয়া স্মৃতির চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কে অতবড় একটা জন্তুর মুখোমুখি বসে তার চোখে জড়িয়ে যাওয়া স্বপ্নের ছায়া দেখবে?

একজন মাঝবয়েসী মানুষ, দেখেই বোঝা যায় সে এ-পাড়ার ভাড়াটে। তার বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে পায়চারি করছিল। আর কবজির ঘড়ির কাঁটায় মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। ভারি চোখ, অন্যমনস্ক হলে লোকটিকে নিশ্চয় চিন্তাশীল মনে হতে পারে। পাজামার দড়ি গায়ের পাঞ্জাবির নিচে ঝুলে আছে। চওড়া কাঁধ, বাহুমূল থেকে তার শরীরের দু'পাশে ঝুলে থাকা হাত দুখানি যেন দুখানি বেলচা।

ইনি আমার শ্বশুরমশাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করলে ওঁর ভাল লাগবে। আপনারা একই লাইনের—

কাকভোর। ফুলপ্যান্ট বুশশার্ট গায়ে এক জবুথুবু ভদ্রলোককে হাত ধরে নিয়ে হাঁটতে বলা ভাল, হাঁটাতে নিয়ে বেরিয়েছে পাড়ারই কৃতী যুবা। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।

এদের দুজনকেই খুব ভোরবেলা রোজ দেখতে পায় টগর মিত্তির। সে যখন আলো ফোটার আগে বাড়ির সামনের গাড়িবারান্দায় ছাদের নিচে ঘড়ি ধরে হাঁটে—বারো ফুট জায়গার ভেতর ঘন ঘন মোড় ঘুরে পায়চারি করে ঘাড় ঘোরায়, হাত ঘোরায়, পেশীর জং ছাড়ায়, স্পট জগিং করে বেঁচে থাকার ইজারার মেয়াদ বাড়াতে চায়। তখনই দেখতে পায় বুশশার্ট গায়ে ফরসা পানা আধপাকা মাথার এই জবুথুবু মানুষটিকে নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সরল বড়াল ট্রাম লাইনের দিকে নিয়ে যায়।

তখনও লাইটপোস্টে আলো। রাস্তার কুকুররা ঘুমন্ত। দু একটি হুলো বেড়াল সবে ছাইগাদায় উঠে বসেছে। পাড়ার মিষ্টির দোকানের ড্রেনে একটা মিষ্টি পচা গন্ধ। দূরে কোথাও সারা রাতের সংকীর্তন থামে। মর্নিং স্কুলের এক দিদিমণি এবার সেজেগুজে বেরোবে। ইনসোমনিয়ার রুগী কিছু গেরস্থ এখন কুকুর নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পায়চারি করবে। কুকুরের টানে তাদের লুঙ্গি খুলে যাবার দশা হবে। কিন্তু খুলবে না। এ পাড়ায় টগর এখনও নতুন। সবে দেড় দু বছর হল সে ভাড়া এসেছে। পাড়ায় আদি বাড়িওয়ালারা প্রায় তারা সবাই গত। দু-একজন বিধবা, স্বামীর হয়ে ভাড়ার রসিদ কাটেন। আর বেশির ভাগ বাড়ির বংশধররা কিছুদিন অন্তর ভাড়াটে চলে গেলেই মোটা আগাম নিয়ে ভাড়া বসায়। সেই আগামটাই ব্যাঙ্কে ফেলে— তার সুদ এখন ওদের আয়।

বরং বলা যায়— আদি ভাড়াটে অনেক। তারাই দুর্গাপুজো, থিয়েটার বিলডিং সারানো সবই করে। তিনখানা ঘর নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগের ভাড়া দেয়। সে টাকায় একখানা টাঙাইল শাড়ি পাওয়া যায় এখন।

এরাই এ এলাকায় এখন উচিত বক্তা। কারণ—এই ভাড়ার থেকে তারা বাইরে দূরে লোন নিয়ে বাড়ি করে ভাড়া দিচ্ছে মোটা টাকায়। তাতে লোন শোধ হচ্ছে।

টগর মিত্তিরের ভুয়োদর্শন এই সুবাদেই, সরল বড়াল অফিস থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট নামে দুটি অন্ধকূপ বানিয়ে দোতলা করে ওপরে উঠে গেছে সম্প্রতি। নিজের ছোট ভায়রার জন্য বাড়ি ভাড়া চাইতে গিয়ে এক পরিশ্রমী কৃতী সরল বড়ালের সঙ্গে তাঁর যে বাক্যালাপ হয় তা অনেকটা এইরকম—

দেখুন, আমি ব্যাঙ্কের অফিসার ছাড়া ভাড়া দেব না। সাউথ ইন্ডিয়ান অফিসার ভাড়াটে চাই আমার।— যারা তিন বছর পরেই আবার দেশে ফিরে যায়।

কেন ?

বুঝলেন না ? তিন বছর অন্তর আমি তা হলে ভাড়া বাড়াতে পারব। নয়তো বাড়ির লোন শোধ হবে কি করে ?

এর ভেতরে কতটা লোন ? কতটা লোভ ? পায়ের ওপর পা দিয়ে ভাড়া আদায়ের সুখ কতটা ? কে বলতে পারে ?

এখান থেকে পায়চারির হাঁটাপথ— তা দশ মিনিট। তার মানে চার ফারলং তো বটেই। ট্রামলাইন অবধি গিয়ে ফিরে এলেই একটি মাইল হাঁটা হয়ে যায়। এর বেশি যারা হাঁটতে চায়, তাদের জন্যে আছে ভোরবেলার ফাঁকা রাস্তা।

সেসব ফাঁকা রাস্তা কোনটা চলে গেছে কলকাতা শেষ করে খাল পেরিয়ে ধানক্ষেতের দিকে। কোনও রাস্তা গেছে একটি মাত্র বাসরুটের লোভে বসবাসের অযোগ্য হঠাৎ গজানো সব লোকালয়ে, কোনও রাস্তা বা শহরের গভীরে।

এইসব রাস্তার গায়ে বিকেল হলেই অ্যাতো ফেরিওয়ালা বসে, অ্যাতো ফ্রক আর কাটপিস টাঙিয়ে খদ্দেরের জন্যে তারা তাকিয়ে থাকে, দেখলে টগর মিত্তিরের মনে হয় ভারতবর্ষে যত লোক জন্মায় ফি বছর তার চেয়ে বেশি জন্মায়—

রবারের চটি, গেঞ্জি,
জাঙ্গিয়া, মোজা,
রুমাল, ব্রেসিয়ার,
ফ্রক, ইজের আর কাটপিস্।

এ যেন অন্তহীন, তাই ওসব দিকে বেড়াতে না গিয়ে পাতাল রেলের স্টেশনের দিকে গিয়ে টগর মিত্তির তাকিয়ে থাকে। ভোররাতে— তখন কোন ট্রেন নেই। রাস্তার লোক নেই। কিন্তু জয়পুরী পাথরের নতুন ঝকঝকে স্টেশন বাড়িটা লাখো লাখো পাওয়ারের ইলেকট্রিক আলোয় জ্বলজ্বল করে।

অন্ধকার নিঃশব্দ কলকাতার বুক কুঁদে বানানো নতুন কোহিনুর যেন শেষরাতে।

জামাইয়ের কথায় শ্বশুর যেন থপ করেই থেমে গেল। কার কথা বলছ সরল ?

টগর এবার বুঝল কেন এভাবে হাঁটা।

সরল বলল, এই আমার নেবার, আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র। নাম বললেই চিনবেন আপনি। টগর সরলকে থামিয়ে বলল, আমার নাম টগর মিত্র।

কে ! বলে চমকে উঠল সরল বড়ালের শ্বশুর। সরল বড়াল বলে, উনি তো নাম বললেন, টগর মিত্তির, বিখ্যাত লেখক। টগর আপত্তি করে উঠল, না না। তেমন কিছু নয়।

বাবা, উনি খুব বিনয়ী। বলেই সরল বড়াল টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, ওঁর তো সারাজীবন ছাপাছাপি প্রেস নিয়েই কেটেছে। শেষে চোখটা খারাপ হয়ে একদম বসে গিয়ে রিটায়ারের পরেও পি এম বাগচির প্রেসে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পুরো পঞ্জিকা, অ্যাই অ্যাতো মোটা পাক্কা তিন তিনটে বছর এডিট করেছেন।

সে সব কথা থাক সরল। বলতে বলতে শ্বশুর এগোল।

সরল এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরলো। পড়ে যাবেন। বলেই টগরকে বলল, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ ও আরও কি সব রত্ন, স্মৃতি এক গণ্ডা থাকে ওঁর নামের পাশে, আমি অপোগণ্ড জামাই। কিছু মনে রাখতে পারি না। টগর মিত্র বুঝল, বেদান্ততীর্থের জামাই বড়াল যখন— তখন এ এক অসবর্ণ বিয়ে। চট্টোপাধ্যায়মশয় রীতিমত প্রগেসিভ কিংবা দলছুট। নয়তো এমন বিয়ে তো সাধারণত হয় না।

এবার মনে পড়ল টগরের। সরল যখন ছুটির দিনে বেড়িয়ে ফেরে তার বিশাল মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে থাকে টকটকে ফর্সা বউ আর ফুটফুটে দুটি বাচ্চা— এই ছয় আর দশ হবে।

ঘুট ঘুট করে তিনজনের দলটি এগোচ্ছিল। শ্রীকুমার পূর্ণ অন্ধ। গৌরবর্ণ। মাথায় সাদার চেয়ে কালোই বেশি। অন্ধ বলেই ভোররাতের

ফিকে আলোয় শ্রীকুমারের মুখখানা বেশি ভাবুক লাগল টগরের। স্মৃতিতীর্থ, ন্যায়রত্ন তর্কপঞ্চাননও বোধ হয় মানুষটি। জীবনে কতই না মীমাংসা করেছেন। কতই না তর্কালঙ্কারী করেছেন। হয়তো নামের শেষে এক সময় মীমাংসাসাগর তর্কালঙ্কারও থাকত।

বেদান্ততীর্থ হঠাৎ থেমে বললেন, মাপ করবেন। আপনার নামটি আবার বলুন তো?

টগর বলল। বলে লাজুক হয়ে পড়ল। এ নাম আপনি শোনেননি?

সরল বড়াল বলল, বিলক্ষণ শুনেছেন।

না বাবা। আমি শুনিনি।

টগর বললেন, না শোনারই কথা।

সরল লজ্জায় পড়ে বলল, তা কখনও হয়। কত লেখা আপনি লেখেন। নিশ্চয় বাবা শুনেছেন। হয়তো মনে নেই।

নাম আমি শুনিনি সরল। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর আমার শোনা। বলে অন্ধ মানুষটি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে খোলা চোখ উল্টে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্ধ মানুষ কিছু মনে করতে গেলে ভীষণ চোখের পলক পড়ে। ঘন ঘন। সেদিকে তাকানো যায় না।

বেশ লজ্জা পেয়ে টগর বলল, আমি যখন সভা-সমিতিতে যাচ্ছি তখন নিশ্চয় আপনি কর্মজীবন থেকে সরে এসেছেন।

হ্যাঁ। তা তো হবেই। আপনি বড়জোর এই বছর দশেক সভা-সমিতি করেন কি, ঠিক বলেছি?

এগজ্যাক্টলি তাই।

আর দেখুন আমি বসে গেছি তা ১৫-১৬ বছর হয়ে গেল। সভা-সমিতিতে বিশেষ করে সাহিত্য সভায় আমি কোনও দিনই যাইনি।

সরল বড়াল বলল, তাহলে বাবা আপনি ওঁর গলা শুনে থাকবেন রেডিওতে কিংবা টিভিতে।

তুমি তো জানো সরল, আমি অন্ধ হবার পর এদেশে টিভি এসেছে। আমি কোনও দিন টিভি দেখিনি। টিভি শুনিনি।

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। পায়চারির চেয়েও ধীর লয়ে হাঁটা।

তাহলে কি রেডিওতে শুনেছেন বাবা?

তা হতে পারে। স্মৃতি আজকাল বড়ই বঞ্চনা করে। কোনও জিনিসই পুরোটা মনে করতে পারি না। তবে টগরবাবুর গলা আমি আগেও শুনেছি এতেও আমার কোনও ভুল নেই।

টগর মিত্র বলল, রেডিওতে সাহিত্য সভায় শেষ গেছি বিশ বছরেরও আগে। হয়তো তখনকারই শোনা-

আপনারই গলার কোনও ঢেউ স্মৃতিকোটরে বন্দী হয়েআছে, এমন তো হয় অন্ধদের, তবে বিশ বছরেরও আগে আমার রেডিও শোনার কোনও সময় ছিল না। তখন যে সব দেখতে পাই। তখন ছাপছাপিতে ব্যস্ত।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস তিনজনেরই ভাল লাগছিল। ফার্স্ট ট্রাম ফিরে আসছে। তার ঘণ্টাধ্বনি। মাদার ডেয়ারির বিশাল ভ্যান মহিষের ভঙ্গিতে গা ঘেঁষে চলে গেল হেলতে দুলতে।

টি ভি-তে অবশ্য গোড়া থেকেই যাই—

ও আর দেখাশোনা হয়নি আমার।

লজ্জা পেয়ে থেমে গেল টগর মিত্র। কয়েক পা হেঁটে বললেন— আমি যে বছর দশেক হল সভা-সমিতিতে যাই এটা বুঝলেন কি করে?

আমাদের অন্ধদের একটা ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় বলে বাকি চারটে ওভারটাইম খাটে ভাই! আপনার গলার স্বর শুনে বুঝলাম আপনার বয়স কত। চেহারা কিরকম তখন আন্দাজ করলাম সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা আসতে আসতে তো কম করেও লেখকের বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে যায়। আমার আন্দাজমতো আপনি এখন যদি পঞ্চান্ন হন তাহলে নিশ্চয় এই বছর দশেক হল সভা-সমিতির নেমন্তন্ন পাচ্ছেন, কি? ঠিক বলেছি!

অসাধারণ বলেছেন। একদম নির্ভুল। আমার চেহারা কেমন বলুন তো?

শুনবেন? আপনার কণ্ঠস্বর অনুনাসিক। মাঝারি লম্বা আপনি। ঈষৎ স্থূল। গাত্রবর্ণ তামাটে।

চমকে উঠল টগর মিত্র। সরল বড়াল হাসতে হাসতেই বলল, বাবা এসব নির্ভুল বলেন।

সরল। আমি কণ্ঠস্বরে বয়সের গন্ধ পাই। মানুষের পায়ের শব্দে সামনেই বিপদ, না সুসময়, তা বুঝতে পারি— ট্রামের ঘণ্টাধ্বনিতে টের পাই। ভোর রাতটা ফর্সা হয়ে গিয়ে এই তিনজনের সামনের ট্রাম লাইনে থেমে থাকল। সরল বড়ালের অন্ধ শ্বশুর শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থের কথাগুলোয় যেন কী ছিল। সেসব কথা শুনে ভোরবেলায় বাতাসে টগর মিত্তির থরথর করে কেঁপে উঠল।

এই অন্ধ বেদান্ততীর্থ হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু আগে পুরনো কথা মনে করবার চেষ্টা করছিলেন। অন্ধ মানুষ পিছিয়ে কিছু

মনে করতে গেলে স্মৃতির দীঘিতে পড়ে গিয়ে খাবি খায়। চোখের গর্তে দলা পাকানো অন্ধমণি ডুব দিতে থাকে। যেন তার হয়ে অন্ধ চোখই খাবি খেতে থাকে। যেন বা চোখের গর্তে পুরনো স্মৃতি ঢুকে গিয়ে চোখ পালটি খেতে থাকে যাকে মানুষ বলে খাবি খাওয়া।

কথাগুলো কী অদ্ভুত। আমি একজন লেখক। আমি টগর মিত্তির। আমি তা কোনও দিন বলতে বা লিখতে পারিনি। কণ্ঠস্বরে বয়সের গন্ধ পাই। বয়স কি কোনও বাঘ? না, হেরে গিয়ে পিছোতে থাকা কোনও পরাস্ত সোলজার? আমি কি বেদান্ততীর্থের গলার আওয়াজের ভেতর তাঁর বয়সের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি? পাইনি। এই শরীটা কতদিনকার তা কেমন নির্ভুলভাবে বলে দিলেন শ্রীকুমার। আমাকে বলা হলে আমি কি বলতে পারতাম শ্রীকুমার তুমি এখন ছিয়াত্তর।

পায়ের শব্দে বিপদ নয়তো সুসময় লুকিয়ে থাকে। আসলে আমরা প্রতিটি মানুষ এক একটি ঘটনা। এক একটি ইতিহাস। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। ইতিহাসে বিপদ থাকে— আবার সুসময়ও থাকে। একজন মানুষের জীবন তো বিপদ আর সুসময়ের সমাহার। কত অল্পকথায় সে-কথা খুলে বললেন বেদান্ততীর্থ।

টগর মিত্তির মনে করার চেষ্টা করল। চোখ বুজে চিন্তা করতে চাইল। ট্রামের ঘণ্টাধ্বনির ভেতরে সেও কি প্রহরের আভাস পায়? ঠিক বুঝতে পারল না। তার সামনে এই জবুথুবু মানুষটি তার নিকষ অন্ধ জগতের বন্দী। সেই অন্ধকার জেলখানায় বসে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় তার মত করে কণ্ঠস্বর, বয়স, গায়ের রং, মানুষের হাইট, বিপদ, সুসময়, প্রহরের হিসেব কষেন একা একা। আর সেই হিসেব তিনি মিলিয়ে ফেলেন। এটাই বোধহয় অন্ধমানুষের পাসটাইম। আসলে হয়তো অন্ধকারের ভেতরেও একরকমের আলো থাকে। যে আলোর সঙ্গে আমাদের চক্ষুস্মানদের কোনও দিনই পরিচয় হয় না।

॥ দুই ॥

আমার জীবন শুরু হয়েছিল বড় নির্জনে। ছোট্ট এক মফস্বল শহরে। জীবনের প্রথম স্মৃতিরই বয়স হবে পঞ্চাশ বছরের ওপর। লাল সুরকির রাস্তা। তার গায়ে সবুজ মাঠ। সে মাঠে অনেকদিন আগের একটি সুরকি কল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাঠটির গায়ের সুরকির রাস্তার পাশেই সব

একতলা, দোতলা গেরস্তবাড়ি। মাঝমাঠে গাঢ় সবুজ একটা বাতাবি গাছ। তার সারা মাথা জুড়ে বড় বড় বাতাবি ফলে আছে। দূর থেকে দেখা যায় কুচকুচে কালো একটি লেজঝোলা পাখি সেগাছের ডালে ডালে কিসের খোঁজে নেচে বেড়াচ্ছে। দিনের বেলায় এই গাছের এই মাঠের এই সুরকির রাস্তার ছবিটিই আমার জীবনের প্রথম স্মৃতি।

এই মাঠের একপাশে বিরাট এক বকুলগাছ। সারা দুপুর তার পায়ে ঝরা বকুল শুকিয়ে হলুদ হয়। বকুল সঙ্গী রাতে হলুদ জ্যোৎস্নায় ঝরা বকুল মিশে গিয়ে হারিয়ে যায়। আমরা যেতাম শেষ রাতে। বকুল ফুল কুড়োতে। তখন ফুলগুলো থাকত তাজা—সাদা। সেসব ফুল কোঁচড় ফুলে সুতোর বদলে একধরনের বুনো লতা দিয়ে মালা গেঁথেছি। কার গলায় সেসব মালা পরাব, জানতাম না, না ছিল ভগবান, না ছিল কোনও প্রেমিকা। মালা গাঁথার আনন্দে মালা গেঁথেছি সেদিন। একটা গোল জিনিস সম্পূর্ণ করার আনন্দে।

পরে দেখলাম— ভূগোল অনুযায়ী পৃথিবীটা গোল হলেও জীবনের বেশিরভাগ ব্যাপারই গোল নয়। সবই এলোমেলো। ছড়িয়ে থাকা। সেসব একত্র করে গাঁথা যায় না। গাঁথতে যাওয়াই বোকামো। পণ্ডশ্রম। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার অজানা আহ্লাদে, জানি না সে কে— আমরা সবাই অনেক কিছু করে চলেছি। জন্মেছি। বড় হচ্ছি। মরে যাচ্ছি। কালো দীঘিতে বিশাল মাছ লেজের ঘাই দিচ্ছে। নারকেলগাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে।

এর কোনও কিছুই জোড়া দিয়ে গাঁথা যায় না। তার সব কিছুর কার্যকারণ থেকে নির্যাস নিলে দেখা যাবে নীতিকথা একটাই। এই জন্মানো— এই মরে যাওয়া— এই জাগতিক সাফল্য, এর আসলে কোনও মানে নেই। আমরা আমাদের মনোমত এক একটা মানে করে চলেছি মাত্র। এই দুনিয়ায় বিশাল আকাশের নিচে আমরা তো এগোচ্ছি না আবার পিছোচ্ছিও না। কেন না, কিসের থেকে এগোব? কিংবা কিসের থেকেই বা পিছোব।

শৈশবকে তাই আন্দাজে ভাবি ভোরবেলা। বেশি বয়সে গিয়ে মনে হয় সত্যিই কি সেটা ভোরবেলা ছিল? বৃহৎ এই জীবন কী বা ভোর! কী-ইবা রাত! সবই অন্ধকার। আবার সবই আলো।

আজ কয়েকদিন ধরে টগর মিত্র জীবনের খুব ভোরবেলায় পৌঁছনোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। জীবন জিনিসটা যেন কাকভোরে সবে জেগে উঠেছে।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। কাঁচা আলো সবে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ডিম ফেটে বেরনো কচি ছানা একেবারে।

ঠিক এই ভাবটা সে আনতে চায় একটি লেখায়। যেন খুব নির্জন বনে ব্রাহ্মমুহূর্তে ময়ূর দূর পাহাড়ের গায়ে মেঘ জমতে দেখে নাচতে শুরু করল। গাছপালার আড়ালে ঝরনার কলধ্বনি সেই নাচের সঙ্গী হতে চাইছে। পারছে না। পেখমের বিস্তার-তড়িৎ চরণে ময়ূরের মেঘবন্দনা যখন চরমে— তখনই সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া ময়ূরের তপ্ত বুকে শিকারী আদিবাসীর তীর এসে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে লাগল।

এমনি ময়ূরের মরণ চিৎকারে পৃথিবীর আদি শব্দের আলজিভ বেরিয়ে পড়ল। সে শব্দ সারা বনভূমিকে ফালি কাগজ করে ছিঁড়ে ফেলল মাঝখান থেকে।

এই ভাবটা— ঠিক এই ভাবটা আনতে চাইছে টগর মিত্র। আজকাল সে খুব গোপনে টের পায়, গন্ধ দিয়ে শব্দ চেনা যায়। শব্দ দিয়ে আলো। মাথার ভেতর অনেকদিন আগে বন্দী করা কোনও কথা, হাসি, কোনও একটা ঘুরে তাকানো অনেক বছরের তফাতে মাথা তুলে উঁকি দেয়। এখন তার মনে হয় যে কোনও সিডিউল ব্যাঙ্কের মতই মেমারি ব্যাঙ্কও কখনই ফেল পড়ে না। সুদ সমেত ফেরত আসে। এই সুদই বোধহয় ভেলভেট-মায়া বা স্মৃতি।

কড়া নাড়তেই উঠতে হল। এসে গেছেন?

তা মাসে একবার তো আসবই। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর জয়েন্ট সই চাই।

টগর মিত্র পাশের ঘরে গিয়ে বউকে ডাকল। এস। সই দিয়ে যাও।

মাধবী বলল, কেন মাসে মাসে টাকাগুলো ডাকঘরে দিচ্ছ? কি হবে জমিয়ে?

ছ'বছর পরে ডবল হবে। অসময়ে কাজে আসবে। এস, সইটা দিয়ে যাও।

পাড়ারই সিধু রায় ডাকঘরে কাজ করে। সে বলেছে একসঙ্গে দুজনের সই থাকলে একজনের অবর্তমানে আরেকজন টাকা তুলতে পারবে। সাকসেসন নিয়ে কোনও ঝামেলা পোহাতে হবে না।

এই অবর্তমান কথাটা মাধবী চা করতে করতে ডালে ফোড়ন দিতে দিতে অনেকবার ভেবেছে। অবর্তমান— বুঝিবা অন্য কোনও অজানা একটা দেশের নাম। যেখানে কোনও একদিন যেতেই হবে।

সিধু রায় বলল, আপনিও সই করুন।

টগর মিত্র সই করল অনিমেষ মিত্র। সই হয়ে গেলে সিধু বলল, আপনার ম্যাট্রিকুলেশনের এই নাম কেউ কিন্তু জানে না। সবাই জানে টগর মিত্র।

টগর মিত্র নামে লিখি বলে ঐ নামটা জানে সবাই।

আমাদের ডাকঘরে কাউকেই বিশ্বাসই করাতে পারিনি। অনিমেষ মিত্তিরই টগর মিত্তির। আমি যত বলি অনিমেষ মিত্তিরেই টগর মিত্তির। সবাই বলে ক্রেডিট নেবার জন্য কেন বানিয়ে বলছেন সিধুদা!

সিধু রায় দিনে ডাকঘর করে। রাতে যাত্রার রিহার্সাল দেয়। যাত্রার পালাও লেখে। একবার মিত্তিরকে বলেছিল, দিন না আমাকে একজন পাবলিশার ধরিয়ে। ঘরে আমার বারোখানা পালার পাণ্ডুলিপি মজুদ। পট করে চোখ বুজলে আমার এ সৃষ্টির কি হবে?

সিধু রায়ের বাড়ি গেছে টগর মিত্তির। এই গেরস্ত পাড়ার কানাতে কয়েক ঘর মাটির ঘরের গেরস্ত আছে। তারা ডাকঘর, সিনেমাহল, মাতৃসঙ্ঘ পাঠাগার নানান জায়গায় কাজ করে। তাদের ঘরবাড়ির শেষে বিশাল এক দিঘি। সেখানেই সবাই বাসন মাজে। এই পুকুরপাড়েই বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয়। মাটির ঘরে বেশি রাত অব্দি আলো জেলে সিধু রায় যাত্রার পালা লেখে। কারেন্ট চলে গেলে হ্যারিকেন জ্বেলে নেয়।

একদিন গিয়েছিল টগর মিত্তির। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে টগর দেখেছিল সিধু রায় পুরো সংলাপ জোরে জোরে আউড়ে তবে লিখছে।

অনেকটা এইরকম—

'পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ভাগ্যকে গড়িয়ে নিয়ে গেছি খাদের শেষ সীমানায়। তবু ডরাইনি। কষেছি পাঞ্জা ভাগ্যের সঙ্গে। চুরমার হয়েছি। সামনে কোনও আশা নেই। আলো নেই। তবু এগিয়ে গেছি। কিন্তু— কিন্তু আজ আমার এ কি হল? আমি কেন পুরনো দিনের কথা বার বার মনে করছি? তবে কি আমার সামনে নিশ্চিত পরাজয় দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে আছে?

কালো পাকানো চেহারা সিধু রায়ের। তার ভেতরে যে এতখানি চেঁচাবার শক্তি ছিল জানতাম না। অন্ধকারে লেজ গুটিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরটি পর্যন্ত চোখ দিয়ে একবার সিধু রায়কে দেখল। তারপর মানে মানে করে অন্যত্র ঘুমোতে উঠে গেল। এত চিৎকারে চোখ বোজা যায়?

টগর মিত্তির বোঝে— নগণ্য হয়ে থাকার যন্ত্রণায় সিধু রায় পালা লিখে চলেছে। সে পালাকার হিসেবে একচ্ছত্র হতে চায়। নিজের লেখা পালার নায়ক হিসেবেও সে একচ্ছত্র হওয়ার স্বপ্ন দেখে। যশোলিপ্সা যে কতবড় অসুখ— তা ওপর দেখে বোঝা যায় না।

এই মানব সংসারে কে আর নগণ্য হয়ে থাকতে চায়। সবাই আমরা জ্যোতিষ্ক হবার স্বপ্ন দেখি। সেজন্য রক্তের চাপ বাড়ে। ওভারটাইম দৌড়ে নিজের অসাধ্য টারগেটে পৌঁছতে চাই।

টগর মিত্তির নিজেকে বলে থাকে— আমি সত্যিই কী হতে চেয়েছিলাম ? টগর মিত্তির ? লেখক টগর মিত্তির ? ভদ্দরলোক ? গেরস্ত ? একজন বউয়ের স্বামী ? অনেক বইয়ের গ্রন্থকার ? আসলে বোধ হয় আমি আমার বইগুলোর স্বামী হয়ে বসে গেছি। কিংবা হয়েছি আমার বউয়ের গ্রন্থকার।

মাধবী বলে— আমাদের জমিয়ে কি হবে ! জমালে গুছিয়ে তুলতে পারলে কি হয় হাতের কাছে তার উদাহরণ সরল বড়াল। বয়স প্রায় চল্লিশ। একটি বউ। দুটি সন্তান। একতলাটা দুভাগ করে দুটি আলাদা ফ্ল্যাটে দুঘর সাউথ ইন্ডিয়ান বসিয়েছে। আর আমি ? এই ৫৫/৫৬ বছর বয়সে কলকাতায় এক বাড়িওয়ালার হাত থেকে আরেক বাড়িওয়ালার হাতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

কী বুদ্ধিমান সরল। ইচ্ছে করলেই গাড়ি কিনতে পারত। কিন্তু কেনেনি। তার চেয়ে মোটর সাইকেল বেছে নিয়েছে। নিজে চালায়। গাড়ি হলে বাড়ির জন্যে ড্রাইভার পুষতে হতো। নিজেই ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ারে বসিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেয়। দরকারে নিজের বউকেও ক্যারিয়ারে বসিয়ে দেয়। চার চাকার গাড়ির চেয়ে তেল খরচা অনেক কম। চলা ফেরার স্পিডও অনেক বেশি। সময়ের কাজ সময়েও করতে পারে সরল। রাস্তার জ্যাম মোটরসাইকেল সহজেই পাশ কাটিয়ে এড়িয়েও যেতে পারে। সকলের পরামর্শেই এ পাড়ায় এসে টগর মিত্তিরের ডকঘর করা।

আপনি তো পয়সা রাখতে পারবেন না টগরদা।

পয়সা কোথায়, যে রাখব !

মনে রাখবেন আপনি, আমি একটা টাকা ব্যবহার করি যেন ওটা একটা পয়সা-- টাকাই নয়। আরে টাটা বিড়লা কি করে জানেন ?

না ভাই। তাদের তো চিনিই না। জানব কি করে ?

আমিও টাটা বিড়লাকে দেখিনি। ওঁরা একটা টাকাকে এমনভাবে

ব্যবহার করবে— যেন ওটা টাকাই নয়, একশ টাকার নোট। মনে রাখবেন টাকায় টাকা আনে।

তাই বুঝি!

হুঁ। আপনি তো ট্যাক্স দেন—

তা দিই। থার্টিফাস্ট মার্চের ভেতর কয়েক বছরের অ্যাভারেজ ইনকামের ওপর হিসেব কষে অ্যাডভান্স দিয়ে দিতে হয়।

তার খানিকটা দিয়ে ডাকঘর করুন। ট্যাক্স কমবে। টাকাটাও থাকবে। আখেরে ডবল হবে।

হাসি এসে গিয়েছিল টগর মিত্তিরের মুখে। পিসিমা, দিদিমারা তীর্থ থেকে ফিরে বলেন, হরিদ্বার করলুম— কেদার বদ্রীও করা হল। সরলও যেন সেই একইভাবে বলে— ডাকঘর করুন। লক্ষ্মী ঠাকরুণের বড় তীর্থই তো ডাকঘর। আগে তান্ত্রিকরা হোমযজ্ঞ করে নোট ডবলের ভোজবাজি দেখাত সরল বিশ্বাসী গেরস্ত বাড়িতে। তান্ত্রিক চলে গেলে ধরা পড়ত— থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিলের ওপরের নোটখানাই আসল নোট, বাকি যা— তা হল নোটের সাইজে সাজানো কাটা কাগজ। আর এখন সেই নোট ডবলে নামিয়েছে সরকার। ছ বছরের মেয়াদে ডাকঘরে টাকা রাখুন। টাকা ডবল হয়ে যাবে। এতদিনকার জালি কাজ সরকারের হাতে পড়ে জলচল হয়ে গেল।

সরল সেখানেই থামেনি। টগরদা ফি মাসে একই অঙ্কের একটা থোক টাকা, ধরুন পাঁচশ টাকা করে ডাকঘরে ফেলে দিন।

পোস্ট অফিসের বারান্দায় ফেলে আসব! না মেঝেতে?

ঠাট্টা না করে শুনুন। ফেলে আসা মানে সেভিং সার্টিফিকেট কিনবেন। কেনার পর ওদিকে আর তাকাবেন না। মানে বলতে চেয়েছি, জমা যে রাখলেন তা ভুলে যাবেন। এভাবে যদি বারো বছর বা একশো চুয়াল্লিশ মাস রাখেন তো তের বছরের শুরু থেকে সারা জীবন মাসে দেড় হাজার টাকা করে পাবেন।

সত্যি?

হ্যাঁ। যা রাখবেন তার তিনগুণ পেতে থাকবেন তের বছরের শুরু থেকেই।

যতদিন বাঁচব?

হ্যাঁ। আপনার অবর্তমানে আপনার বংশধররা পেয়ে যেতে থাকবে।

অবর্তমানে কথাটা ঘচাং করে গিয়ে টগর মিত্তিরের মাথার হাড়

চামড়ার চর্বি, মাংস ফাটয়ে ভেতরে চলে যায়, একেবারে গদাম করে। টগর মিত্তির অবর্তমানে কথাটাকে মনে মনে লুফতে লুফতে এমন একজায়গায় চলে যায়— যার চেহারাটা একদম খাঁ খাঁ রোদে জ্বলে যাওয়া বালিয়াড়ি।

সই করিয়ে টাকা জমা দেওয়ার ফর্ম নিয়ে চলে গেছে সিধু রায়।

একশ টাকায় দু টাকা কমিশন পায়। ডাকঘরে কাজ করে বলে নিজে এজেন্সি করতে পারে না। এজেন্টের হয়ে কাজ করে বলে কমিশনের অর্ধেক পায়। তার মানে ওই দু'টাকার একটাকা সিধুর।

টেবিলে পাণ্ডুলিপির খোলা পাতা। জীবনের ভোরবেলার ভাবটা আনতে গিয়ে লেখা আর এগোয়নি। ভোরের নিঃশব্দ বনভূমি ময়ূরের ঠোঁট এলিয়ে দেওয়া চিৎকারে চিরে গেল। এই ছবিটা ভাবতে গিয়ে তার চোখের সামনে যখন বিশাল একখানা ভোর দুলে উঠেছে— ঠিক তখন মাধবী জানতে চাইল, কার জন্য জমাচ্ছ?

তোমারও লাগবে টাকা আমারও লাগবে মাধবী।

আমরা দুই প্রাণী তো মোটে।

সে দোষ আমার নয় মাধবী।

এ বয়সে এসে কাউকে আলাদা করে দুষে লাভ নেই। ভাল কথা। এখানে এসেও আসল নাম নিয়ে না বাড়িওয়ালার সঙ্গে কোনও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়।

সে-চান্স নেই। আর আমি তো নাম ভাঁড়িয়ে কোনও জালিয়াতি করছি না। গল্প উপন্যাস লিখছি। অনেক লেখক ছদ্মনামে বেশ পরিচিত। আমাকেও সবাই টগর মিত্তির বলেই জানে।

ওবারের মতো শেষে যদি ইজেকট্‌মেন্ট স্যুট ওঠে তখন তো আসল নাম বলতে হবে কোর্টে।

তাহলে কোর্ট সেবার মানল না কেন?

জানানো যেত। আরেকটু কাঠখড় পোড়াতে হত। তা দরকারে এবার কোর্টে গিয়ে টগর মিত্তিরও বলব।

সেইখানে দেখবে— দরকারে অনিমেষ মিত্তির নামটাই আগে বলতে হবে। ওই নামেই তোমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট। আচ্ছা বলতো অনিমেষকে কেন টগর করতে গেলে?

খেয়াল মাধবী, স্রেফ খেয়াল। টগর নামটা স্মার্ট লাগল—তাই বসিয়ে নিলাম অনিমেষের জায়গায়।

আমাদের বিয়ের কাগজে তো অনিমেষই রেখেছ। ইসিওরেন্সও তো তাই রেখেছ। ওসব জায়গায় টগরের মতো স্মার্ট নামটা তো দাওনি—

কিছু ভেবে করিনি মাধবী।

নাম পাল্টাবার ইচ্ছে বা হল কেন? কোথাও কিছু করেছিলে?

যাঃ! তুমি আমায় কী মনে কর বলতো? কয়েকটা গল্প ছাপা হতে দেখা গেল— অনিমেষ মিত্তির নামে কে একজন পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় গল্প পাঠিয়ে পাঠিয়ে কিছুটা নাম করে বসে আছে। পাছে ডবল হয়। তাই টগর নামটা নিয়ে নিলাম।

ওঃ! আমি যে চালকুমড়ো বসিয়ে এসেছি। পুড়ে গেল সব।

মাধবীর ছুটে যাওয়া দেখতে দেখতে পোড়া চালকুমড়োর গন্ধ পেল টগর। সেই পোড়া গন্ধে নারকেল পুড়ে ওঠার গন্ধও মিশে যাচ্ছিল। মাধবী চালকুমড়োর ছেঁচকি বসিয়েছিল তাহলে। কোরানো ভিজে নারকেলের ঢেউ তোলা সাদা গা পুড়ে যাচ্ছে।

সেই গন্ধের ভেতর টগর মিত্তির এই মাত্র তার নিজের জীবনের ভোরবেলাকে দুলে উঠতে দেখল। মাধবী পয়লা রাতে কাৎ হয়ে শোয়। শেষরাতটা কাটায় উপুড় হয়ে। না ডাকলে বিধি ভারতীতে সকাল সাড়ে সাতটার সময় যখন সঙ্গীত সারিকা হবে উদাহরণ সহকারে— তখন সে টক করে উঠে পড়বে। ঠিকঠাক ভিজিয়ে চা করবে। নিজে খাবে। টগরকে দেবে।

ততক্ষণে টগরের প্রায় তিনঘণ্টা লেখা হয়ে যাবে। কোনও কোনও দিন তিন পাতা। ভাল এগোলে পাঁচ পাতাও হয়ে যাবে। এই লেখার আগে টগর মিত্তির আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হেঁটে নেয়। না হাঁটলে ঘাড়ের পিছনটায় ভার লাগে। তখন আর লেখা এগোয় না।

আচ্ছা সাউথ ক্যালকাটায় আমি মাধবীর স্বামী টাগর মিত্তির বাড়ি ভাড়া নিয়ে সংসার করছি। বাজার-হাট। চিঠি ডাকে দেওয়া। ফোন ধরা। পাড়ায় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন। সবই। এই আমিই যদি ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে লেখা অনিমেষ মিত্র হয়ে নর্থে সুকিয়া স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সংসার করি? ভোর থেকে বেলা তিনটে অব্দি আমি সুকিয়া স্ট্রিটে অনিমেষ আর এখানে তিনটের পর থেকে টগর মিত্তির। কেমন হয়?

সুকিয়া স্ট্রিটে অনিমেষের বউয়ের নাম লাবণ্য। সেখানে সে ধুতি পরে। পায়ে কেডস। হাতে ছাতা। গালে দাড়ি। সেজন্য চিৎপুরের নতুন বাজারের যাত্রাপাড়ার মেকআপ ম্যানদের দিয়ে বানানো এক সেট চাপদাড়ি

বানানো থাকবে। দরকার মতো কানের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মাথায় পরচুলা দিয়ে কানদুটো ঢেকে নেওয়া যাবে।

এখানে টগর মিত্তির লেখক। সুকিয়ায় অনিমেষ ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বেলিফ। বড় বড় মামলায় সমন ধরিয়ে দেওয়াই তার কাজ। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পার্টিকে বের কর—তারপর তার হাতে জজ সাহেবের সমন ধরিয়ে দাও।

তাকে দেখেই পার্টির বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে। সমন এড়াবার জন্যে পার্টি পালিয়ে বেড়াবে। অনিমেষ মিত্তির ছাড়বে না। প্রবীণ বেলিফ হিসেবে সে চোখের চশমা নাকের উপর চেপে বলবে, আপনিই টগর মিত্তির ?

হ্যাঁ।

আপনি অনিমেষ মিত্র হয়েও কেন এতবছর টগর মিত্তির হয়ে আছেন ?

ওই নামই আমি লেখক হিসেবে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত।

তা বললে তো চলবে না। আদালতে হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে সব বলতে হবে।

যদি না হাজির হই।

ডেট পড়েছে। আপনার। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে ডুব দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ফের ডেট পড়বে।

তখন কি করব ?

ফের মেডিকেল দেবেন।

এসব কথা টগর মিত্তিরের মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

তবে এই হাঁটার সময়টা অন্ধকার ফুঁড়ে কলকাতা ফুটে উঠতে থাকে। তখন সে জোর পায়ে হেঁটে লাইন অব্দি যায়। ট্রামডিপোর উল্টোদিক পাতাল রেলের নতুন ডিপো। জয়পুরী পাথরের রাজপুরী। নীলে সাদায় গোলা পাথরের রং। একটাও লোক নেই। বাইরে স্থলপদ্মের কায়দায় থরে থরে আলোর পাপড়ি। এক এক স্ট্যান্ডে আট দশটা করে আলোর বরফি। দুধ সাদা ঝকঝকে আলো। স্ট্যান্ডগুলো সবুজ ঘাসের লনে দাঁড় করানো। সামনের জাহাজের অঙ্ক শেকল ঝোলান। তার পাশ দিয়ে রাস্তা। রাস্তার গায়ে ঝকঝকে তকতকে চাতাল। আগাগোড়াই যেন সারারাত ধরে উৎসব চলার পর কোনও ঘুমন্ত বাড়ি। আলো নেভাতে ভুলে গেছে। কড়ি খেলার পর কুশণ্ডিকা শেষে সবাই এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এই হল গিয়ে কলকাতার বুকে টগর মিত্তিরের নতুন কোহিনুর।

পাতাল থেকে সিমেন্টের বাক্স টানেল সোজা ডাঙায় উঠে এলে সেখান থেকে বনের টিয়ার মতই সবুজ রংয়ের মেট্রো ফস করে বেরিয়ে পড়ে ডাঙার এই ডিপোয় এসে দাঁড়ায়। আবার এখান থেকেই উজানের টিয়া ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে পাতালের ফিরতি টানেলে ঢোকে।

বেড়াল কিংবা গরু কিংবা রাস্তার কুকুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই এলাকায় ঢোকার কোনো উপায় নেই। টিকিট কাট— তবে চুঙ্গি দিয়ে ঢোক। নয়ত নয়। এখন ভাটির ট্রেন এসে এখানে থামলে জায়গাটা গঞ্জ গঞ্জ লাগবে। সাইকেল রিকশা, স্কুটার, রিকশা প্যাসেঞ্জার ডাকে- বোড়াল রাজপুর, গড়িয়া, কুঁদঘাট, পুটিয়ারী।

আবার কেউবা চেঁচায় সিরিটি, ক্যাওড়াপুকুর, করুণাময়ী, হরিদেবপুর, নেপালগঞ্জ।

ফিল্ম স্টুডিওর এক খাবলা জমি নিয়ে নতুন রাস্তা টানা হচ্ছে নেপালগঞ্জের দিকে।

সেই রাস্তার গায়ে মেট্রো রেলের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের গায়েই কারশেড।

চওড়া দরজার ফাঁক দিয়ে এ জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে টগর মিত্তির। ভাটির ট্রেন এখানে এসে লাইন পালটে উজান প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানে রাতের বেলায় কোচগুলো আশ্রয় নেয় শেডের নিচে।

জোড়া জোড়া লাইনের পাশে লাল রং দিয়ে রাঙান আরেকটা লাইন। এই সে বিখ্যাত লাইন যার ভেতর ৭৫০ ভোল্ট ইলেকট্রিক দিয়ে পাতাল ট্রেন চালান হয়। সাক্ষাৎ মৃত্যু। কাছে যেও না। গায়ে লাগলে ছাই হয়ে যাবে।

টগর মিত্তির দেওয়ালের গায়ে বড় একটা রেনট্রি আছে। পাখিদের কিচির মিচির করতে দেখে নিজেই সিঁটিয়ে যান। অ্যাই, সাবধান। ঝগড়া করে জটাপটি পাকিয়ে রঙিন লাইনটায় গড়ালেই কিন্তু ছাই হয়ে যাবি নির্ঘাৎ। খুব সাবধান—

রঙের দোকানে যে রংটাকে অক্সব্লাড বলে সেই রং দিয়ে বিদ্যুৎ গর্ভ রেলের পাটিটি বলা ভাল মৃত্যুর অব্যর্থ সরলরেখাটি আগাগোড়া রাঙানো। ভোরের আলো পড়ে মনে হয় বুঝিবা এখুনি ওদের গা থেকে ষাঁড়ের রক্তের গাঢ় রং চুঁইয়ে পড়বে। ওর পাশে পাতালে যাবার রেলের পাটির জোড়াকে কিছু নিষ্প্রভ লাগে টগর মিত্তিরের। এই রেলপাটি, রং,

স্লিপার, পাথরের পাশে পৃথিবীর আসল ও প্রাচীন খাড়া যেটুকু তার চেহারা ন্যাড়া ন্যাড়া হলুদ পোড়া পোড়া।

মৃত্যুর ভেতরে এত শক্তি?

অবাক হয়ে টগর মিত্তির। বাস ট্রামের ভিড় থেকে বাঁচিয়ে প্যাসেঞ্জারদের কত আরামে জায়গামতো পৌঁছে দেওয়া যায় সেজন্যে মৃত্যুকে রঙিন ঢাকনা দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বন্দীমৃত্যু তার সবটুকু প্রাণ দিয়ে আট কামরার পাতাল ট্রেন ঠেলে নিয়ে চলে।

ইদানীং টগর মিত্তির প্রায়ই ধাঁধায় পড়ে। যাকে আমরা জল বলে জানি তা কি আসলে তৃষ্ণা নয়? এই যেমন গাঢ় লাল রঙে রাঙান সাড়ে সাতশো ভোল্টের বিদ্যুতের লাইন যার সম্পর্কে ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছে ছুঁয়ো না সাক্ষাৎ মৃত্যু সে-ই তো এত মানুষকে আরামে পৌঁছে দিচ্ছে। নিয়ে আসছে।

একটা লম্বা পেনসিলের ঠিক কোন জায়গায় ক্ষয় শেষ হল জানা যায় না। তেমনি জানা যায় না পেন্সিলটার ঠিক কোন জায়গা থেকে ক্ষয়ের শুরু।

তৃষা যদি জল হয় তো বন্দী মৃত্যুই বা কেন জীবন হবে না? ওরকম একটা যুক্তিজাল নিজের মগজের ভেতরে টগর মিত্তির টের পেলেও তা ঠিক মতো সাজাতে পারছিল না। না পেরে তার ভেতরে একটা অস্বস্তি দেখা দিল। তার শরীরের ভিতরকার রসায়নে সেই দৈবী অস্বস্তি মিলে গিয়ে সারা মনে দ্বিগুণ হয়ে চারিয়ে গেল। টগর মিত্তির ভাল করে তার বউয়ের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে তিনি বুঝলেন তিনি কী বিরাট চুক্তির অংশীদার। মাধবী নামে মেয়েটি এক জায়গায় জন্মেছিল। সেখানে তাকে সাবধানে বড় করা হয়। তারপর একদিন সানাই বাজিয়ে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মাধবী এখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, ওর বাবা মায়ের কাছ থেকে কতদিন হল চলে এসেছে। এখন সে বাবাও নেই, মাও নেই। অথচ মাধবী নিশ্চিন্ত। আমি এখুনি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি। এক আজব কায়দায় শরীরে ভরে দেওয়া প্রাণটুকু গলা টিপে বের করে দিলে মাধবী মরে যাবে— কিন্তু প্রাণ মুক্তি পাবে। ঠিক যেভাবে ঘেরাটোপ পরানো রঙিন কাঠের ঢাকনার নিচে বন্দী থাকা সাতশো পঞ্চাশ ভোল্ট ছাড়া পেয়েই দিব্যি আট আটটা কামরাকে নিয়ে পাতালে দৌড়াদৌড়ি করে।

মাধবী ওঠ। হাঁটবে—

উঁহু। তুমি হেঁটে এসো।

ওঠ না। অনেক স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে হাঁটে। চল আমরাও হাঁটব।

বিরক্ত কর না। তুমি যাও। আমার হেঁটে কী হবে?

শরীর ভাল হবে মাধবী। চলো আর দেরি করলে আলো ফুটে যাবে—

শরীর ভাল হয়ে কি হবে?

ভাল লাগবে। বাঁচতে আরও ভাল লাগবে। লাইফটা আরও এনজয় করতে পারবে।

এনজয় করে কি হবে?

ধ্যাৎ। আমি চললাম।

আজ ক'দিনই টগর মিত্তিরের লেখার টেবিলে সেই লেখাটা থমকে আছে— যেখানে টগর জীবনের ভোরবেলার ভাবটা আনতে চেষ্টা করছে। একবার খুব ছোটবেলায় সে দেখেছিল জ্যৈষ্ঠি মাসের দুপুরে একটা বউকুটুম পাখি পাড়ায় আম বাগানে লিচুতলার মাঠে শিব বাড়ির বারান্দায় অবিরাম ডেকে চলেছে। কিছুতেই থামে না। টগর মিত্তির তাকে ফাঁদ পেতে ধরে জল খাওয়াল। সন্ধে পার করে দিয়েও সে ডাকতে লাগল। সে কি আকুল ডাক। তার ডাকেই যেন সেদিন ফুটফুটে শাদা জ্যোৎস্না উঠল। তখনও সে ডেকেই চলেছে। একটু বেশি রাতে ডাকটা একটু কমল। তারপর একদম কমে এল। ভোরবেলা আমবাগানের মাঠে বউকুটুমটাকে পাওয়া গেল। ঘাড় গুঁজে মরে পড়ে আছে ভিজে ঘাসে।

দিদিমা বলেছিল আহারে! বড় অল্প বয়সের পাখি। বেহ্মজ্ঞান বড় তাড়াতাড়ি এসেছিল। চলে যেতে হবে বলেই এত ডাকাডাকি!

কি জানতে পেরে এমন গান গায় পাখি? জীবনের ভোরবেলায় জীবনটা জেনে বসে কেউ যদি এভাবে গায়?

ওই যে শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থ। মীমাংসা, তর্ক, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি তুচ্ছ করে ওই অন্ধ ভাবুক মুখখানিতে জরা এসে হানা দিয়েছে। তারই পাশে পরম কর্মঠ সরল বড়াল শ্বশুরের প্রাতঃভ্রমণের লাঠিটি ধরে সমান তালে থপ্ থপ্ করে এগোচ্ছে।

কি টগরদা? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে গল্পের প্লট ভাঁজছেন?

টগর মিত্তির এগিয়ে এল। ভোরবেলায় হাঁটতে বেরিয়ে সবাই শরীরটাকে রাতভোর বিছানায় রাখার পর সযুত সচল করে নেওয়ার চেষ্টা

করে। করতে করতে টের পায় মেশিনের কোথায় তেল খাবে। কোথায় একটা পার্টস বদলে নিলেও আর আগের মতো হাওয়া যাবে না। একেক সময় মনে হবেই— এটা ভোরবেলার হাঁটাচলা। না, স্টক টেকিং?

টগর মিত্তির কাছাকাছি আসতেই সরল বড়াল চোখের ইঙ্গিতে আর হাতের আঙুলের কাইচি প্যাঁচ দেখিয়ে তাকে জানিয়ে দিল— সে এখন একটু সিগারেট খেতে চায়। সরল মুখে বলল, আপনি একটু দাঁড়ান আমি আসছি বলে সদ্য খোলা সিগারেটের দোকানটার দিকে দৌড়ে গেল।

শ্রীকুমার বললেন, আমায় ধরতে হবে না। শুধু দেখবেন— পা যেন কোনও গর্তে না পড়ে আমার। বা ইট কি পাথরে। তাহলে কিন্তু খপ করে ধরবেন—

ভয় নেই। আমি আছি পাশে। চলুন না, ট্রাম কোম্পানির মাঠটায় ঢুকি। বেশ পরিস্কার।

শ্রীকুমার বললেন, এসব জায়গা তো আমার চেনা। বলে রোবটের কায়দায় একজায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরে নিলেন। তারপর মাঠমুখো হয়ে হাঁটতে লাগলেন।

এই তো বেশ হাঁটছেন, যেই না টগর বলছে, অমনি ঘাসে ঢাকা ফাঁসে পা পড়ে শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থ কাৎ হয়ে গেলেন।

টগর মিত্তির বেদান্ততীর্থের দুখানা হাত ধরে সিধে দাঁড় করিয়ে দিল। আরেকটু হলেই হয়েছিল আর কি! হাঁফাতে হাঁফাতে সিধে হলেন বেদান্ততীর্থ। তাঁর নিঃশ্বাসগুলো বড় বড় আর টানা টানা। বোঝাই যায় সারাটা ফুসফুস নিংড়ে বাতাস সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

তখনো টগর দুহাতে তার অশক্ত হাত দুখানা ধরে। একটু সামনে নিয়ে শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থ প্রথমেই যা করলেন তা হল— এক ঝটকায় নিজের দুর্বল হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন। ডান হাতখানা পারলেন। বাঁ হাতখানা তাঁর ছাড়ানো হল না। টগর মিত্তিরের মুঠোর গ্রিপ অনেক বেশি জোরালো।

সেই শক্ত মুঠোর ওপর শ্রীকুমার নিজের ডান হাতের থাবা চেপে ধরতে চেষ্টা করলেন। বল, সত্যি করে বল, তুমি কে?

দাঁতে দাঁত চেপে হাসল টগর। আপনি তো আমায় চেনেন।

হ্যাঁ, এইমাত্র চিনতে পেরেছি। তাহলে টগর মিত্তির তুমিই সেই অনিমেষ।

হ্যাঁ শ্রীকুমারবাবু। আমিও এইমাত্র চিনতে পেরেছি। একটু আগে।

যখন পড়ে যাচ্ছিলেন। আপনাকে তো নাম বদলাতে হয়নি।

॥ তিন ॥

খুব অল্প বয়সে পল্লীমঙ্গল কথাটা শুনেছে টগর। পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়। পল্লীমঙ্গল সমবায় সমিতি ইত্যাদি। কিন্তু গোঁফের রেখা উঠতে না উঠতেই এসেছিল হাতে।

নারীমঙ্গল। লেখক, আবুল হাসানৎ। নামের নিচে লেখা যৌন বিজ্ঞানী। নারী নিয়ে বিজ্ঞান, বিশেষত সেই বয়েসে খুব আকর্ষণের। কয়েকপাতা পড়ে টগরেব মনে হয়েছিল— একখানা সাইকেলের স্পোক, মার্ডগার্ড, চেন, হ্যান্ডেলের কথাও এর চেয়ে ভালভাবে পড়া যায়। হতকুচ্ছিত সব বর্ণনা। সিচুয়েশনগুলোও তাই।

এর কিছু দিনের ভেতরেই টগর মিত্তিরের হাতে এসে পড়ল সুখের সাগর। তখন সে কুড়ি ছোঁয় ছোঁয়। ষোল পৃষ্ঠার বই। মলাটে বই লেখকের নাম নেই। ময়লা পাতার ওপরে ছোট করে ওসব দেওয়া। একদম শেষের পাতায় এরকম আরও বইয়ের নাম। বইগুলোর নামের ওপর বড় করে লেখা—পড়ুন ও পড়ান।

বইগুলোর নাম ছিল প্রায় একরকম। কেননা, এতদিন পরে মনে করে করে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছিল নামগুলো।

জমিদারের লালসা।

সুখের সায়র।

আমার আত্মকথা।

অন্ধকার ঘরে।

আর মনে করতে পারল না টগর মিত্তির। সব বই-ই ষোল পৃষ্ঠার। এক স্ট্রিকের বাঁধাই। বাইরে থেকে স্টেপলার দিয়ে, মলাট কচি কলাপাতা রঙের। ফিনফিনে কাগজ। বটতলায় যেমন হয় আর কি।

মলাট ওল্টালেই যবনিকা উঠলে পাঠান বা সুলতানী হারেমও হার মেনে যাবে। ইদানীংকার মিস্টার জার্মানি দাস তো তার পাশে শিশু।

যদি প্রাইভেট টিউটর নিরীহ নিষ্পাপ হয় তো ছাত্রের অল্পবয়সী মা অকারণে হাসে। তার স্বামী বাড়ি আসে না। সে মাকড়সার মত জাল বিছিয়ে প্রাইভেট টিউটরকে বন্দী করে।

আবার সরল নিষ্পাপ শালীর উল্টোদিকে দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় জামাইবাবু।

কিংবা জমিদারবাবু। নয়তো কুলগুরু।

সুখের সায়র পড়া হয়েছিল দলবেঁধে। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। কলেজ হোস্টেল। কলেজেরই হাফব্যাক জোরে জোরে পড়ছিল। শুনছিল গোলকিপার, লেফট আউট আর রাইট ইন। তখন ওই নিয়মেই ফুটবল চলত, তা, সেই বন্ধ ঘরে ঢোকার চান্স হয়েছিল টগর মিত্তিরের। ভুল হল। অনিমেষ মিত্তিরের। তখন তো সে অনিমেষ। তখন কোথায় টগর!

ঠিক এই সময়।

জীবনের ভোরবেলায় বলা যায়।

অনিমেষ মিত্তির এক জোড়ে এসে দাঁড়াল। সে যেন তখন ঠাকুরমার ঝুলির রাজপুত্তুর। দক্ষিণ দিকে গেলে হলুদ পাহাড়ের পাতাল থেকে উঠে আসা ঝরনার মুখোমুখি হবে। উত্তর দিকে গেলে দিগন্তের শেষে মেঘের ঠিক নিচে এখনই এক বকুলগাছ পড়বে যার সব কটি ফুলই শাপভ্রষ্ট তারা। ঝরে পড়লেই আকাশে ফিরে যাবে। অভিশাপের মেয়াদ শেষ হবে।

এই সময় মানুষ তার নিজের শরীরকে চিনে উঠতে পারে না। রোজ রোজ পাল্টায়। অন্যের তারিফ, বিস্ময় মুগ্ধ নয়নে নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় তখন অনিমেষেরও তাই হল।

সে চলে যাচ্ছিল কলেজ টিমের হাফব্যাক, গোলকিপার, রাইট ইনের সঙ্গে। সেদিকে গিয়ে সে সাইকেলে চেপে নবীনবরণের নামে সদ্য কলেজে আসা মেয়েদের ফলো করছিল। শিস দিচ্ছিল। মাথার চুল কেয়ারি করে ঘন ঘন চোখ বুজছিল, চোখ খুলছিল। বিশেষ কারও দিকে তাকিয়ে। টগর কলেজের বড় প্রেমিকের লেটার রাইটার হয়ে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়েই সে একজনের মুগ্ধ নয়নে নিজের ছায়া দেখতে পেল। দেখে সে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল।

এই বয়সে নিজের কাছে নিজের শরীরটাই বড় এক আবিষ্কার। তখন মনে হয় আমি রোজ আরও সুন্দর দেখতে হয়ে উঠছি। গায়ে এত জোর পাই কোত্থেকে? ঘুম থেকে উঠে সকালটা সুন্দর লাগে। রাসবিহারী মোড়ে গাছটা যে ছায়া দেয় তার নিয়ে প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়ানো কত আনন্দের। কারুর উপকার করতে পারলে ভাল লাগে। কলেজে দুএকজন নতুন আলাপ। এই বলে ডাকে— অনিমেষবাবু।

আচ্ছা, আমি বাবু হলাম কবে থেকে। বাবাকে তো অনেকে বাবু বলে। আমি কি বাবার রাস্তায় চলে যাচ্ছি একটু একটু করে। এইভাবেই

কি একজন মানুষ তার অজান্তে ভদ্দরলোক, গেরস্ত হওয়ার পথে রওনা দেয় ?

ধুতি পাঞ্জাবি পরনে কেমন অন্যরকম হয়ে যায় অনিমেষ। মনে হয় সে তার নিজের চেয়ে বড়সুন্দর, সাহসী। আবার শার্ট গুঁজে ট্রাউজার পরলে কোমর থেকে পা দুখানি যেন আগাম এগিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়তে চায়। পা ফেললে জুতোর সোলের নিচে বালির কিরিচ কিরিচ শব্দ যেন বলে দেয় তোমার পায়ের নিচে এই পৃথিবী তোমারই। তোমারই শক্তি, সাহস, দাপটের নিচে এই পৃথিবী।

এই বয়সটার রোজ যেন গা ফেটে পড়তে থাকে। রংই পালটে যায়। একটা গানের কলি শুনলে তার ভেতরকার মানে যেন দশগুণ হয়ে বুঝতে পারে অনিমেষ। গানের মানের সঙ্গে চোখের দেখা পৃথিবী মিশে গিয়ে নতুন মানে বেরিয়ে পড়ে চেনা গান থেকে।

এরই নাম কি যৌবন ? এরই নাম কি ফুলে ফলে ভরে ওঠার ঠিক আগেকার জীবন ? এসব প্রশ্ন আজ করতে পারে টগর মিত্তির। সেদিনকার অনিমেষ মিত্র এসব বুঝতে পারত না। পারার কথাও নয়।

কত অল্পে যে তখন সুন্দর হয়ে ওঠে মানুষ। অনিমেষ নিজেই মানুষের ভেতরে এখন নতুন রূপ দেখতে পায়। মনে হয় বেশির ভাগ মানুষই তো সুন্দর। আমরা দেখতে জানি না বলে রূপ খুঁজে দেখা হয় না। যৌবন বোধহয় এই দেখাটাই শেখায়।

শৈশব একরকম শেখায়, যৌবন আরেক রকম। যৌবনের শেখানোতে উদার হবার, উদাত্ত হবার ধুলো মেশানো থাকে। এই ধুলো দোলের আবিরের মতই রঙিন। বুঝিবা গুলাল আর সুগন্ধী।

অনিমেষ মিত্র বুঝতেই পারত না, কেন আমি এমন হয়ে যাচ্ছি। সে আন্দাজে আন্দাজে যৌবনের ভেতরে একদম অজান্তেই ঢুকে যাচ্ছিল। যৌবনের এই সুহৃদ সুড়ঙ্গ বড় মনোহর-রঙদার।

আমাকেও কেউ মুগ্ধ হয়ে দেখতে পারে এটা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ফিরে তাকাল।

তারপর অনিমেষ আর সত্যি সত্যি অন্যের হয়ে ভাব দিয়ে চিঠি লিখতে পারল না। বিশেষ কাউকে দেখে ঘন ঘন চোখ বুজতে আর খুলতে পারল না। স্লো মোশনে সাইকেল চালিয়ে কাউকে ফলো করে অনিমেষের অপমান লাগল। আর ভুলে গেল শিস দেওয়া।

তার বদলে শিখল জীবনের প্রথম ভালবাসা। হেনা নিজে শেখাল।

অত হামলে পড়ো না। শেষ হয়ে যাচ্ছি না কী? দ্যাখো। এইভাবে....কোনও তাড়াহুড়ো নেই। হেনার ভ্রূ, চোখ অনিমেষের চোখের সামনে। তারপর কী একটা পরিয়ে যাওয়া ভাল লাগা যেন প্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

হেনা বলল, এমন তড়বড় করে কেন বল তো? আমি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছি।

সুখের সায়র, আমার জীবন কিংবা অন্ধকার ঘরের মত চটি বইগুলোতে এরকম গুপ্ত নিষেধের ভয় সব সময় কাজ করত। কিন্তু মুগ্ধ চোখের জাল পেতে হেনা অনিমেষকে ঘনিষ্ঠতায় টেনে আনার পর একজন সুস্থ সাবালক যুবক করে তুলেছিল। ভয় চলে গিয়ে অনিমেষের ভেতর দিয়ে আনন্দের আলো বয়ে যাচ্ছিল। এই সময়েই অনিমেষের খাতায় দু-একটা কবিতা ফুটে উঠতে লাগল। যার অনেকটাই হেনা-বন্দনা। গোড়ায় এসব কবিতা পড়ে হেনার চোখে, ঠোঁটে হাসি খেলত। আনন্দে।

তারপর কী হল বুঝতে পারল না অনিমেষ। হেনা কবিতা দেখলে চটে যেতে লাগল। কোনও কারণই খুঁজে পায় না অনিমেষ।

টেস্ট পরীক্ষার আগে দেখল হেনা কলেজ টিমের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যানের বগলদাবা।

কিছু করার নেই।

ভালবাসা সোর্ড ফাইট করে পাওয়া যায় না। অন্তত দুশো বছর হল সোর্ড ফাইট উঠে গেছে।

ঘুষোঘুষি? তাতে সুবিধে হবে না অনিমেষের।

হেনা নিজেই যখন বেঁকে বসেছে, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েও তো কোনও লাভ নেই। এ এক অসীম কষ্ট, যন্ত্রণা আরও। কিন্তু করার কিছু নেই। এজন্যেই তাহলে হেনা কবিতায় বিরক্ত হচ্ছিল। কবিতার চেয়ে যদি একটা ছক্কার মার দিতে পারত তাহলে নিশ্চয় অনিমেষের ভাগ্য হেসে উঠতে পারত।

কলকাতা আর তার চেনা রাস্তাঘাট এমনকি হেনার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া গঙ্গার ঘাট, ভিক্টোরিয়ার সাদা সিঁড়ি, বোটানিক্যালের বটতলা সবই বিষাদে কালো হয়ে উঠল। অনিমেষ বুঝতেই পারেনি হেনার সঙ্গে খেলাচ্ছলে তার বেড়ানো, কথা চালাচালি—ভালবাসাতে শেখা পরে এমন করে বাজবে।

এই সময় অনিমেষের কবিতাগুলো প্রোজ হয়ে যেতে থাকে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরিত্রগুলো ভিড় করে কলমের ডগায় আসতে লাগল। এবং অসাধ্য বিদ্রোহীর কায়দায় কথাবার্তা বলতে লাগল—যাকে বলে সংলাপ।

এসময় সে দেখলো— খানিকটা বর্ণনা, কিছুটা সংলাপ, কিছু রহস্য, কিছুই না বলে কিছু বলে দেওয়া এসব মিলে গিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে বন্ধুবান্ধব বলতে শুরু করেছে এটা গল্প—ওটা বড় গল্প—সেটা উপন্যাস।

যাকেই ছাপতে দেয় সেই-ই ফেরত দেয়। পড়েও দেখে না। অথচ অনিমেষের তখন কলম ধরলেই লেখা বেরোয়। সে অন্যদের লেখাও পডতে শুরু করে। পড়তে গিয়ে দেখে বাংলা গল্প উপন্যাসের একটা ধারা আছে— ইতিহাস আছে।

কোনওদিন অনিমেষ সেভাবে গল্প উপন্যাস পড়েনি। পড়তে পড়তে— সে বুঝতে পারল সে যা লিখেছে তার জোরে সে নিজেও একজন লেখক।

কিন্তু হাতের গল্পগুলো নিয়ে একটা বই করা দরকার। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাবার আগে বইটা বেরোলে হয়। তার লেখা বই। সবার সঙ্গে সে হেনাকেও এক কপি উপহার দেবে।

যে কোনও খেলা জানে না— যে ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যানের বগল থেকে হেনাকে হিঁচড়ে বের করে আনতে পারে না— যার যন্ত্রণা অপমানে জ্বলে গিয়ে সব কিছু কালো গোলাপ হয়ে যাচ্ছিল অথচ কিছু করার নেই সে গল্পে ডুবে যেতে লাগল। নতুন নতুন মানুষ তার কাছে জ্যান্ত কাহিনী হয়ে আসতে লাগল।

নিজেই ছাপাবার জন্যে ওয়েলিংটনের কাছাকাছি এক গলিতে ধরণী আর্ট প্রেসে গিয়ে হাজির হল। তখন এক ফর্মা পাইকায় ছাপতে লাগে চল্লিশ টাকা। বাঁধাই একশো বই পিছু বত্রিশ টাকা। এর পর আছে আর্টিস্ট, ব্লক, বিজ্ঞাপন।

উরে বাবা! এ তো অনেক টাকা। সপ্তাহে ছদিন পড়ালে ফাইভ সিক্সের ছেলের জন্য মাসে তিরিশ টাকা পাওয়া যায়।

বগলে কিছু ময়লা ম্যানসক্রিপ্ট নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল অনিমেষ। সিঁড়ির মুখে ঝকঝকে চেহারার এক ভদ্রলোক তাকে আটকালেন।

কী হয়েছে?

ভারি সুশ্রী দেখতে, ধুতি পাঞ্জাবি পাট ভাঙা। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। মাথার চুল প্রায় সবটাই কুচকুচে কালো। চোখ দুটো ভারি

উজ্জ্বল। হেসে বললেন, এটা আমারই প্রেস। কী হয়েছে বলতো ভাই....অনিমেষ বলল সব।

শুনে বললেন, এই কথা। তা প্রেস যখন—খরচ খরচা তো লাগবে ভাই। আমি তোমায় একটা রাস্তা বের করে দিতে পারি। তুমি যদি রাজি থাক।

তখন অনিমেষের যে কোনও শর্তেই রাজি হয়ে যাওয়ার কথা। সে লিখেই চলেছে। কিছুই ছাপা হয় না। ম্যানাসক্রিপ্ট দুচার বন্ধুকে শোনাতে শোনাতে হাতের ঘামে ময়লায় কালচে হয়ে উঠেছে কাগজগুলো! এগুলো ফেলে দিতেও পারে না। আবার কেউ ছাপেও না। অথচ ওর ভেতরেই সে কখনও ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান—কখনও বা হ্যাট্রিক করে বসে আছে একাই তিন তিনটে গোল দিয়ে।

যা বলবেন তাতেই আমি রাজি।

বেশ তো। কাল বেলা একটায় এসো।

এখন বলুন না—

কালকেই বলব। ঠিক একটায়। আমার নাম জানো?

না।

আমি শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। বেদান্ততীর্থ। এই লাইনে প্রথম জীবন শুরু করেছি মিশন প্রেসে। সেখানে সাতান্নটি ভাষায় বাইবেল লেখা ছাপা হত। আমি ছিলাম হেড প্রুফ রিডার। হেঁড পণ্ডিতও বলতেন অনেকে। কাল একটায়।

অনিমেষ বেরিয়ে আসছিল। বেদান্ততীর্থ নিজেই ডেকে থামালেন। শোন। শোন ভাই। যদি ঘরে না পাও তো মেশিনম্যান যতীনকে বলবে। সে তোমায় বলে দেবে কোথায় আছি।

যতীন? কোথায় পাব তাকে?

আমি থাকব। যদি না থাকি, বড় ফ্ল্যাট বেডটায় গিয়ে বলবে যতীন কে আছেন ভাই?

আশায় দুলতে দুলতে অনিমেষ বেলা ঠিক একটায় ধরণী আর্ট প্রেসে এসে হাজির হল।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ ঘরে নেই। মনটা দমে গেল অনিমেষের। পয়লাবারেই ফেইলিওর।

তবু মেশিন ঘরে গেল। বড় বড় তিনটে ফ্ল্যাট বেড। দুটোয় কাজ হচ্ছিল। একেবারে কোণেরটা বন্ধ।

যতীন কে আছেন ভাই?

যারা কাজ করছিল তারা এ ওর মুখ দেখল। তারপর বন্ধ মেশিনটার পাশ থেকে একজন প্রায় ঘুমন্ত লোককে ঠেলে তুলল। কে ডাকছেন?

আপনি যতীনবাবু?

হুঁ, কি আছে আপনার?

কিছু নয়। শ্রীকুমারবাবু আসতে বলেছিলেন।

ও, আপনি চলে যান পাঁচ নম্বরে। দোতলায় কোণের ঘরে যাবেন।

পাঁচ নম্বর?

এই সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়েই দুটো বাড়ি বাদে পাঁচ নম্বর। সামনেই সিঁড়ি। দোতলায় উঠে যাবেন সিধে— কোণের ঘরে পেয়ে যাবেন।

এখন যা মনে পড়ে দিনটা ছিল বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন। রাস্তায় নেমে ভ্যাপসা গরম। সেই সঙ্গে আচমকা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। প্রেস পাড়ায় যেমন চেহারা হয়। রাস্তায় খোঁদল। ক্লাইভের আমলের ভাঙা বাড়ি। বারান্দায় টাইপের কেস, সিট মেটালের ম্যাগাজিন। রাস্তা খুঁজে পাইপ গিয়ে থাকবে। তাই মাঝখানটা ঢিবি ঢিবি।

বৃষ্টি মাথায় করেই ছুটতে ছুটতে পাঁচ নম্বরে গিয়ে উঠল অনিমেষ। সরু ফালির সিঁড়ি। দোতলায় উঠেই কোণের ঘরটা কাউকে দেখিয়ে দেবার দরকার পড়ে না। কেননা সে ঘরটার ভেতর থেকে দিন দুপুরেই চড়া ইলেকট্রিক আলো বেরিয়ে আসে। দরজা আধখানা খোলা। আধখানা আধভেজানো।

সেখানে গিয়ে অনিমেষ তাকাল ভেতরে প্রায় ফাঁকা ঘরে শ্রীকুমার একা। টেবিলে বসে খুব মন দিয়ে কী দেখছেন। দরজার দিকে পেছন ফিরে।

আসতে পারি?

কে? বলে ঘুরে তাকাতে তাকাতেই বললেন, না। দাঁড়ান আমি আসছি।

ঘুরে দরজায় অনিমেষকে বললেন, এস এস। একটা জরুরি প্রুফ মেলাবার ছিল— তাই এখানে আসতে হল। এটা আমাদের অফিস ঘর। চিনতে কষ্ট হয়নি?

না।

যতীন ছিল?

হুঁ।

বোস বোস। বলে হাতের প্রুফটার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাংলা ছন্দের ওপর বই। বাংলা ছন্দ বলে কিছু আছে নাকি? সবেধন নীলমণি-সেই তো এক পয়ার-কাশীরাম দাশ বলে শুনে পুণ্যবান। আর পদ্য? কিছু না বলাই ভাল অনিমেষবাবু। তোমাদের বাংলা গদ্য তো ইংরেজির সিনট্যাকসে লেখা। আমি গভীরভাবে দুঃখিত। আই অ্যাম ডিপলি— হাঃ হাঃ-এরকম শয়ে শয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়। কেরি আর তর্কালঙ্কারে মিলে ফোর্ট উইলিয়ামে যা ঘটতে পারে তাই ঘটেছে। একটি জারজ দাস গদ্য পেয়েছে বাঙালিরা। আর তাই নিয়ে আমরা বলে আসছি আহা! কী সাহিত্য হচ্ছে!

হকচকিয়ে গেল অনিমেষ মিত্র। আবার গদ্য পদ্যের ইতিহাস এমন ঠোঁটাগ্রে দেখে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় যে একজন পণ্ডিত লোক সে ব্যাপারে তার কোনও সন্দেহই থাকল না।

রবি ঠাকুরই তোমাদের ক্ষতি করেছে, ফরাসি গল্প টুকে লিখলেন ক্ষুধিত পাষাণ। রাজটীকা গল্পটার সোর্স তলস্তয়। নষ্ট নীড়ের কথা আর নাইবা বললাম।

দেখুন শ্রীকুমারবাবু, আমি অতশত জানি না। যে কটি লেখার নাম বললেন সব কটিই আমার ভাল লাগে।

তা তো লাগবেই। কিন্তু মনে রাখবে ভাই অনিমেষ, এই রবিবাবু আর পালের গোদা বঙ্কিম আমাদের নরমাল রুট থেকে ডাইভার্ট করে নিজেদের ভুল রাস্তায় নিয়ে গেছেন। তবে শোন, রবিবাবুর এই কবিতাটির সোর্স কোত্থেকে এসেছে—

পঞ্চ শরে দগ্ধ করে
করছ একি সন্ন্যাসী?

সংস্কৃত ছন্দটি শোন

অহহ কলয়ামি বলয়াদি
মণিভূষণং

যা পড়বে এইভাবে—

অহহ কলয় মিবলয় আদিমণি ভূষণ; দেখলে?

মানুষটির প্রেস আছে। পার্টির প্রুফ যত্ন করে নিজে দেখে দেন। ভীষণ সুপুরুষ। আবার সাহিত্য-ছন্দ সব নিয়ে কথাও বলতে পারেন। যদিও সংস্কৃতগন্ধী। হবেই বা না কেন? একে বেদান্ততীর্থ তার বাইবেল মিশন প্রেসে হেড পণ্ডিত ছিলেন— সেখানে সাতান্নটি ভাষায় বাইবেল

ছাপা হত যাদের একটি বাংলা খুব মনে গেঁথে আছে অনিমেষের পাপের বেতন মৃত্যু। মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যদিও মতে মেলার কোনও কারণ নেই।

কোথায় ? ম্যানাসক্রিপ্ট এনেছ ?

আপনি বলেননি তো।

বাঃ ! নিয়ে এলে আজই কমপোজ ধরিয়ে দিতাম। কাল থেকে প্রুফ দেখতে পারতে।

অত টাকার ব্যাপার—

সে তো তুমি কাজ দিয়ে পুষিয়ে দেবে অনিমেষ।

আমি কিন্তু প্রেসের কোনও কাজ জানি না।

ছিঃ ছিঃ। তুমি কেন প্রেসের কাজ করবে। তুমি একজন লেখক—

অনিমেষের বুকটা ফুলে উঠলো। শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় সে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিল।

তুমি লেখক তুমি লিখবে। লেখকের যা কাজ। লিখে লিখে পুষিয়ে দেবে।

কি লিখব শ্রীকুমারদা ? আপনি কোনও কাগজ করবেন না কি।

যে কোনও কাগজের চেয়ে অনেক বেশি ডিমান্ড। কিন্তু এখুনি কি। ধীরে রজনী ধীরে।

বলুন না কী লেখা ? গল্প ? গল্প হলে তো আমি প্রাণ খুলে লিখে দেব শ্রীকুমারদা।

গল্পই তো। গল্পই। কিন্তু এখন নয়। ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য রাই—প্রায় আখর দিয়ে গেয়ে উঠলেন শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থ। গানের গলাটি গাঢ় সুরেলা। বোঝাই যায় সংস্কৃত কাব্য সুর করে গেয়ে থাকেন হয়তো। দোতলাটা প্রায় ফাঁকা। বাইরে ভ্যাপসা গরমের ভেতর ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। অনিমেষের মনে হল, এতদিনে হাতে ঘোরা তেলচিটে পাণ্ডুলিপির একটা গতি হল তাহলে।

বৃষ্টির ছাঁট আসছিল। উঠে গিয়ে জানালার একটা পাল্লা ভেতর দিকে টেনে দেবেন বলে গ্রিলের ওপরে হাত বাড়িয়েছেন শ্রীকুমার। প্রুফের দিস্তে টেবিলে। একটু দেখবে বলে অনিমেষ সবে হাতে নিয়েছে। হা হা করে ছুটে এলেন শ্রীকুমার। জানালা আটকানো হল না তার। পরে দেখ। পরে তো দেখবেই ভাই—

অনধিকারীর মতোই সঙ্কোচে হাত গুটিয়ে নিল অনিমেষ।

বাংলা সাহিত্য স্বাভাবিকভাবে এগোতে পারল না শুধু এই দুটি লোকের জন্য। ওরা দুজন নিজেদের সুবিধেমতো রাস্তায় বাংলা সাহিত্যের প্রবাহকে ঘাড় ধরে টেনে নামিয়ে দিলেন। নইলে যে নিজেদের সুবিধে হয় না।

অবাক হয়ে তাকাল অনিমেষ।

বঙ্কিম আর রবিঠাকুরের কথায় ফের আসছি ভাই। যখন সব ব্যাপারটা আগাগোড়া খতিয়ে ভাবি তখন দেখি এই দুই ইংরেজি শেখা ইংরেজি ভাবনায় লিখিয়ে কিভাবে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত ধারার স্বাভাবিক প্রবাহ বাংলা সাহিত্যকে দূষিত করেছেন নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নিজেদের অনুগামী তৈরি করে আখের গোছাতে গিয়ে—

ভাবলে কষ্ট হয় অনিমেষ। আমাদের স্বাভাবিক প্রসার হল শশধর তর্কচূড়ামণি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যই আমাদের পটভূমি— সেখান থেকেই স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে পদাবলীর ভাষা--

কো বহ কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বমূলে সো রতি নায়ক
পেখলু নটবর ভঙ্গ।

কেমন কিনা অনিমেষ। লক্ষ্য করে দেখ এই সচিত্র প্রেমকে বঙ্কিম অশ্লীল করে তুললেন বিষবৃক্ষে। রবি ঠাকুর তো কিছুই বাকি রাখলেন না চোখের বালিতে।

আমায় ক্ষমা করবেন শ্রীকুমারবাবু। আমি আসছি।

কেন ? কেন ? কী হল ?

বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার কথা একদম মানতে পারছি না।

তা না মানলে। তাই বলে উঠে যাবে কেন ? ওঁদের প্রতিভা না থাকলে কী এত লোককে এতদিন ধরে ওঁরা মজাতে পারতেন ? যাও গিয়ে বস। আমি আদার ব্যাপারী। জাহাজের খোঁজ নিয়ে কি দরকার আমার। বস ভাই, একটু চা বলি।

কয়েকদিনের ভেতর অনিমেষের গল্পগুলোর কম্পোজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেদান্ততীর্থ তো তাকে লেখার কাজ দেন না। কী করে সে এতটা খরচা পুষিয়ে দেবে ?

কথায় কথায় শ্রীকুমার জানালেন, এত বড় প্রেস করা আমার সাধ্যে কুলোতো না। ফাদাররা প্রেস তুলে নিয়ে যাবার সময় ছিটেফোঁটা যা

আমায় দান করে দিয়ে যায়, তাই দিয়েই এই ধরণী আর্ট প্রেসের পত্তন। তারপর কালে কালে যেমনি বাড়িল কালকেতু—

ধরণী নাম দিলেন যে?

ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় তর্কতীর্থ আমার পিতৃদেব, ঠাকুরর্দার টোল ছিল। বিদ্যাসাগরমশায় খুব স্নেহ করতেন ঠাকুর্দাকে। নিজের লেখা টেক্সট বুক ছাপানোর কোম্পানিতে কাজও দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমাদের বংশের রক্তে প্রেসের কালি ঢুকে গেছে। বাবা বাইবেল মিশন প্রেসে ছিলেন। অথর্ব হয়ে পড়লে তাঁর জায়গায় আমাকে বসিয়ে দেন। বাবার মুখেও শুনেছি—তোমাদের রবিঠাকুর-বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও বাংলা গদ্যপদ্যের আলাদা একটা ধারা ছিল। যে ধারা আর এগোয়নি।

বলুন স্বাভাবিক কারণেই শুকিয়ে গেছে।

যাক সেসব কথা। সাহিত্যের কচকচি থাক। তোমার প্রথম বইয়ের তিনফর্মা ছাপা হয়ে গেছে।

সত্যি?

হুঁ। দেখবে?

কোথায় বলুন তো শ্রীকুমারদা?

ওই টেবিলে রেখেছিলাম বোধহয়....বলতে বলতে কী মনে পড়তে, পাঁচ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে হন হন করে রাস্তায় নেমে গেলেন বেদান্ততীর্থ। এইরকম প্রায়ই চলে যান। লক্ষ্য করেছে অনিমেষ। কথার ভেতরে কী মনে পড়ায় হন হন করে চলে যান প্রেস বাড়িতে কিংবা একদম ট্রাম রাস্তায়।

সেদিন ফর্মা খুঁজতে গিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলল অনিমেষ মিত্র। তার বড় ইচ্ছে ছিল কলেজ ছাড়ার আগে মানে পাস দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ছাপানো বইয়ের একখানি হেনাকে দেয়। সে ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান নয়। ছক্কার মাস সে কোনওদিকেই মারতে পারবে না। কিন্তু হেনাকে ঘিরে যে একরকমের দাহ ছিল— যে দাহের ধোঁয়ার নাম অপমান সেই দাহ কেমন করে যেন এই লেখার নেশায় ঢুকে গিয়ে মানুষের ভেতরে ডুব দেওয়ার প্রশান্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। মানুষকে নানা বর্ণচ্ছটায় দেখার একটা আনন্দ আছে। হেনা থেকে ভেতরে ডুবে যাওয়ার যে শুরু তা হেনাকে তুচ্ছ করে আনল আপনি, নিজের পথ বেছে নিয়েছে কখন তা টেরই পায়নি অনিমেষ। তার হেনা এখন লেখা। লেখার ভেতর দিয়ে নিজেকে দেখা জগতকে ঘুরিয়ে দেখা চেনা দুনিয়ার

রূপ ধরার আয়না এই লেখা। তবু রক্ত মাংসের হেনাকে নিজের কচি কল্পনার ফসল একখানা গল্পের বই নিজের হাতে দেবার ইচ্ছে তার ভেতরে ছিল।

সেই লেখার প্রথম ছাপা ফর্মা সে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেল। দুধসাদা কাগজে সারি সারি কালো কুচকুচে পাখির লাইন। নিজের লেখা বলে বিশ্বাসই হয় না। সারা রাত বৃষ্টির পর ভোরের আলোয় ধরা আকাশ থেকে এমন সাদা রঙের ডৌখোল পাখি নেমে আসে ভরা ঝিলে। ফর্মাগুলো হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে গিয়ে ফর্মারই নিচে রাখা কী যেন মেঝেয় পড়ে গেল।

নিচু হয়ে কুড়িয়ে আলোয় ধরে তো অনিমেষের চক্ষুস্থির কী ব্যাপার!

কোনও ভুল হয়নি তো তার। আবার ভাল করে দেখল—হ্যাঁ। ঠিকই।

বেশ সুঠাম শরীরের অল্পবয়সী মেয়েদের ছবি। গায়ে কিছু নেই। নানা ভঙ্গির। দেখতে দেখতে ফর্মার কথাই ভুলে গেল অনিমেষ। তার সেই বয়সে ওসব না দেখাই ছিল অস্বাভাবিক। আবার এটাও ঠিক এ ছবি বেশিক্ষণ ধরে দেখাও যায় না। ফুরিয়ে যেতে বাধ্য।

দেখতে দেখতে অবাকও হচ্ছিল অনিমেষ। এ ছবি এমন কট্টর সংস্কৃতজ্ঞ রুচিবান-সুশ্রী, সুরেলা গাঢ় গলার বেদান্ততীর্থের টেবিলে আসে কী করে?

ঠিক এই সময় ঘাড়ের কাছে শ্রীকুমারের গলা ভেসে এল, এইরে! তোমার হাতে পড়েছে বুঝি? অত দেখে না। রেখে দাও। খারাপ হয়ে যাবে অনিমেষ।

লজ্জার সঙ্গে এবারে অবাক হল অনিমেষ। এই বেরিয়ে কখন ফিরে এলেন? টেরও পাইনি।

টের পেলে তুমি কি আর ওই ছবি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে?

আমি জানতাম না কোথায় ছিল ছবিগুলো। ফর্মা হাতে তুলতে গিয়ে মেঝেয় পড়ে গেল কি যেন— অমনি তুলে দেখি এই সব।

আমি চলে যাচ্ছিলাম ট্রামরাস্তায়। কি মনে পড়তে ফিরে এলাম। তা অত লজ্জা পাচ্ছ কেন অনিমেষ। প্রেস যখন খুলে বসেছি— তখন পয়সার জন্য সবই ছাপতে হয়। বুঝলে কিছু। নীতিকথা ছেপে তো পয়সা আসে না। মাস গেলে এগারোজনের মাইনে গুনতে হয়। যাক গিয়ে। তোমার ছাপা ফর্মাগুলো দেখেছ?

হ্যাঁ। এই দেখছি।

দ্যাখো কোনও ভুলটুল হয়েছে কি না। কাগজ সমেত ফর্মা দাঁড়াচ্ছে সত্তর টাকা। এগারোশো করে ছাপা।

এত টাকা আমি কোথেকে দেব শ্রীকুমারদা?

সে ভাবনা আমার।

আমায় কাজও দিলেন না এখন অবধি।

বেশ তো কাল দুপুরে থেকে কাজে বসে যাও। ছাপা তিন ফর্মা হাতে নিয়ে উৎসাহে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে অনিমেষ মিত্র রাস্তায় নেমে এল। তখনও তার মাথার ভেতরে আর্ট প্লেটে ছাপা সুশ্রী সুঠাম মেয়েদের ছবির এগজিবিশন চলছিল। যাদের গায়ে এক গাছি সুতোও ছিল না। অনিমেষের হাতে সুন্দর ছাপা ফর্মা নিজেরই গল্প ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। যেমন করে আগে ভিজত তার নিজেরই গল্পের ম্যানসক্রিপ্ট।

কলকাতায় এই ভিড়ের রাস্তায় তার নিজেকে আজ আলাদা লাগার কথা। পাশে যে মাঝবয়সী ছাতা হাতে ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক হেঁটে চলেছেন তিনি জানেনও না তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন বাংলাভাষার উদীয়মান লেখক অনিমেষ মিত্র।

ঠিক পুজোর আগেকার বর্ষাভেজা ভাদ্র শেষের ঘেমো রাস্তাঘাট। শারদীয় পত্রপত্রিকার ডাঁই স্টলে। তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, বুদ্ধদেব, আশাপূর্ণা, সমরেশ বসু অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন। সঙ্গে কী সুন্দর ইলাস্ট্রেশন। পুজোয় বাইরে বেড়াতে-যাবার সময় অনেকেই এসব শারদীয় পত্রপত্রিকা বগলদাবা করে নিয়ে ট্রেনে উঠবে।

পুরী, ডালটনগঞ্জ, শিলং, দিল্লিতে বসে ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে তারা একটি একটি করে পাতা খুলে তারিয়ে তারিয়ে পড়বে বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। দুপাতা জুড়ে ছবি। একপাশে কোনও গাছের গা দিয়ে লেখার শুরু।

অনিমেষ সেই সব পত্রিকার গাদিমারা এক স্টলে এসে দাঁড়াল। হয়তো কোনওদিন আমার উপন্যাসও অমন দুপাতা জোড়া ছবি দিয়ে বড় বড় পুজো সংখ্যায় আদর করে ছাপা হবে।

হয়তো তখন কোনও সুন্দরী অধ্যাপিকা জসিডিতে পুজোর ছুটি কাটাতে গিয়ে আমার লেখা উপন্যাস পড়তে শুরু করে দেবেন। শারদীয় পত্রিকা দুহাতে মুড়ে নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। মাথার ওপর আমলকি গাছের ছায়া।

কেয়া বাবু, কিতাব? কিতাব চাহিয়ে?

দোকানীর কথায় চমকে উঠল অনিমেষ। সামলে নিয়ে বলল, দেখলাও—

লোকটার উড়নচণ্ডী চেহারা। পত্রপত্রিকার পেছন থেকে বের করে আনল কাগজে মোড়া বই। এক এক কিতাব ষোলা রুপেয়া।—

এত চটি বই ষোল টাকা? কি বইরে বাবা, দেখি।

দেখাতে পারব না বাবু। পিন করা আছে। বড়িয়া মজাদার কিতাব। পড়তে পড়তে গা গরম হো যায়েগা।

তাহলে রেখে দাও ভাই। বলে পাকা খদ্দেরের কায়দায় অনিমেষ বলল, অনেক ঠকেছি ভাই। না দেখে কিনতে পারব না। ষোলটা টাকা তো কম টাকা নয়।

ম্যায় সহি বতাতে হ্যায় বাবুজি—ইয়ে বহুত তেজি কিতাব হ্যায়—

অনিমেষের মাথায় পাগলামি চাপল। তোমার ওই পুজো সংখ্যার দাম কত?

পাঁচ রুপৈয়া হ্যায়। চার রুপৈয়া হ্যায়। ছে রুপৈয়া কি হ্যায়—

আর এই চটি বইয়ের দাম বলছ ষোল টাকা?

ইয়ে কিতাব আউর উহ কিতাব। আসমান জমিন ফারাক বাবুজি।

লোকটা পুজো সংখ্যাকে মাথায় তুলল? না চটি বইকে? বুঝতে পারলো না অনিমেষ। সে এসব বই দেখছে। এদের দু একখানার নামও সে জানে। সুখের সাগর। রাতের আঁধারে।

কাগজ সমেত তোমার ছাপাই দাঁড়াচ্ছে নশো চল্লিশ টাকা। তারপরও তো ব্লক আছে। বাঁধাই আছে।

এত টাকা পাব কোথায় শ্রীকুমারদা?

বিজ্ঞাপন দেবে না? বিজ্ঞাপনেও তো পয়সা লাগবে।

অন্তত একটা বিজ্ঞাপন তো দেওয়া দরকার। কি বলেন আপনি?

নিশ্চয়। নইলে লোকে জানবে কি করে যে বই বেরোল। যাকগিয়ে, ভেবো না। পাঁচ নম্বরে দোতলায় কোণের ঘরে চলে যাও। দেখবে এক পাল্লার দরজা আছে লাগোয়া ঘরে। সে ঘরে টেবিল চেয়ার সবই আছে। বাইরের ঘরের মতো। সারাবাড়ির সঙ্গে কোনও যোগ নেই। দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিয়েই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সবুজ ঘাস। গ্রিন ভেলভেট একদম ধক করে চোখে উঠে আসবে। মন ঠিক করে বসে যাবে। কাগজ-কলম সবই রেডি করা আছে।

কথা হচ্ছিল ধরণী আর্ট প্রেসের মেসিন ঘরে বসে। বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। পাড়ায় পাড়ায় সর্বজনীনের শালু ঝুলছে। ডেকরেটরের লোকজন মণ্ডপের কাঠামো বাঁশ দিয়ে বানিয়ে ফেলেছে অনেক মাঠে। এবার ত্রিপল চড়াবে। কলেজও বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। আর ন ফর্মা মতো ছাপা হলেই অনিমেষের এইসব বই বাজারে বেরিয়ে যায়।

কি লিখব তাতো বললেন না শ্রীকুমার দা—

টেবিলে গিয়ে বসো তো। আগে নির্জন ঘরে বসে কনসেনট্রেশন তৈরি হোক। তোমরা লেখক মানুষ। কি লিখবে কি লিখতে হবে— ওখানে বসলেই বুঝবে। কারও দেবার অপেক্ষায় থাকার লেখক কি তুমি? টেবিল ঘাঁটলেই বুঝবে অনিমেষ। আগে কনসেনট্রেশন আন ভাই।

যাকে বলে দুরু দুরু বক্ষে গিয়ে পাঁচ নম্বরে হাজির হল অনিমেষ মিত্র। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একবার মনে হল— ভারি ভজকট লোক তো শ্রীকুমারদা। গল্প? না উপন্যাস? কিছুই বলেন না। সে শুনেছে অনেক নাম করা লোক অখ্যাত অজানা উঠতি লেখক দিয়ে নিজেদের নামে আগে নেতাজি গান্ধীজির জীবনী লিখিয়ে নিত। যেসব বই হাজার হাজার বিক্রি হলেও আসল লেখক কয়েকশো টাকার বেশি পেত না। তাই যদি শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থের অভিলাষ তো তাতে কোনও আপত্তি নেই অনিমেষের। লিখবে সে। লিখে লিখে নিজের গল্পের বই ছাপাবার খরচটা তো তোলা যাবে।

দোতলার কোণের ঘরের লাগোয়া ঘরটি সত্যিই সারা বাড়ি থেকে আলাদা। কোনও যোগ নেই। দক্ষিণের জানালা খুলতেই শ্রীকুমারের কথামতো ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঘাসের সবুজ অনিমেষের চোখে উঠে এল।

হঠাৎ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ করে উঠে এল পুলিশ। কি ব্যাপার? সারা গা ঘেমে একসা হয়ে গেল অনিমেষের কিন্তু কোনও দিক দিয়েই তারা বেরোবার কোনও পথ নেই। যতীন কোন পথ দিয়ে যে গলে গেল! আশ্চর্য! একদম ভোজবাজির মতো উবে গেছে।

অফিসারের পাশ দিয়ে হাবিলদার ধরনের দশাসই দুজন লোক সাদা পোশাকে তার দিকে এগিয়ে এল...।

॥ চার ॥

বাবা। তুমি বলে টগর মিত্তিরকে চিনতে?

খালি গায়ে অদ্ধলোক যখন চানের আগে গায়ে সরষের তেল মাখে তখন তাকে দেখে মনে হবেই লোকটা তেল নষ্ট করছে। গায়ে মাখতে গিয়ে এদিক ওদিক ফেলবে। শিশুকে অসহায় দেখলে সবাই সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু বরস্ক মানুষকে অসহায় দেখলে মানুষের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে সবাই মনে মনে ভয় পায়।

শ্রীকুমার চমকে উঠলেন। কে বললে তোকে খুকি?

ও বলছিল। কি মজা। এত নাম করা লোককে তুমি আগে থেকেই চিনতে—

শূন্য দৃষ্টিতে শ্রীকুমার বললেন, চিনতাম।

দুপুরে খেতে বসে সরল বড়াল তার বউকে ধমকাল, এ কি হচ্ছে? বাবাকে আরেকটু ডাল দাও। ওঁর পেট ভরবে কিসে?

মাছ দেবে দুখানা।

আমি তো দিতে চাই। বাবা নেবেন না।

সরল বলল, নেবেন না কেন বাবা? রান্না ভাল হয়নি?

না না খুব ভাল রান্না।

তবে খাচ্ছেন না কেন?

খিদে নেই বাবা। এখন তো খাওয়া কমে যাওয়ারই কথা।

সরলের বউ বলল, খাবেন কি করে? কদিন হল তো সকালে আর হাঁটতে বেরোচ্ছেন না। খিদে হবে কোত্থেকে?

সরল বড়াল বলল, আজকাল বিছানা থেকেও উঠছেন দেরি করে। কালই আপনাকে নিয়ে হাঁটতে বেরেব আবার।

আঙুলে পটলভাজা নাড়তে নাড়তে শ্রীকুমার বললেন, বেশ তো। যাওয়া যাবে।

পৃথিবীতে কলকাতায় ঠিক এই জায়গায় একদিনে বলার মতো অনেক কিছুই ঘটেছে। যে কদিন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ হাঁটতে বেরোননি তার ভেতর এ পাড়ার আকাশে একদিন সন্ধেবেলা সম্পূর্ণ আস্ত একখানা হলুদ রঙের চাঁদ উঠেছিল। কেউ বিশেষ খেয়াল করেনি। সবাই যে যার টিভি-র সামনে বসে সিরিয়াল দেখছিল তখন। সিরিয়ালে খুব মজা। এত সস্তায় সিনেমা। নাটক। কেউ মিস করতে চায় না। তাই কেউ খেয়ালই করেনি— সেদিন পূর্ণিমা।

আর এ পাড়ায় লাইন দিয়েও কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। এর ভেতর বেশি রাতে একদিন পায়চারি করতে করতে টগর মিত্তির টের পায়— তার বউ ঘুমোলেও নাক ডাকে। তবে সে ডাকটা মেয়েলি একটা শব্দ করে। যেমন—

ঘঁৎ, ঘঁৎ, ঘঁৎ।

আর এই সময়েই সে বুঝতে পারে মাধবীর কলকব্জা ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত। কেননা ওই ঘোঁৎ ঘোঁৎ-এর সঙ্গে মাধবীর বুকের ভেতরের কলকব্জা প্রচণ্ড গরমে জল তুলে তুলে ক্লান্ত ইলেকট্রিক পাম্পের মতোই অনেকটা আওয়াজ করছে।

এটা টের পেয়ে সে ঘুমন্ত পাড়ায় নিশুতি রাতে হাঁটতে বেরোয়। তখন সে নানারকমের ঘুমের গন্ধ— এক এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে শুঁকে দেখে। শুঁকে শুঁকে সে ডিফারেন্সটা ধরতে পারে। সেই সময় তার সঙ্গে ছিল পাড়ারই দুটি রাস্তার কুকুর আর একটি হুলো। হুলোর একটি চোখ কানা। পেছনের দুপায়েরই বাত। রাস্তার কুকুর দুটোর ভ্যাসেকটমি করানো। অল ডগ লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি ব্রাঞ্চ ফি রবিবার এ পাড়ায় সকালবেলা মিটিংয়ের পরেই বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে রাস্তার কুকুরদের ধরে। তারপর মিটিংয়ের জায়গার পাশেই একটু আড়ালে অপারেশন চলে।

গাঢ় ঘুমের বড়ি থেকে যেমন গুমসোনো একটা গন্ধ ওঠে পাতলা ঘুমের বড়ি থেকে তেমন বেলপাতা পোড়ানোর গন্ধ আসে। এইভাবে বাড়ি টু বাড়ি গন্ধ শোঁকার সময় টগর মিত্তিরের সঙ্গী ওই দুই কুকুর আর এক হুলোর মধ্যে একটিবারের জন্যেও কোনওরকম সংঘর্ষ হয়নি। বরং ওরা আরও মনোযোগী হয়ে বাড়ি বাই বাড়ি গন্ধ শুঁকে টগর মিত্তিরকে ফলো করে।

এই সবের ভেতরে থেকেও মাধবী কিছুই জানতে পারে না। কারণ— সে অনেক ঘুমোয়। কিন্তু তার ধারণা—পৃথিবীর সবাই তার চেয়ে অনেক কম খেটে অনেক বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছে। তাই তার মন সবসময় খারাপ থাকে। হাসতে পারে না। হাসতে পাছে তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিপদের আবডালটা ছিঁড়ে যায়।

ভোররাতে হাঁটতে বেরোবার সময় তাই আজ আর মাধবীকে ডাকলই না টগর। সে একা একাই বেরিয়ে পড়ল। ফিকে অন্ধকারে হাঁটার সময় তার খ্যাতি তার সঙ্গে দুলতে থাকে ঘামতে থাকে। এইভাবে টগর মিত্তির

কলকাতার নতুন কোহিনুরের সামনে এসে পড়ে।

কোহিনুর তখন আভা ছড়িয়ে জ্বলজ্বল করছিল। আলোর আইসক্রিম সাদা দশ বারোটা বরফি স্থলপদ্মর কায়দায় তুলে ধরে এক একটা স্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে। একজনও মানুষ নেই। মেট্রোর ঝকঝকে প্রাসাদ একা জেগে। আজ বোধ হয় বেশি আগে বেরিয়ে পড়েছে টগর মিস্তির।

সে হন হন করে পুটিয়ারির দিকে হাঁটা ধরল। পট করে মরে যাওয়া আর টুকটুক করে বেঁচে থাকার ভেতর একটা ব্যালান্স আনার জন্যে টগর মিস্তির স্পিড বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু বেশিদূর সেই স্পিডে হাঁটা হল না টগর মিস্তিরের। মেট্রো স্টেশন পেরিয়ে টেকনিসিয়ান স্টুডিওর কাছাকাছি এসে সে দেখল ওভার নাইট স্টাফ কারশেডে যাবার লাইনের দুপাশের কেবল্ খুলে ফেলেছে। জয়েনার লম্বা লম্বা প্লাস হাতে নিয়ে কী সব কাটাকুটি জোড়াজুড়িতে ব্যস্ত। আর তাদের পেছনে ভোরের ট্রাক ইন্সপেকসনের পাইলট কোচ দাঁড়িয়ে।

জয়েনার ক্রু যারা তাদের কনুই অব্দি গ্লাভস। পায়েও মোটা সোলের কিম্ভূত রবার সু। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে কাজের লোকজন রাতারাতি দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে নিয়েছে। কাজ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে গেঁথে দেবে। নয়তো রাস্তা থেকে থার্ড লাইন আর থার্ড লাইনের দেশটা এমন খোলাখুলি কোনওদিন দেখা যায় না। জায়গাটা যেন কেমন। গাঢ় থকথকে লাল একটি অব্যর্থ সরলরেখা। তার পাশ দিয়ে দুটি করে রেলপাটি পাতালমুখো। ছাই ছাই পাথর। খয়েরি সিমেন্টের স্লিপার। হলুদ পোড়া ঘাস। ওপরে আকাশ। দুধারে উঁচু দেওয়ালের শত সাবধান। দেওয়াল ঘেঁষে রবারের মোড়া হাই টেনশন কেবল্। সিধে চলে গেছে কারশেডে।

কারশেডের দিকের আকাশে হলুদ সাইনবোর্ডে কালো হরফে Keep away from he edge. Do not get down on the track as the Third Rail is electrified.

থার্ড রেইল। কোনও কোনও বাংলা কাগজে ইদানীং লিখছে— থার্ড লাইন। ভোররাতের রাস্তা থেকে মেরামতির লোকজনের সার্চ লাইটে থার্ড লাইনটা দেখতে পেল টগর মিস্তির। রঙিন। নিস্তব্ধ। সরল। কিন্তু আসলে মৃত্যু।

গা দিয়ে ঘাম ঝরানোর জন্যে হাঁটার স্পিড আবার বাড়িয়ে দিল টগর মিস্তির। রাস্তার দুধারে বাংলা সিনেমার কবরখানা।

আগেকার কালী ফিল্মস। এখনকার টেকনিসিয়ান। প্রমথেশ বড়ুয়ার ইন্দ্রলোক। এখন কয়েকটা শুকনো দীঘি। এন টি এক নম্বর। ক্যালকাটা মুভিটোন। কাননদেবীর মেকআপ রুম। রাইবাবুর মিউজিক রুম। পঙ্কজের পিয়ানো। কাশীনাথের রেকর্ডিং ঘর। অসিতবরণ গেয়েছিলেন— ও বনের পাখি-ই।

ঘটি হাতে ব্লাউজ গায়ে আধুনিকা মলিনাদেবী। গৃহদাহের মহিমের বেশে প্রমথেশ। এইসব কারখানায় একসময় এরা রাজদণ্ড ঘোরাতেন। এই সেদিনও ঝিন্দের বন্দীতে এখানে উত্তম তলোয়ার হাতে।

শেষরাতের ফিকে আলোয় এরা আবার জেগে ওঠেন না কেন? কেন আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাসান না-কাঁদান না?

প্রতিশ্রুতির ছবি বিশ্বাস চন্দ্রাবতীর ঘর থেকে ছড়ি হাতে বেরিয়ে আসছেন। সিঁড়ি দিয়ে কি অসাধারণ নেমে এসেছিলেন।

যুদ্ধ, তুমি সেই যুগটা কেন নিয়ে গেলে? জানি জানি প্রিয় তুমি যাবে চলে— কানন গাইছেন যোগাযোগে বাক্স গোছাতে গোছাতে। জ্যোতিপ্রকাশ আত্মঘাতী হওয়ায় সেখানটায় জহর গাঙ্গুলীকে নিয়ে ফের শুটিং। সন্ধ্যারাণীর গলার স্বর। নীলিমার বসন। রবীন মজুমদারের আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ।

সরল বড়াল বেদান্ততীর্থের সঙ্গে থপ থপ করে হাঁটতে হাঁটতে মেট্রোর নতুন স্টেশন বাড়ির সামনে হাজির হল। নদীর বুকে অনেকগুলো স্টিমার একসঙ্গে সার্চ লাইট ফেললে যেমন হয় নিশ্চুপ মেট্রো প্রাসাদের সামনেই এখন ঠিক তাই। চড়া আলোর ছড়াছড়ি।

ও সরল। বাতাসে আগুন ধরে গেল নাকি?

কি যে বলেন বাবা। মেট্রোর আলো।

তাই বল। কড়া কড়া ঠেকছে। একটু অন্ধকার দেখে হাঁট না। তাহলে ঠাণ্ডা বাতাসও চোখে পাব।

এই হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা যায় বলুন? এখন তো ফাঁকা রাস্তা। আপনার মতো হাঁটুন না বাবা।

আমি পাশেই আছি।

শেষরাতে সবজির লরি যায়। শেষে যদি রান ওভার হই। তখন?

না না। সেরকম কোনও ভয় নেই এদিকটায়। হাঁটুন না।

অগত্যা, ভয়ে ভয়েই হাঁটতে লাগলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ। পড়ে যাওয়ায় তাঁর বড্ড ভয়। কিভাবে পড়বেন তা জানেন না তো। কাৎ হয়ে? না, মুখ থুবড়ে? কিংবা ত্রিভঙ্গে?

কদিন হল এই নতুন খেলাটা আবিষ্কার করেছে সরল বড়াল। এই লোকটাই এক সময় তার দাপটের শ্বশুর ছিল। বড়াল বলে বিয়েটাই ভেস্তে দিচ্ছিল একসময়। ভাগ্যিস খুকি একরোখা হয়ে বিয়ের জেদ ধরে ঠিক তখনই চোখের গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় চারদিকে গ্রিপ হারিয়ে বসেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। নয়তো শেষ অব্দি ট্রাবল না দিয়ে ছাড়তো না। শেষ রাতে এই হাঁটাহাটিতে খুকি আসে না। এলে তার বাবার এ দশা হতে দিত না।

কাঁহাতক থপ থপ করে হাঁটা যায়?

এমনিতে অন্ধ শ্বশুরের জন্যে ভাল ভাল কথা বলতে পেরে একরকমের তৃপ্তি তার হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় আরাম পায় সরল বড়াল এই শেষরাতে। আমি পাশে আছি— হাঁটুন— বলে ছেড়ে দেওয়ায় অন্ধকারে ভয়ের ভেতর প্রতি পলে আছাড় খাওয়ার আতঙ্কে মাখামাখি হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রোবটের কায়দায় বেদান্ত তীর্থ নড়তে চড়তে থাকেন শুধু। থপ থপ বন্ধ হয়ে যায় তখন। দেখে রেলিশ করে সরল। যেন কোনও মেকানিক্যাল মানুষ কিংবা যান্ত্রিক বেদান্ততীর্থ। অথবা বলা যায় দমের চাবি লাগানো শ্বশুরমশায়। এইভাবে রেলিশ করতে করতে বেদান্ত তীর্থকে নিয়ে সরল বড়াল সেই ঢাউস হলুদ সাইনবোর্ডটার নিচে পৌঁছালো। তাতে কালো কালো হরফে লেখা—

Keep away from the platform edge.

Do not get down on the track as the third Rail is electrified.

আরও কীসব লেখা। প্ল্যাটফর্মের কিনারায় জায়গাটা কেমন ভাবতে গিয়ে আজ একদম অন্যরকম লাগল সরলের। কেবল জয়েনারের দল কারশেডের দিক থেকে বেরিয়ে বোধ হয় শেষ রাতের চায়ের তেষ্টা মেটাতেই সাহেবদের ভাঙা কুঠির হাতায় কালোয়ারদের ঝুপড়ির দিকে যাচ্ছে। গলা ভিজিয়েই ফিরে আসবে। এভাবে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে। কারশেডে গরু ছাগলও তো ঢুকে পড়তে পারে।

শরীরটা কেমন লাগায় সরল বড়াল আবার হলুদ সাইনবোর্ডটায় চোখ তুলে তাকালো। মেরামতির ফ্লাড লাইট জ্বলছে। তার ভেতর কালো রঙের keep away from the platform edge কথাগুলো জ্বল জ্বল করছে। সত্যিই তো। কেউ যদি প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক তাকে ছাই করে দেবে।

এ কোথায় এলাম সরল?

দাঁত খিঁচিয়ে উঠল সরল বড়াল। ভয়ের কিছু নেই। ভয় পাচ্ছেন কেন শুধু শুধু? আমি তো পাশেই আছি।

তবু বাবা এ জায়গাটা ঠিক কোন জায়গা?

কারশেডের উল্টোদিকের বটতলা। —বলতে বলতে সরল বড়াল শেষ রাতের বাতাসে বহু দিন বাদে নিম্নচাপ টের পেল। খৈনিওয়ালা, চায়ের ঝুপড়ির লোক গুটিসুটি মেরে শেষ রাতের ঘুম এনজয় করছে।

কি মুশকিল? মেট্রোয় যদি বা বড় বাথরুমের জায়গা থাকে তাকে তো ঢুকতে দেবে না, বিশেষত এই অসময়ে। হয়তো সব দরজাই তালা লাগানো এখন।

বসে যাবে কাছাকাছি কোথাও?

ওরে বাবা। পাড়ার অনেকেই এখন এ পথে মর্নিং ওয়াকে বেরোয়। টগরদাও তো বেরোয় এখন। তার সামনে সে এ অবস্থায় ধরা পড়তে চায় না।

বাবা। আপনি যেমন দাঁড়িয়ে আছেন থাকুন।

কোথায় যাচ্ছ?

ভয় পাচ্ছেন কেন? কাছেই আছি। নড়বেন না— বলে বাড়ির পথে দৌড়ল সরল বড়াল। কোনও গাড়ি বটতলায় সেঁধিয়ে গিয়ে তার শ্বশুরের গায়ের ওপর চড়াও হবে না নিশ্চয়। সরল ঠিক করল সে যাবে আর আসবে। এখন একখানা সাইকেল রিকশা পেলে সবচেয়ে ভাল হত।

এমনই অবস্থা জোরে দৌড়ানোও যাচ্ছে না। তাতেও বিপদ।

কোনও শব্দ না করে নিশ্চল বৃক্ষের মতোই শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ দাঁড়িয়ে থাকলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে। তাঁর চারদিকে এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

॥ পাঁচ ॥

কে?

অনিমেষ—

সরল কোথায়?

কি বলব ভাই? ছুটে যেন কোথায় গেল। বাড়ি ফিরে যায়নি তো?

আমার জানার কথা নয়। আমি যা জানি তাই আজ সবাইকে বলে দেব। এমনকি সরলকেও খুকিকেও।

ঠকাস করে শ্রীকুমারের হাতের লাঠিখানা পড়ে গেল। আমার সর্বনাশ করে কি লাভ তোমার? আমি মুখ দেখাতে পারব না অনিমেষ।

দাঁতে দাঁতে চেপে টগর বলল, সেদিন মনে ছিল না বুড়ো ভাম। চটি বই লেখার সব বদনাম একটা অল্পবয়সী নিরপরাধ ছেলের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তার নামে ঢি ঢি ফেলে দিয়েছিলে।

তারপরেও তো তুমি আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছ অনিমেষ। তুমি একজন লেখক। একজন গৃহী। সবাই তোমায় চেনে এক ডাকে। আমার মেয়েই তো তোমার বই পড়েছে।

থাক্। কত দাম দিয়েছি তা জানিস ভাম।

এ কথায় ভোরের প্রায় ফোটা আলোয় শ্রীকুমারের চোখের পলক ঘন ঘন পড়তে লাগল। সে মনে মনে ডাকছিল—ও বাবা সরল—যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এস। আমার ভারি বিপদ।

টগর মিত্তির বলল, আসুক সরল। তাকেই সবচেয়ে আগে বলা দরকার। জানুক, শ্বশুর লোকটা আসলে কি—

তাতে কিছু লাভ হবে তোমার অনিমেষ—

চুউপ্। বলে ঘুরে তাকাল টগর মিত্তির। ওই নাম আর বলবে না। অনিমেষ অ্যারেস্ট হল। কলেজে নাম কাটা গেল। পরীক্ষা দেওয়া হল না। সে অনিমেষ মারা গেছে। আমার নাম টগর মিত্তির— বলে এখনকার টগর মিত্তির হাঁপাতে লাগল।

খুব বিনিয়ে বিনিয়ে শ্রীকুমার বলল, দোষ আমারই অনিমেষ। ভেবেছিলাম— কাঁচা বয়স, ওসব বই রগরগে করে লিখতে পারবে। কাটবেও ভাল। তোমারই বই ছাপার খরচা তুমি নিজেই আয় করবে। হঠাৎ যে পুলিশ এসে পড়বে—

আরেক ধমকে তাকে শাসালো টগর মিত্তির। কলেজে হেনা অব্দি আমার দিকে ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। তখন আমার কি বা বয়স। আমার গল্পের ছাপা ফর্মা না ছাপা ম্যানাসক্রিপ্ট কিছুই ফিরে পাইনি।

সবই পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল অনিমেষ। ও কি আর ফেরত পাওয়া যায়?

চুউপ্। মেরে মুখের চামড়া তুলে নেব। আমাকে কোর্টে প্রডিউস করা হল। আমি যে কোনও দোষ করিনি, কেউ তা বিশ্বাসই করে না। শেষে মুচলেকা দিয়ে প্রথম অপরাধ বলে ছাড়া পেলাম। তার্তেও কি ছাড়া পাওয়া যায়! অপমান-লজ্জা যেন শুধু আমারই জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল।

আমাকে কুকুরের মতো পালাতে হল। শুধু তোমার জন্যে, তোমার চালাকির জন্যে—

সব তো আশীর্বাদ হয়ে ফিরে এসেছে। সেই অপমানে বুক বেঁধে লিখেছিলে বলেই তো আজ তুমি লেখক অনিমেষ। আজ তো কোনও অনুযোগ থাকার কথা নয় তোমার।

আমি টগর মিত্তির। আমার নিজের নাম থেকে পালিয়ে আসতে হল। আজ সব মনে নেই। সবাই ভুলেও গেছে। বাইরে চাকরি বাকরি নিয়ে অনেক পরে বাড়ি ফিরলাম। কেউ আজ তা মনে করে বসে নেই ঠিকই কিন্তু সব ভুলে গেলেও সেই লজ্জা ভুলতে পারি না শুধু তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে— শীতকালের ব্যথার মতো টনটন করে ওঠে। আমি ভুলতে পারি না।

বোঝাই ঠেলা যাচ্ছে। ঠেলার নিচে ঝোলানো লণ্ঠন। সামনেই কলকাতার নতুন কোহিনুর।

আজ তুমি কৃতী অনিমেষ।

চুপ। চুপ কর বলছি। আজ চল— সবার কাছে বলব তোমার আসল ব্যবসার কথা। কোত্থেকে তোমার উপায় হত— এসব বলা দরকার বেদান্ততীর্থ। চতুর চূড়ামণি।

তার চেয়ে অনিমেষ আমায় মেরে ফেল। ওরা শুনলে ওদের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। তখন আর আমার থাকার কোনও মানেই হয় না। এখন আমি আমার নাম বয়ে বেড়াব শুধু। সরলকে বলার আগে গলা টিপে মারো। এটাই আমার শেষ ইচ্ছে।

অ। শেষ ইচ্ছে? উইল লেখা হয়ে গেছে নাকি! আমি লিখলাম গল্প। লোকে জানল আমি পর্নোগ্রাফির লেখক— বিকৃত রুচির কারবারি। আর বেদান্ততীর্থ তুমি হলে সাধু! আমার লেখা গেল। জীবন গেল। পড়াশোনা গেল। এমন কি বাবার দেওয়া সেই নামটাও ছাড়তে হল। ছেড়েও স্বস্তি নেই। পালাও পালাও—

আজ তো তোমার সবই আছে। সে তুলনায় আমি একজন অশক্ত নিরুপায় বৃদ্ধ। আমার ওপর বদলা নিয়ে তোমার কি লাভ?

তোমার মুখোশ খুলে দেব। দেবতুল্য শ্বশুর! স্নেহশীল বাবা। নাতি নাতনির দাদু। দিদিমা দাদামশাই! সবগুলো হাটে আজ হাঁড়ি ভাঙব। সব আমি বলে দেব।

ঘড়ঘড়ে গলায় শ্রীকুমার বলল, আর ক বছরই বা বাঁচব অনিমেষ।

শেষ জীবনটায় এক কাঁড়ি কালিঝুলি মেখে চলে যেতে হবে? এর চেয়ে একটা হার্ট অ্যাটাকও যদি আসত—

হঠাৎ টগর মিত্তিরের খেয়াল হল কারশেডের দিককার দেওয়াল তো আ-গাঁথা পড়ে রয়েছে। মেরামতির লোকগুলো গেল কোথায়? তড়াক করে শ্রীকুমারের সামনে এসে দাঁড়াল টগর। এসেই বলল, বেশ তো মরবে চল।

অনিমেষ ভাই, এভাবে দাঁড়িয়ে রাস্তায় মরব কী করে—

থাক। চোখের জল ফেলতে হবে না। বিশেষ কষ্ট পাবে না। কখন মরে গেছ টেরও পাবে না। চল—

আমি তো কোনওদিক দেখতে পাই না। কোনদিকে নিয়ে যাবে চল।

টগর মিত্তির খুব সাবধানে শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থকে মেট্রোর রেলপাটির দিকে ঘুরিয়ে দিল। এবার কয়েক পা এগোলেই তোমার সব কষ্ট মুছে যাবে চতুর চূড়ামণি।

এ কোথায় যাচ্ছি অনিমেষ?

এখুনি টের পাবে। দেরি কর না। আলো ফোটার আগে তুমি ফুটে যাবে।

এটা কোন জায়গা?

মেট্রো রেলের গাড়ি যার জোরে চলে, থার্ড লাইন চমৎকার লাইন। ও লাইনে দাঁড়ালেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে—।

ইলেকট্রিক?—কথাটা শ্রীকুমারের এলানো ঠোঁটে ঢলে পড়ল। তখুনি ছড়ছড় মতো একটা শব্দ উঠে শ্রীকুমারের পা ভিজে যেতে যাগল। টগর মিত্তির দেখল বেদান্ততীর্থ পেচ্ছাপ চাপতে পারেনি। কি মনে হল তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকুমারকে শক্ত করে ধরল। উহুঁ এভাবে তো তোমায় মরতে দেওয়া যায় না। লোকে বলবে অ্যাকসিডেন্ট। তোমার বরং বেঁচে থাকাই দরকার।

টগরের দুই শক্ত হাতের ভেতর ঢলে পড়ে থার্ডলাইন মুখে ঝুলে পড়া শ্রীকুমার, বলল, তাতে কি তোমার সুখ হবে অনিমেষ?

আমার সুখই তো তোমার একমাত্র চিন্তা! তাই না? এস। অত ঢলে পড়তে হবে না। তুমি বরং বেঁচে থেকেই তোমার কীর্তিকলাপ শুনতে থাক লোকের মুখে। যাকে যা বলবার সব আমিই বলে বেড়াব।

আন্দাজেই শ্রীকুমার আবার কারশেডের দিকে নিজে নিজে ঘুরে

দাঁড়াল। তা হয় না অনিমেষ। ওভাবে আমায় বাঁচিয়ে রেখ না। তুমি যেমন ভাবে চাও আমি ঠিক সেইভাবেই চলে যাচ্ছি।

পৃথিবীটা অত সোজা নয় বেদান্ততীর্থ। নাও ফেরো। রাস্তার দিকে ফেরো। ভুলে যেও না এটা সেই বটতলা সেখানে একটু পরেই মানুষজন গম গম করবে। বলতে বলতে টগর মিত্তির দেখল সরল বড়াল আসছে।

তখনই সে চেঁচিয়ে বলল, এভাবে রেখে যেতে হয় বুড়ো অন্ধ মানুষটাকে ?

জোর পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে সরল বড়াল জানতে চাইল, কেন ? কি হল আবার ? জানতাম আপনি এসে যাবেন।

সূর্যাস্তের আগে

নীলাম্বর হালদার অফিসের কলিগদের দিকে তাকালেন। বাইশ-তেইশ বছর থেকে বড়জোর সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। এয়ারকুলার বসানো ঠাণ্ডা তকতকে অফিস। ঘিয়ে রঙের দেওয়াল। তার সঙ্গে মিলিয়ে আলো। টানা ঘরের শেষে কাচের পার্টিশনের ওপারে ওপরওয়ালা বসে। বাইরে থেকে দেখা যায়।—তিনি ফোন ধরছেন। নোট করছেন। উল্টোদিকের চেয়ারে যাঁরা গিয়ে বসছেন— তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা হয়ে গেলে লোকজন উঠে চলে আসছেন। আবার নতুন কেউ গিয়ে বসছেন। অফিসটি বেশ ছিমছাম। এক্সপোর্টের কারবার। ওপরওয়ালা তাই নিয়ে মাথা ঘামান।

নীলাম্বর হালদার পার্টিশন ঠেলে ভেতরে ঢুকে বললেন, সবগুলো দেখে দিয়েছি। কোনও গোলমাল হবে না।

ওপরওয়ালা পনের-ষোল বছরের ছোট হবেন নীলাম্বরের চেয়ে। এখনও পঞ্চাশ হয়নি। তিনি চোখ তুলে নীলাম্বর হালদারের মুখে তাকালেন। সব ঠিক আছে তাহলে ?

হুঁ। একটু-আধটু যা গোলমাল ছিল তা ঘষেমেজে দিয়েছি।

এ জন্যেই তো আপনাকে আনা মিস্টার হালদার। কতদিন যেন কাস্টমসে ছিলেন ? অনেকদিন ?

একত্রিশ বছর কাজ করে রিটায়ার হলাম। চাকরিতে থাকতে থাকতেই আপনাদের সঙ্গে আলাপপরিচয়—

গুড্ লাক। বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিন।

রিটায়ার করেও তো আপনাদের এখানে চার বছর আছি।

ওপরওয়ালা আর জবাব দিলেন না। তিনি টেবিলের কাগজে ডুবে গেলেন। নীলাম্বর হালদার বেশিক্ষণ অফিসে থাকেন না। বিশেষ করে সৌদি আরব, মিশর, আলজিরিয়া— এসব দেশে এক ধরনের ইস্পাত পাঠাতে হচ্ছে ইদানীং— যা কিনা— রপ্তানি বাণিজ্য দপ্তরের নানান ফ্যাকড়া পেরিয়ে পাঠানো খুবই কঠিন।

এই অফিসটি অনেক অফিসের চেয়ে মডার্ন। কম জায়গা কিন্তু সাজানো-গোছানো। কম লোক। কিন্তু মাইনে আইনে ভাল। সর্বদাই এরা খুঁজে বেড়ায়— বাইরে কোন দেশে কী পাঠানো যায়। কোন পথে পাঠানো যায়। জাহাজে ? এরোপ্লেনে ? খানিকটা ট্রেনে ? খানিকটা লরিতে ? তারপর আবার জাহাজে ?

বিভিন্ন শিপিং লাইনের ক্যালেন্ডার দেওয়ালে। গভীর নীল সমুদ্রে বিশাল কার্গো শিপ ভেসে চলেছে। জল মহেন্দ্র। লালা লাজপত রায়। আবুল কালাম আজাদ। এসব জাহাজের নাম। সেই ছবি ক্যালেন্ডারে। সেদিকে তাকিয়ে নীলাম্বর হালদারের মাথার ভেতর শুধু একটা কথা ভেসে ওঠে। আমাদের সুকিয়া স্ট্রিটে কার একটা ক্যামেরা দরকার— সেটা তৈরি হচ্ছে টোকিওতে। তারপর তার নাম 'ক্যানন' দিয়ে টোকিওর কোন স্ট্রিট থেকে সেটি সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কলকাতায় চলে এল। মেটিয়াবুরুজে ঢালাওভাবে চেক চেক হ্যান্ডলুমের শার্ট তৈরি হল। হওয়ার পর তারা চলে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের রাস্তার শোরুমে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। আমেরিকান স্প্রিংয়ের জন্যে। পৃথিবীটাকে সবসময় এফোঁড়-ওফোঁড় করছে জাহাজ এরোপ্লেন, টেলিফোনের কথাবার্তা। ফ্যাক্স।

ওপরওয়ালা তাঁর কথার কোনও জবাব না দেওয়ায় নীলাম্বর হালদার কিছু দমে গেলেন। আমি তো ভাই তোমার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে— খানিকটা আমড়াগাছি করে কিন্তু সুবিধা নিতে চাইনি। আমি চাইছিলাম— তুমি আমার কথা মুখে তুলে শোন। তা তুমি শুনলে না। আমি কথা বলে যাচ্ছি— তুমি মাথা নামিয়ে নিজের কাজে ডুবে গেলে।

এটা কি কোনও কার্টসি। কাস্টমস থেকে যখন আমি রিটায়ার করি— তখন ওখানে আমি অ্যাপ্রাইজারের পোস্টে। দিশি জাহাজ কোম্পানি— বিদেশি জাহাজ কোম্পানির কলকাতার এজেন্টরা আমার ঘরে ঢোকার আগে স্লিপ দিয়ে বাইরে ওয়েট করত। আমি বললে তবে তারা ভেতরে আসত। তারা সব কত কোটি কোটি টাকার জাহাজ কোম্পানির হয়ে আমার কাছে তদ্বির করতে আসত। জাহাজের খোলে ঠিক ঠিক স্পেসিফিকেশনে কার্গো লোড হয়েছে কি ? না হয়ে থাকলে কী পরিমাণ হয়রান করতে পারতাম ওদের। হলেও পারতাম। নানান ফ্যাকড়া তুলে। তা কি জানে ওই ছোকরা— যে কিনা আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মাথা নামিয়ে নিজের টেবিলের কাগজে ডুবে গেল।

এই যে হালদারদা। বাড়ি চললেন ?

হ্যাঁ। এখন আর বসে থেকে কী করব বল বিকাশ—

বিকাশ একজন তরুণ যুবক। সে এই অফিসের হয়ে মাঝে মাঝে ডকে যায়। পোর্টের কাগজপত্র সই করায়। সে জানতে চাইল, এখন নিশ্চয় বাড়ি গিয়ে হুইস্কির গ্লাস সাজিয়ে বসবেন?

ওই একটু-আধটু।

কি হুইস্কি?

নীলাম্বর হালদারের চোখের সামনে একটা জাহাজ ভেসে উঠল। সবুজ রঙের বর্ডার দেওয়া। জলের ওপর জাহাজের ইস্পাতের গা যেটুকু ভেসে আছে— তার ওপর দিকটায় এই সবুজ রঙের বর্ডার। সারাটা জাহাজকে ঘিরে। সাউথ আমেরিকার হুইস্কি বিকাশ। বুঁরবো— পানামার একটা জাহাজকে বসিয়ে দিতে হয়েছিল।

বিকাশ ডকে গিয়ে দূরে দাঁড় করানো জাহাজের গা দেখে শুধু। কত দেশের জাহাজ। তাতে রকমারি চেহারার সেইলার। রেডিও অফিসার। ক্যাপটেন। কোনও কোনও জাহাজ ডকে ভিড়তেই পারে না। ছোট লঞ্চ দিয়ে তবে গ্যাংওয়ে ধরে জাহাজে ওঠা। অবিশ্যি বিকাশ কোনওদিন ওঠেনি। একেবারে বসিয়ে দিতে হল?

না দিয়ে উপায় ছিল না। জাহাজটা হাই সি-তে থাকতেই আমাদের কাছে খবর ছিল। দরকারি কাগজপত্তর ছাড়াই জাহাজটা এদিক-সেদিক ভিড়ে— এদেশে-সেদেশে জিনিস নামিয়ে দিচ্ছিল। গুণের কোনও ঘাট ছিল না জাহাজটার।

কী জিনিস নামাচ্ছিল?

কত কি! তার কি শেষ আছে। ল্যাটিন ওয়াইন। লিকর। সাউথ আমেরিকান হ্যান্ডলুমের কাপড়চোপড়। ওদের হ্যান্ডলুম তো খুবই রিচ। কোকেন। ফিলিগ্রি।— কিছুই বাদ ছিল না। এমকি ঘড়ি, টু-ইন-ওয়ান— ওসব তো ছিলই।

কথা বলছিলেন নীলাম্বর— আর তাঁর চোখের সামনে পানামার 'এস এস, ভিভালদা' জাহাজখানা দিব্যি অফিসঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছিল। সবুজ বর্ডার আঁকা ইস্পাতের খোল। ছাই রঙের। ওই সবুজ বর্ডার অব্দি হাই সি-তে জল উঠলে ভয় নেই। ওই দাগ ছাড়িয়ে সমুদ্রের জল আরও ওপরে উঠতে থাকার অনেক আগেই স্টিম শিপ ভিভালদা থেকে মাল খালাস করতে করতে এগোতে হবে। এইটেই লক্ষ্য করার। বিকাশ বসে কাজ করছিল দেওয়ালের দিকে পিঠ ফিরে। ছোট ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে

পাশেই টাইপ করছিল আরেকটি ছেলে। বিকাশের বাঁ হাতের পাশে ক্যালকুলেটরে একটা বড় অঙ্ক। এস এস ভিভালদা ভাসতে ভাসতে অফিসঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। জলের ফেনায় টেবিলের কাগজপত্র ওপরওয়ালার ঘরের দিকে পলকে ভেসে গেল। ভিভালদার ইঞ্জিনটা ঘুমপাড়ানি স্বরে ভুগ ভুগ করে চলছেই। জাহাজের দোতলার ডেকে অফিসবাড়ির তেতলার ব্যালকনি আটকে গিয়ে ঢালাই গ্রিলসমেত ঝুলবারান্দা সমুদ্রের জলে পড়ে গেল।

অনেক লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে। নীলাম্বর হালদার ওরই ভেতর জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তেতলায় ক্যাপটেনের কেবিনে গিয়ে হাজির হলেন। নীলাম্বরের পায়ের জুতোজোড়া সমুদ্রের জলে ভিজে গেছে। এ জুতো, নীলাম্বরের মনে পড়ল— এডেনে জাহাজ থেকে নেমে পাঁচ বছর আগে এক বিকেলে কেনা। তখনও নীলাম্বর কাস্টমস ইনটেলিজেন্সের হয়ে ইন্ডিয়ান ওসান, মেডিটেরিয়ান সি-এর চারদিককার দেশগুলোয় পোর্টে পোর্টে ঘুরে বেড়াতেন। দেখতে হত ইন্ডিয়ামুখো ভেসেলগুলো কী মাল তুলছে। আর দেখতে হত— ইন্ডিয়া ছেড়ে আসা জাহাজ কী মাল খালাস করছে। ওরা কাগজপত্তরে যা বলে— তাই কি নামায় ? — তাই কি তোলে ?

ক্যাপটেনের ডান চোখের ওপর চামড়ার ছোট্ট পটি ঝুলছে। সে নীলাম্বর হালদারকে পাত্তাও দিল না। তার বাঁ চোখ সামনের দিকে। কিন্তু নীল সমুদ্রের বদলে চোখের সামনে বাড়ির পর বাড়ি। জল কোথায় ? অনেক নিচে ক্যামাক স্ট্রিটের দু'ধারে অফিসবাড়ি, ফ্ল্যাটবাড়ি, পেট্রল পাম্প, পার্ক। গির্জার মাথা।

নীলাম্বর ধমকে উঠলেন, আই সিজ ইওর শিপ ক্যাপটেন।

ক্যাপটেন নীলাম্বরের ইংরেজি বুঝতে পারছেন না। জাহাজটি পানামার। সেইলররা স্প্যানিশ বোঝে। ক্যাপটেনও তাই। তিনি চোখ তুলে দেখলেন— জাহাজের ডেকে ইন্ডিয়ান পুলিস থই থই করছে। যেখানেই হাত দিচ্ছে— সেখান থেকেই বেআইনি জিনিস বেরিয়ে আসছে। গাদা গাদা ড্রেস মেটিরিয়াল। পিপে পিপে বুঁরবো হুইস্কি। পারফিউম। ইটালির সাবান।

ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট ক্যাপটেন। ইন্ডিয়ান কাস্টমস এবার এস এস ভিভালদাকে অকশনে চড়াবে।

সেনর হালদার। এজন্যে জাহাজের মালিক দায়ী। আমরা নিশ্চয়

তোমাদের কাছ থেকে সেফ প্যাসেজ আশা করতে পারি ?

এই তো বেশ ইংরেজি বুঝতে পারছ ক্যাপটেন। এই তো মুখে খই ফুটছে। সেফ প্যাসেজ। সেফ প্যাসেজের কথা এখুনি বলতে পারছি না ক্যাপটেন। ইন্ডিয়ান কোর্ট তা ঠিক করবে।

ক্যাপটেন তার বসবার জায়গায় ডানহাতের দেরাজ থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে নীলাম্বর হালদারের সামনে শব্দ করে রাখলেন। ইট ইজ দ্য বেস্ট হুইস্কি ফ্রম পানামা। অফ দ্যাট আই হ্যান্ড নাউ অ্যাট ইওর মার্সি সেনর হালদার।

বোতলটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরলেন নীলাম্বর হালদার। মুখে বললেন, ক্যাপটেন। তুমি তো দেখছি ইংরেজি খুব সুন্দর বলতে পার।

কাজ চালানো গোছের। রুডিমেন্টারি সেনর।

একজন বাঙালি অফিসার ছুটতে ছুটতে এসে নীলাম্বরের কাছে পারমিশন চাইল, স্যার আমি কি ফোর্স নিয়ে জাহাজের হোল্ড-এ নামব ?

আরেকটু দেখে নাও মিস্টার ঘোষ। গ্যালিতে কী আছে দেখ আগে।

ঠিক এইসময় বিকাশ— অফিসের ভাষায় যে কিনা একজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট—ফোন ধরে আবার টাইপও করে— সে নীলাম্বর হালদারের ডান হাতখানি চেপে ধরে ফেলল, ও কী ভাষায় কথা বলছিলেন ? আমরা সবাই অবাক হয়ে শুনছি।

বিকাশ তাঁকে ধরে ফেলায় নীলাম্বর হালদার এক ঝাঁকুনি খেয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের এই অফিসবাড়িতে ফিরে এলেন। ছোট্ট করে বললেন, চলি বিকাশ—

আরেকটু বসলে অফিসের পুল কারে চলে যেতে পারতেন। ও কোন ভাষায় কথা বলছিলেন নীলাম্বরদা ?

নাঃ। রাত হয়ে যাবে আরও। আমি ট্যাক্সি নিয়ে নেব। হাই সি-তে কয়েকটা স্প্যানিশ পাইলটের নাম মনে পড়ে গেল—

অফিস থেকে বেরবার মুখে পশুপতির সঙ্গে দেখা। পশুপতি গুহরায়। তিনিও অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে নীলাম্বরের সময়েই রিটায়ার করেছেন। প্রায় বছর চল্লিশ ওদের চেনাশুনো। পশুপতি তাঁর চাকরিজীবনে সরকারি ডিপ টিউবয়েল দেখাশুনো করেছেন। চাকরির গোড়ায় কিছুকাল মাইনর ডিপার্টমেন্টে থাকতে পশুপতি গুহরায় ক্যানাল অফিসার হয়েছিলেন। তখন তিনি সারা দেশের অনেক খাল দেখেছেন। সেইসব খাল দেখে দেখে তাঁর অনেক মানুষও দেখা হয়ে গেছে। এখনও বুকের ভেতর সাহস

জোগাড় করতে হলে তিনি সেইসব খালের কথা ভাবেন। এই এক্সপোর্ট কোম্পানি থেকে ফলচাষের সেচে ডিপ ইরিগেশনের জন্যে অনেক স্প্রিঙ্কলার যায় সৌদি আরব, দুবাই, জর্ডনে। সেগুলো পশুপতি গুহরায় চেক করে তবে ছাড়েন।

অফিস থেকে বেরিয়ে পশুপতি নীলাম্বরকে বললেন, বেশি তো রাত হয়নি। কোথাও বসলে হত না।

এইভাবেই পশুপতি কথা বলে থাকেন। গত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর। ছিপছিপে চেহারা। কোনও ফ্ল্যাট নেই। শীত পড়লে একটা কালো কোট গায়ে দেন। নয়ত এমনি ট্রাউজারের ভেতর হাফশার্ট গোঁজেন। সেই তুলনায় নীলাম্বর হালদার পর পর দু'দিন একই পোশাক কখনওই পরেন না। তাঁর জামাকাপড় পচে যাচ্ছে। কারণ, অনেকে দেয়। অত প্যান্টশার্ট একজন লোক পরতে পারে না। আর পশুপতির জামাকাপড়ের কোনও আহ্লাদ নেই। দুজনই পেনশন পান। দুজনই মেট্রো রেলের কাছাকাছি থাকেন। দুজনই তেমন বুড়ো হননি। দাঁতে ব্যথা আছে। চোখে চশমা।

নীলাম্বর বললেন, এখন কোথাও গিয়ে বসে খেতে হলে তো তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। ট্যাক্সি পাবি কোথায়?

সে হয়ে যাবে'খন বলতে বলতে পশুপতি ওয়ানওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া গাড়ির ঝাঁকের ভেতর ঢুকে পড়লেন। একটা ট্যাক্সি কিছুতেই দাঁড়াবে না পশুপতি তার জানলার কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, এখুনি থামো। নয়ত ভাল করে দেখ— খোদ বড়বাবু দাঁড়িয়ে—

ট্যাক্সি থেমে গেল। রাস্তার পাশে লাইটপোস্টের আলোয় সিভিল ড্রেসে লোকাল থানার বড়বাবু দাঁড়িয়ে। নীলাম্বর হালদার নিজের গলা চিরে ফেলে ধমক দিলেন, অ্যাই—ইদিকে—ইদিকে—দেখতে পাচ্ছ না?

ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ির ঝাঁক থেকে ট্যাক্সিটা কোনওমতে বের করে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

ততক্ষণে পশুপতি, নীলাম্বর— দুজনই পালটে গেছেন। পশুপতি ট্যাক্সিওয়ালাকে ফিসফিস করে বললেন, যা বলবেন সাহেব— শুনে চোলো—তোমার ভাল হবে।

ট্যাক্সিওয়ালা ভাল বাংলা বলেন। মাঝবয়সী। কোনও সময় পাটনা কি মোতিহারি থেকে আসা হয়েছিল। সেদিককার ঠেঁটি টান গলায়। তিনি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, গড়িয়া যেতে পারব না কিন্তু। তিনঘণ্টা বসে থেকে থেকে এই ফিরছি। এখন মালিককে কী দেব জানি না—

অনেক শান্ত গলায় পশুপতি বললেন, নিজের ভাল চাইলে সাহেবের কথা মেনে চোলো। আমরা বালিগঞ্জ সার্কুলারে যাব।

নীলাম্বর হালদার যে-ই গাড়ির কাছে এলেন অমনি তাঁর হাঁটা পালটে গেল।

পশুপতি কিছুটা কুঁজো হয়ে ট্যাক্সির দরজা খুলে দাঁড়ালেন, বসুন স্যার। বসুন—

গট গট করে হেঁটে ট্যাক্সির ভেতর গিয়ে বসতে বসতে নিজেরই কথার তোড়ে নীলাম্বর হালদার বলে যেতে লাগলেন, চৌধুরী—

পশুপতি গুহরায় চমকে সিধে হয়ে বসলেন ট্যাক্সির ভেতর। ইয়েস স্যার—

ওদের লকআপে নিয়ে গিয়ে আরও রগড়ান। তাহলেই পেটের সব কথা বেরিয়ে আসবে।

পশুপতি কাঁদতে বাকি রাখলেন। ছেলেটা স্যার আর ধোলাই সহ্য করতে পারছে না স্যার—

এই কথার ফাঁকেই কড়া গলায় নীলাম্বর হালদার ট্যাক্সিওয়ালাকে দাবড়ালেন। ও কি ? সিধে বালিগঞ্জ সার্কুলার চল। একথা বলতে বলতেই নীলাম্বর নিজের কথায় ফিরে এলেন। তাহলে ছেলেটাকে দু'ঘণ্টা রেস্ট দিন। তারপর আবার পেটান। আবার দু'ঘণ্টা রেস্ট দিন। এভাবেই পিটিয়ে যান—

ট্যাক্সি রাজহাঁসের মত উড়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার যেখানটায় মিলিটারি ব্যারাকের কাছাকাছি এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় ছুঁয়েছে—সেখানে থামল।

নীলাম্বর হালদার ট্যাক্সির দরজা খুলে কোনওদিকে না তাকিয়ে রেস্তোরাঁ কাম বারে ঢুকে পড়লেন। খুব পশ নয়। কিন্তু ফেমাস। বেয়ারারা অনেককাল চেনে। জল বড় একটা মেশায় না। যারা খাবার দেয় তারা আলাদা। বহুকাল হল নীলাম্বর হালদার বা পশুপতি এখানে এসে বসলে আগের মত আর খাবার খান না। সেসব খেয়েছেন বয়স যখন ছিল পঞ্চাশের নিচে। শুধুই হুইস্কি খান। সাধারণ জল দিয়ে। জলটা বেশিই খান। বার চারেক খেয়ে দুজনে উঠে পড়েন। আবার না খেলেও খাবারের বেয়ারারা দূর থেকে সেলাম করে। হেসে যে যার কাজে চলে যায়।

ট্যাক্সি থেকে ধীরেসুস্থে নামলেন পশুপতি গুহরায়। তারপর ভাড়া কত উঠেছে না দেখে জানলা দিয়ে একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। দিয়ে শান্ত—খুব ভয় পাওয়া গলায় বললেন, তোমার খুব ভাগ্য

ভাল আছে। যদি সাহেব সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে বলতেন— ?

ট্যাক্সি ড্রাইভার টাকাটা নিয়ে বললেন, ষোল টাকা হয়েছে। আর ছ'টাকা দিন।

নাঃ ! একে বাঁচানো গেল না। দাঁড়াও। তোমার টাকা দেওয়াচ্ছি। ভেতর থেকে সাহেবকে ডেকে আনছি।

ট্যাক্সিওয়ালা অস্পষ্ট গলায় একটা গালাগাল দিয়ে বোঁ করে ট্যাক্সি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

দুজনে দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছোট্ট টেবিলে মুখোমুখি বসতে নীলাম্বর হালদার বললেন, বার তো আর ঘণ্টাখানেকের ভেতর বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে একসঙ্গে অন্তত তিনটে করে দিতে বলি। খাওয়া শেষ না হলে তো আর উঠতে বলবে না।

পশুপতি বললেন, তোর 'ও সি' একদম পারফেক্ট নীলাম্বর। কি করে পারিস বল তো ?

তুই বা কম কি পশুপতি। দিব্যি এস আই চৌধুরী সেজে গেলি।

ওটা তেমন কঠিন নয়। ও সি-র সামনে সাবমিসিভ হয়ে যাওয়া— আমি এমনিতেই ভিজে বেড়াল টাইপ। কিন্তু তুই তো ডানপিটে নোস নীলাম্বর। ধীরস্থির। এতদিন সরকারি চাকরি করে এসেছিস। এখনও এক্সপোর্টের কাগজপত্র খুঁটিনাটি দেখিস। তুই কী করে অমন রাফটাফ ও সি হয়ে যাসে ?

খানিকটা গলায় ঢেলে নীলাম্বর হালদার বললেন, আমি খানিকক্ষণের জন্যে একদম অন্যরকম হয়ে যাই। কেন যে যাই— তা বলতে পারব না। যতক্ষণ অন্যরকম থাকি— ততক্ষণ বেশ থাকি।

দুজন বয়স্ক লোক যেভাবে বারে গেলে ক্ষমতার ভেতর— সে পয়সাতেই হোক আব শরীরেই হোক—সমঝে খান— ঠিক সেইভাবেই নীলাম্বর আর পশুপতি নিজের নিজের ওজন বজায় রেখে খেলেন—পয়সা দিলেন— উঠে দাঁড়ালেন— বেরিয়ে এলেন। ও হ্যাঁ, সোডার দাম নীলাম্বর হালদার সবটাই দিলেন। বাকিটা আধাআধি। কিন্তু দুজনই এমনভাবে প্লেটের ওপর টাকা রাখলেন— যেন একটা বেহিসেবি ঝোঁকে সব করে চলেছেন। কিন্তু আসলে দুজনেই মাথার ভেতর হিসেব করেই টাকাটা রেখেছেন।

এখন রাত দশটা। দিনের সে গরম নেই মে মাসের রাতের বাতাসে। দুজনে হাঁটিতে হাঁটতে হাজরা রোডের দিকে চললেন। ওখানে বাস আছে। ট্যাক্সি আছে। অটো আছে।

হাঁটতে ভালই লাগছে। তোদের বাড়িতে তো এখন খাবার লোকের চেয়ে আয় করার লোক বেশি পশুপতি।

কীরকম ?

মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে। গিন্নি স্কুলে পড়াচ্ছেন। তুই সরকারি পেনশন পাচ্ছিস। আবার এখানেও মাইনে পাস। লোক দুজন। আয় তিনজনের।

নারে নীলাম্বর। নন্দনা রিটায়ারমেন্ট নিল — সময় হওয়ার আগেই। শরীরে কুলোচ্ছিল না।

পেনশন পাচ্ছেন।

এখনও পাননি। পাবেন।

তোর পি এফ, গ্র্যাচুইটি পেয়েছিস তো ?

তা পেয়ে গেছি। সেগুলো জায়গায় জায়গায় রেখে সুদ পাওয়া যায়।

সেই সঙ্গে পেনশন পাচ্ছিস।

সে আর ক'টা টাকা বল নীলাম্বর।

সব যোগ দিয়ে দেখলাম পশুপতি। রোজ রাতে মনের মত করে হুইস্কি তুই স্বচ্ছন্দে খেতে পারিস।

নারে পাগল! সেভাবে খাওয়া যায় না। সংসারে খরচা আছে। পুজোর পর মেয়ের ওখানে নন্দনা আর আমি দুজনে যাই। তার একটা বাজেট আছে। বরং তুই নীলাম্বর চুটিয়ে খেতে পারিস।

পারতাম। যদি সব টাকা পুরনো বাড়িটা কিনে সারাতে গিয়ে পগার না হতাম। এই যে ক'টা টাকা এই অফিস থেকে পাই তাই সম্বল।

তোর আর কি নীলাম্বর। স্বামী-স্ত্রী দুজন। ছেলেপুলে হয়নি তোর। ভাগনাভাগনীও নেই। একা আর দোকা। তুই নীলাম্বর ইচ্ছে করলে চান করতে পারিস হুইস্কি দিয়ে।

তাই তো ইচ্ছে করে ভাই। জীবনে ইচ্ছেও ছিল তাই। খুব বেশি কিছু তো নয়। বাড়িটা কিনে বসলাম ঝোঁকের মাথায় —

একটা বাস নেই। গ্যারেজ করা ট্যাক্সি সব ফুটপাতে। অটো যায়। কিন্তু থামে না। চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হুইস্কি শরীরে গিয়ে একরকমের আরাম দেয়। সেই আরামে পশুপতি আর নীলাম্বর হেঁটে চলেছেন। লোকজন কমে গেছে। পানের দোকান খোলা। ওষুধের দোকান খোলা। বাকি সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। নীলাম্বর দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, পশুপতি। এই রাস্তাটা কলেজ লাইফে আমার যৌবনের উপবন ছিল।

সে তো সত্যযুগে।

হ্যাঁরে। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর আগে এসব রাস্তা ছবির মত ছিল। অনেক বাড়ির সামনে বাগান ছিল। পাতাবাহার গাছ। হাজরার মোড়েই তো কলেজ।

আমরা নর্থের ছেলে নীলাম্বর। কলেজ স্কটিশ।

এখন আমরা কোথাকার ছেলে?

একথায় দাঁড়িয়ে পড়লেন পশুপতি। আমতা আমতা করে বললেন, এখন আমরা ছেলে নই। আমি সাউথে ভাড়াবাড়িতে চলে এসেছি কুড়ি বছর হয় গেল। কিন্তু বুড়োও তো হইনি ভাই।

নীলাম্বর হালদার হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমরা আগের মতই আছি। শুধু চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। বাসের পাদানি আগের চেয়ে কেমন যেন উঁচু লাগে। ভয় হয় — পা রাখতে রাখতে বাস না স্টার্ট নিয়ে নেয়।

আমার ওসব কিছু হয় না। তবে এবার ক'টা দাঁত বাঁধাতে হবে। নয়ত মুখের অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন বাজে হয়ে গেছে নীলাম্বর।

সে তো আমারও হয়েছে। কথা বললে — কিছু কথা দাঁতের অভাবে জড়িয়ে যায়। লোকে বুঝতে পারে না।

না না। তোর কিচ্ছু হয়নি নীলাম্বর। মুখ ভর্তি মাংস। দুপুরে একটু ঘুমোবি। চোখটোখ ফুলো ফুলো দেখাবে। তখন তোকে ঠিক আগের মত দেখাবে।

আগে কেমন ছিলাম রে পশুপতি? তোর মনে আছে?

খুব মনে আছে। খুব সুন্দর ছিলিস। খুব টিপটপ। একেবারে ডেবোনেয়ার —

আয় একটা করে ডাব খাই।

এখন ডাব খাবি? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় গলায়।

বাঃ! খানিক আগে দিব্যি হুইস্কি খেলি।

সে তো সাধারণ জল দিয়ে।

উঁহু পশুপতি। আমি দেখেছি। আইস কিউব নিচ্ছিলি।

ওঁরা দুজন একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে ডাবের জল খেতে লাগলেন। ডাবটা নাকের কাছাকাছি উপুড় করে। ডাব খাওয়া হয়ে গেলে পশুপতি বললেন, চল রাসবিহারীর মোড় অব্দি হেঁটে যাই। ওখান থেকে আমি চেতলা চলে যাব। তুইও বাড়ি ফেরার অটো পাবি।

পশুপতি থাকেন চেতলায়। বাজারের গায়ে। ভাড়াবাড়িতে। নীলাম্বর টালিগঞ্জের দিকে। বড় রাস্তার গা থেকে বেরনো একটা ব্লাইন্ড লেনের একেবারে শেষে।

হাঁটতে হাঁটতে নীলাম্বর বললেন, একটা লাইফ ফুরিয়ে এল।

খারাপ তো ফুরোসনি। দিব্যি দাপিয়ে চাকরি করেছিস। ঘুরে বেড়িয়েছিস। যখন যা ইচ্ছে হয় তাই করেছিস।

তবু তো ফুরিয়ে এল। এখন কোনও আহ্লাদ নেই। এখন কিছু আর ঘটে না।

কি আবার ঘটবে। মনের মত মেয়েকে বিয়ে করেছিস।

সে তো আর মেয়ে নেই।

বয়স তো হবেই তবুর। তোরও হয়েছে। আর তবু তো এখনও দেখতে চমৎকার রয়েছে। বরং আমার বউ নন্দনা বুড়িয়ে গেছে।

তবুও বুড়িয়ে গেছে। বুড়ো হইনি আমি আর তুই।

না না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি নীলাম্বর। আর তুইও হয়েছিস।

আর ঠিক এইসময় নীলাম্বর হালদার তাঁর চোখের সামনে একটা নীল আলো দেখতে পেলেন। তিনি পরিষ্কার দেখলেন, শীতকালের বিকেল পাঁচটায় — প্রায় সন্ধের ঘোরে মন্দিরা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। খোলা বেণী — লাল ডুরে — হাতে ব্যাগ। পরিষ্কার বলল, খুলে বল। আমি তোমার কে?

এটা কি জানার সময়? না জায়গা?

না। খোলাখুলি বল। লোকে যদি বলে — আমি তোমার কেপ্ট — তাহলে কি খুব দোষের কথা বলা হবে?

ছিঃ! ছিঃ! চুপ কর মন্দিরা। আমি তোমায় ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি। তুমি আমার সব।

রাখো! হয়েছে। আমি তোমার কেপ্ট ছাড়া কিছুই নয়।

ছিঃ। এভাবে কথা বলো না লক্ষ্মীটি। আমি তোমাকে পাগলের মত ভালবাসি।

তাতে কী আসে যায়। আমাকে ভালবেসে তুমি লোকের মুখ আটকাতে পারবে?

লোকে তো অনেক কথাই বলে মন্দিরা।

আমাকে কেপ্ট বললে কি ভুল বলবে?

একশ বার ভুল মন্দিরা। তুমি আমার স্ত্রী।

কী করে তোমার স্ত্রী হই। তোমার স্ত্রী তরুবালা হালদার। তুমি কি তাকে ডির্ভোস করতে পেরেছ?

রাস্তা দিয়ে ২০৪ নম্বর বাস চলে গেল। ২২৮ আসছে। তার পেছনে ২০৫। কত রকমের প্রাইভেট বাস যে বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। এসব নম্বর মনে রাখা যায় না। কত নতুন নতুন রুট।

তরুবালা হালদার কী তোমাকে ডির্ভোস দিয়েছেন?

না, দেয়নি। দেবেও না।

তাহলে?

আমিই বা কী করব? আমি ছাড়া তরুর কেউ নেই। মা নেই। বাবা নেই। ভাই নেই। বোন নেই। ছেলেপিলেও নেই।

সে তো তোমার দোষে —

না। আমার দোষে নয়। সে তো তুমি ভাল করেই জান মন্দিরা

আমি চেয়েছিলাম — আমি মা হতে চললে তুমি ঠিক ডিভোস আদায় করে নেবে তোমার তরুবালার কাছ থেকে।

দিল না তো। আমি সেখানে কোনও আনন্দ পাই না মন্দিরা। তরু আমাকে না হলে তার চলবে না। এতদিনকার অভ্যেস।

তাহলে আমাকে ভালবাসতে এলে কেন? কেন আমাকে গোড়াতেই বললে না, দেখ মন্দিরা — তরুবালা হালদার আমাকে কিছুতেই ডিভোস দেবে না।

ভেবেছিলাম — ডিভোর্স পেয়ে যাব।

তরুবালাকে বল —আমি মন্দিরা কিছু চাই না। টাকাপয়সা নয় ঘরবাড়ি নয়। শুধু তোমাকে চাই। বাকি সব কিছু তরুবালার থাকবে

ভেবেছিলাম —

আর ভেবেছিলাম!

হ্যাঁ মন্দিরা। আসলে তোমাকে পেয়ে আমি বিভোর হয়ে গেছি তোমার সঙ্গে দেখা না হলে জানাই হত না—নারী কাকে বলে।

মন্দিরা হাঁটছে। ফুটপাতে উঠে। পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো। মন্দিরার হাঁটাটিও নীলাম্বরের চোখ ভরে দেখতে ভাল লাগে। তিনি মন্দিরার পাশাপাশি হাঁটার চেষ্টা করেন। সবটা পারেন না। মন্দিরার কোনওদিন বিয়ে হয়নি। নীলাম্বরের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে

আসলে তুমি আসার আগে আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে মিশিনি কেন? তোমার তরুবালার কী হয়েছিল।

আমরা ঠিক মিশিনি।

কী করেছ এতকাল ?

পাশাপাশি থেকেছি শুধু।

আবার চুপচাপ হাঁটা। এই হাঁটার কোনও দিক নেই। লক্ষ্য নেই। শেষ নেই। এই দেখা হওয়ার জন্যে সারাদিন একটা অপেক্ষা -- অপেক্ষা করে থাকে। দেখা হওয়ার পর এই দেখা হওয়া ইদানীং আর কোনও 'সেপ' পায় না। কী করে 'সেপ' দেওয়া যায় — তা ভেবে হয়ে আছে। তিনি আস্তে বলেন,আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না ? একটাই তো জীবন। আমি আর তুমি সুখী হলে — অন্যের কী হল —অন্যে কী বলল — তাতে কোনও যায়-আসে না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মন্দিরা। এখনও তিরিশ হয়নি। সে বলল, তা কি করে হয় নীল ? আমার কোনও পরিচয় থাকবে না ?

দেখ মন্দিরা -- অসিত ঘোষের মত অত বড মেডিসিনের ডাক্তার — তিনি তো ডিভোর্স না নিয়ে মালা ঘোষের মত অত বড় গাইনিকে নিয়ে আজ পঁচিশ বচ্ছর একসঙ্গে আছেন। তাঁদের তো কোনও অসুবিধে হয়নি।

এসব এগজাম্পেল আমাকে দেবে না। ওদের টাকার জোর আছে। টাকা থাকলে সবাই সব মানিয়ে নেয়।

অসিত ঘোষ তাঁর আগের স্ত্রীর কাছেও মাঝেমধ্যে যান। সেখানে তাঁর মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। জামাইটি ডাক্তার। প্রথমা স্ত্রীর খবরাখবর নেন ডক্টর ঘোষ।

বললাম তো টাকার জোরে সব হয়। তোমার টাকা আছে ?

না। একজন সাকসেসফুল ডাক্তারের মত টাকা থাকবে কোত্থেকে ? আমি সাধারণ চাকুরে লোক। আরি তিন বছর চাকরি আছে।

তাহলে আমাকে ভালবাসলে কেন ? কেন আমাকে দিয়ে ভালবাসালে ? আমার কি এমন হওয়ার কথা ছিল ? তোমার গোড়াতেই ভাবা উচিত ছিল।

আমি তো কোনওদিনও টাকাওয়ালা লোক নই। যদি জানতাম তুমি আমার জীবনে আসবে — তাহলে কবে থেকে টাকা জমাতাম। যাও বা ছিল তাই দিয়ে ওই ভাড়াবাড়িটা কিনেছিলাম। পি এফ টি এফ অ্যাডভান্স নিয়ে। যদি কিছু বেঁচেছে তো উড়িয়ে দিয়েছি।

মদ খেয়ে !

শুধু মদ নয়। মদে আর ক'টা পয়সা লাগে মন্দিরা। বেড়িয়ে। একে-ওকে উপহার দিয়ে। ভুলভাল শেয়ার কিনে।

আমার জীবন তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। কত মেয়ের কত স্মুদ লাইফ। সেই তুলনায় দেখ — আমি যাতেই হাত দিই তাই-ই দূরে সরে যায়। কিছু হবার নয়।

আমি তো দূরে সরে যাবার নয় মন্দিরা —

দূর হও। দূর হও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে।

এক ঝাঁকুনিতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন নীলাম্বর হালদার। নিজেই যেন নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তুই সেই মেয়েটাকে ভালবাসিস এখনও।

পশুপতি গুহরায় ফাঁকা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভালবাসা অত কথা বলার জিনিস নয়। ভালবাসা হল সাইলেন্স।

শিখার সামনে কি তুই বোবা হয়ে থাকতিস ?

শিখা খুবই কম কথা বলত। আমিও তাই। এমনও গেছে — দুজনে ভবানীপুর সিমেট্রিতে বসে আছি। দেখেছিস তো জায়গাটা। এমনিতেই লোকজন বিশেষ যায় না ওদিকে। আদিগঙ্গার এপারে গত শতাব্দীর সিমেট্রি। আদিগঙ্গা পেরলে ওপারে ন্যাশনাল লাইব্রেরি। চিড়িয়াখানা। শিখা আর আমি ১৮৩৭ সনের একটা কবরের পাশে ঘাসে বসে থাকতাম। সালটা রয়ে গেছে। নামটা মুছে গেছে। বিকেল হয়ে এসেছে। কবরখানার গার্ড, মালিদের ছেলেমেয়েরা অন্ধকার হয়ে আসা অব্দি লুটোপুটি করে খেলে। শিখা আর আমি তাকিয়েই আছি — তাকিয়েই আছি। গঙ্গায় দইঘাটে জোয়ার এল তো আদিগঙ্গা জলে ভরে গেল। টালির নৌকো। লগি। আমি শিখাকে বললাম, উঠবে ? শিখা বলল, চল —

কোনও কথাই বলতিস না ?

আনটোল্ড কথাগুলোই আসল কথা। যা কিনা কেউ কোনওদিন শোনেনি। কেউ কোনওদিন মুখে বলেনি। যে যার বুকের ভেতর একা একা বলে। বুকে আলপিন ফুটিয়ে দিলে তবে বেরিয়ে আসতে পারে। রক্তের ফোঁটার মত। সেই কথাগুলোই তো আসল নীলাম্বর।

নীলাম্বর হালদার তাঁর পুরনো বন্ধু পশুপতি গুহরায়ের মুখখানি এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন। গায়ে মেদ নেই পশুপতির। হাফশার্ট গুঁজে পরেছে ট্রাউজারের ভেতর। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন পশুপতি। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর আগে প্রেসিডেন্সিতে পড়তেন। পঞ্চান্ন-

ছাপান্ন বছর আগে সি আই টি রাস্তা বড় করতে গিয়ে ওঁদের আহিরীটোলার বাড়ি ভেঙে ফেলে। কমপেনসেশনের পয়সায় ওঁর বাবা হাওড়ার পঞ্চাননতলায় বড় বাড়ি করেন। হাওড়া থেকেই পশুপতি ম্যাট্রিক দেন। সে-বাড়ি ছেড়ে পশুপতি বিয়ে করে বেরিয়ে আসেন। নন্দনার সঙ্গে পশুপতির বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন নীলাম্বর। পশুপতি তখন কবিতা লিখতেন। এপাড়া সেপাড়া করে বেশ অনেককাল হল পশুপতি চেতলায় থাকেন। টুকটুক করে তিন-চার পেগ খান। ঠুকঠুক করে বাড়ি ফিরে যান। মেয়ের বিয়ের আগে পশুপতি গুহরায় পুজোর পর ফি-বছর সপরিবারে বিহারে বেড়াতে যেতেন। বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ — তখন শিখার সঙ্গে ওঁর ভাব হয়। নীলাম্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন পশুপতি। বুঝলে শিখা — এই আমার বন্ধু নীলাম্বর হালদার। এসব কথাও তা প্রায় তের-চোদ্দ বছর আগের।

জানিস পশুপতি — এইসব রাস্তা আমার সারাজীবনের নানান ভালবাসার রাস্তা।

ধুস! সারাজীবন বলে কিছু আছে নাকি? ওসব আমাদের কল্পনা নীলাম্বর।

এইসব রাস্তা দিয়ে প্রথম যৌবনে তরুবালার সঙ্গে হেঁটে গেছি। আবার একেবারে শেষে মন্দিরার জন্যে আমি এই রাস্তার মোড়ে ওয়েট করেছি।

নিজেকে খুব বেশি ইমপর্টান্স দিচ্ছিস নীলাম্বব। রাস্তা রাস্তাই। সে কারও নয়। তুই তোর মনের খেলা নিয়ে বুঁদ হয়ে ছিলি। সেই সঙ্গে রাস্তাগুলোকে জড়িয়ে নিয়েছিস মাত্র। যাই আমি।

আমাকে ফেলে যাবি?

তুই ঠিক অটো পেয়ে যাবি। বাসও পাবি দাঁড়ালে।

কিছু না পেলে হেঁটে মেরে দেব।

সে তো সবচেয়ে ভাল নীলাম্বর। তোর পায়ে জোর আছে ভাল। এখনও দিব্যি হাঁটিস বড় বড় পা ফেলে।

হাঁটব না মানে? না-হাঁটার কি আছে!

আছে। আছে। আর কিছুদিন পরে দেখবি পায়ের নিচে শুকতলার ওপর পায়ের চেটোতে ব্যথা ব্যথা লাগছে।

এখনও আমার লাগে না। আমি দিব্যি একশ বছর বাঁচব দেখিস।

ওসব বড়াই করিস না। শরীর ঠিক ধসে যায়। আমি তো এখন রিকশ পেলে উঠে বসব।

নীলাম্বর হালদার হাঁটতে লাগলেন। পায়ে কাপড়ের শু। সোল একদম ময়দার মত নরম। বাস পেলেন। উঠলেন না। অটো পেলেন। উঠলেন না।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সওয়া এগারটা। তরুবালা হালদার বয়স আন্দাজে একদম টসকাননি। রঙিন শাড়ি পরেছেন। জাম রঙের জমি। গাঢ় বেগুনি পাড়। লাল ব্লাউজ। মাথার চুল অল্প পেকেছে। উপুড় হয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন। স্বামী আসতে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। মুখের ভেতর সব ক'টি দাঁত থাকলেও নাকের দু'পাশে পাতলা দু'টি ভাঙনের রেখা।

পায়ের জুতো খুলতে খুলতে নীলাম্বর জানতে চাইলেন, আজ কী খাব ?

ফোড়ন দিয়ে অড়হরের ডাল রেঁধেছি। লেচি করাই আছে। চারখানা লুচি ভেজে দিচ্ছি। সঙ্গে আচার।

ফার্স্ট ক্লাস। দু'খানার বেশি লুচি দিও না।

কেন ? বাইরে খেয়ে এসেছ ?

না। পশুপতির সঙ্গে বসে অফিস-ফেরতা তিনটে হুইস্কি খেলাম।

পশুপতিবাবুর হালকাপলকা শরীর। হুইস্কি কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তোমার ভার শরীরে হুইস্কি কি ভাল ?

এতদিন তো খেয়ে আসছি।

আট-দশ বছর আগে কেনা বাড়ি। চাকরির শেষদিকে নীলাম্বর বাড়িটি রিমডেল করেছেন। জায়গায় জায়গায় মোজাইক। জানলাগুলো পুরনো কায়দার। সেসব বিশেষ পালটানো যায়নি। তবে সদর দরজা অনেক খরচ করে বদলে নিয়েছেন নীলাম্বর।

নীলাম্বর খেতে বসলে টিভি চালিয়ে দিলেন তরুবালা। টিভির ক্যারেকটারদের ডায়ালগের ভেতর নীলাম্বর বললেন, বাড়ি ফিরে কিছু ভাল লাগে না।

তরুবালা কোনও কথা বললেন না। বাড়িটি দেড়তলা। কলকাতার একেবারে বুকের ভেতর। দারুণ পোজিশন। একতলায় তিনখানি ঘর। একটি ঘর মেজানিন ফ্লোরে। তাছাড়াও খোলা ছাদের সঙ্গে একখানি বড় ঘর আছে। অবশ্য ছাদের মজা খুব একটা পাওয়া যায় না। চারদিকে তেতলা-চারতলা বাড়ি। ছাদে উঠে মনে হবে — বাড়িটা বুঝি বেঁটে।

খেতে খেতে নীলাম্বর বললেন, তুমি সব মেনে নিলে আমার একটা নতুন জীবন শুরু হত।

খুব আনন্দে থাকতে পারতে না।

মন্দিরা আমার জীবনে এলে ঘর ভরাট হয়ে যেত।

ওরকম মনে হয়। এই বয়সে অত হ্যাপা পোহাতে পারতে না।

খুব পারতাম। বয়সটা এমন কি! আমি রোগাভোগা ডিসপেপসিয়ার রোগী নই। খেতে ভালবাসি। হাঁটতে ভালবাসি। ঘুম হয়। এখনও চাকরির বাজারে আমার অভিজ্ঞতার দাম দাছে তবু।

স্ত্রীর অনেক চাহিদা থাকে। আমার দিকে তুমি তো কখনও ফিরে তাকাওনি। আমি কোনওদিন কিছু মুখ ফুটে চাইনি। কিন্তু নতুন বউ হয়ে এসে মন্দিরা কেন চুপ করে থাকবে। তার তো নতুন জীবন। প্রথম বিয়ে।

মন্দিরার চিন্তা তুমি না করলেও পারতে।

আমি একজন মেয়ে হয়ে আরেকজন মেয়ের চিন্তা করব না! আবার খানিকক্ষণ দাঁতে খাবার চিবনো। এ একটা প্রসেস। রাত হলে খেতে বসতে হয়। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

সকালে এসে কাজের লোক বাসন মেজে দিয়ে যায়। তরুবালা এঁটো নামিয়ে রাখলেন। বাখতে রাখতে বললেন, তোমার এক পুরনো ক্লাসফ্রেন্ড ফোন করেছিলেন।

কী নাম?

কী ভাদুড়ি যেন বললেন। তোমার সঙ্গে কলেজে পড়তেন। খুঁজে খুঁজে নম্বর জোগাড় করে ফোন করেছিলেন। কাল সকালে আসবেন। বাড়ির ডিরেকশন আমার কাছ থেকে নিলেন।

॥ দুই ॥

পরদিন সকাল আটটায় সাদা মাথা—একটু কুঁজো—কিন্তু অনেকটা লম্বা একজন লোক—গিলে-করা পাঞ্জাবি গায়ে এসে হাজির। আমি সুরথ ভাদুড়ি। তুই তো নীলু। নীলাম্বর হালদার। মোটা হয়ে গেছিস।

কিন্তু এর আগে বলা দরকার অন্য একটা কথা। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়তেই নীলাম্বর হালদার একটি ভিভিড স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি একটু অন্যরকম। মন্দিরা শুয়ে আছে। ছিমছাম। মুখের সুকুমার ভাবটি অবিকল স্বপ্নে এসেছে। সিনেমার নায়ক কমল হাসান—ট্রাউজারের ওপর কলার তোলা গেঞ্জি—ঝুঁকে পড়ে মন্দিরাকে দেখছে। পাশে একজন সাদা

পোশাকের মেট্রন দাঁড়িয়ে। তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মন্দিরার পেটের কাছটা খুব মন দিয়ে দেখছেন। আর চিন্তিত কমল হাসানকে কী সব বুঝিয়ে বলছেন।

হলই বা স্বপ্নের ভেতর—মন্দিরার অত কাছে কমল হাসানকে দেখে রীতিমত চমকে গেলেন নীলাম্বর হালদার। কী হয়েছে মন্দিরার ? কমল হাসানের সঙ্গে আলাপ আছে মন্দিরার—একথা তো কোনওদিন বলেনি। খুবই অবাক হয়েছেন নীলাম্বর। এটা কী করে সম্ভব! কমল হাসান কি মন্দিরাদের বাড়ি চিনত ?

কমল হাসানও কেমন ঘাবড়ে গেছে। কী হয়েছে মন্দিরার ? এমন কী অসুখ হতে পারে ? — যা কিনা আমি জানি না। অথচ খবর পেয়ে কমল হাসান এসে গেছে। সেই চেন্নাই থেকে। সেখানে খবর গেল কীভাবে ? কমল হাসানের মত স্টার মন্দিরার কাছে এল — অথচ কোনও ভিড় নেই। আশ্চর্য!

সকাল থেকেই মেট্রন, মন্দিরা আর কমল হাসান ঘুরেফিরে নীলাম্বরের মনে এসে ভেসে উঠতে লাগল। ঠিক এমনই এক সময়ে সুরথ ভাদুড়ি এসে হাজির।

আমি যে তোকে কত খুঁজেছি নীলু—

আমি যে তোকে কত খুঁজেছি নীলে—

আমি যে তোমাকে কত খুঁজেছি অম্বর—

নীলাম্বর তাঁর এই তিনটি নাম সুরথ ভাদুড়ি নামে একজন লোকের মুখে শুনে শিওর হলেন — হ্যাঁ, এই অচেনা লোকটিকে তাঁর চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কেননা— ওই তিন নামেই তাঁর ক্লাসফ্রেন্ডরা কলেজে তাঁকে ডাকত। এমনকি অম্বর বলার সময় সবাই তাঁকে তুমি বলত। নীলু বা নীলের বেলায় তুই।

দুজনের ভেতর কথাগুলো এইভাবে হচ্ছিল। আর কথার ভেতর দিয়ে ৪৬-৪৭ বছর আগে সুরথ ভাদুড়ির যে-চেহারা ছিল — স্টুডেন্ট লাইফের সেই চেহারা একটু একটু করে ভেসে উঠছিল। নীলাম্বরের চোখের সামনে।

টিকালো নাক। বয়স ১৮-১৯। চোখে ভারী সেলের চশমা। ট্রাউজারের ভেতর গুঁজে পরা স্ট্রাইপড শার্ট। বুক পকেটে পার্কার। লম্বা। শ্যামলা রঙ। মাথায় অনেক চুল। পায়ে কাবলি। হাতে প্র্যাকটিকালের খাতা। পাতলা ঠোঁট।

আর এখন ?

মুখের সেই শার্প ভাবটা নেই। মাথার চুল অনেকটা পিছিয়ে গেছে। কিছুটা কুঁজো। তবে বসা — উঠে দাঁড়ানো — কথা শুরু করার ভঙ্গি — সবই সম্পন্ন মানুষের ধাতে। স্টুডেন্ট লাইফের পরে প্রায় পঞ্চাশটা বছর চলে গেছে। এই সময়ের ভেতরেই মানুষ আশা করে। আকাঙ্ক্ষা করে। স্বপ্ন দেখে। ভীষণ খাটে। জমায়। হারায়। ফিরে পায়। তারপর আসে একটা অপেক্ষা। কীভাবে এদেশ থেকে চলে যাব। যদি এইসময় যৌবনের কিছু পাওয়া যায় — যদি এইসময় ভালবাসা পাওয়া যায় — প্রেম· হয় তো কথাই নেই। মনে হয় ভোর হয়ে গেছে। অথচ আসলে ভীষণ জ্যোৎস্নার ভেতর কাকের মতই ভুল করে জেগে উঠেছি। ভোর ভেবে। ভুল ভাঙলে নিজেকে বলি — ভালবাসা তো আমার জন্যে নয়। ও জিনিস অন্যের।

এই ঠিক অপেক্ষাটার সময় — সুরথ ভাদুড়ি এসে হাজির। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে। এসেই বলল, স্টুডেন্ট লাইফ থেকে বেরিয়ে দেড় বছর মেডিকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়েছিলাম — থার্ড ব্যাচ। তারপরেই মামলায় জড়িয়ে পড়লাম।

কীসের মামলা ?

আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। ক্রিস্টোফার রোডে সাড়ে আট বিঘার ওপর বড় বাড়ি। কলকাতার ভেতর নিজেদের পুকুর। সেসব আছে ?

নাঃ ! কাজিনরা বিক্রি করে দেয়। আমাকে ঠকিয়ে। বাবা তখন ইস্ট পাকিস্তানের সিটিজেন হয়ে শ্রীহট্টের চা-বাগান চালাচ্ছেন। চা-বাগান ?

হ্যাঁ। বাবা চারটি চা-বাগান করেন। দুটি ইস্ট পাকিস্তানে। একটি আসামে। একটি ডুয়ার্সে।

ক্রিস্টোফার রোডের বাড়ি-জমির ভাগ পাওনি ?

কাকিমারা ঠকাচ্ছিল। চেপে ধরতে সামান্য কিছু দেয়।

ছেলেমেয়ে কী ?

আমি নিশ্চয় তোমাদের চেয়ে দেরিতে বিয়ে করেছি। আসলে বাবার প্রপার্টি সামলাতে গিয়ে মামলা করে — বন্দুক চালিয়ে — দখল রেখে সময় বিশেষ পাইনি।

ছেলে বড় ? না, মেয়ে ?

ছেলে। সে কুকুর এক্সপার্ট।

কুকুর ?

হ্যাঁ। সারাদিন কুকুর নিয়ে থাকে। এয়ারপোর্টে কুকুর রিসিভ করতে যায়। জার্মানি থেকে ফ্যাক্সে তার মেসেজ আসছে — অমুক জাতের কুকুরের বাচ্চা অত নম্বর ফ্লাইটে দমদমে নামবে। ছাড়িয়ে নিও।

পড়াশুনো ?

বি কম অব্দি পড়েছে।

মেয়ে ?

ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি এসসি দেবে। বুঝলি নীলু — আমরা যখন বি এসসি পড়তাম— তখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কী স্মুদ গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। রাস্তাগুলোও কত সুন্দর ছিল। অবিশ্যি অনেকদিন কলকাতায় থাকি না।

কোথায় থাকো ?

কোটালপাহাড়ে।

সে কোথায় ?

পাকুড়ের পরের স্টেশন। বাবা ওখানকার প্রপার্টির সঙ্গে ইস্ট পাকিস্তানের প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ করেছিলেন। কোটালপাহাড়ে বিহারের উর্দু স্পিকিং জমিদারের— বলতে পার নবাবের প্রপার্টি পাই আমরা—

নবাব ? — যত শুনছেন নীলাম্বর ততই তিনি কোনও থই পাচ্ছেন না।

হ্যাঁ। হিস্ট্রিতে সরফরাজ খাঁয়ের নাম পেয়েছ। তারই ডিসেন্ডান্ট নবাব আসাদুল্লা খাঁয়ের প্যালেসটা আমরা পাই। তিনি পান আমাদের টাঙ্গাইল শহরের তিনমহলা বাড়ি। তিনটে দীঘি। সেগুনবাগিচা —

বল কি সুরথ ? প্যালেস পেয়েছ ?

হ্যাঁ। পঁয়ষট্টিখানা ঘর। সবই পড়ে গেছে। তার ভেতর আমি আঠার খানা ঘর কোনওমতে সিধে রেখেছি। সরফরাজ খাঁ তো নবাব আলিবর্দির কনটেমপোরারি। এখন বলে ভাদৌড়ি কোঠি।

বল কি ! আমি এখানে একরত্তি এই বাড়িটা কিনে সারাতে সারাতে পথে বসে গেছি। আর তুমি পঁয়ষট্টিখানা ঘর নিয়ে—

ফস করে সুরথ চানতে চাইল, তোমার ছেলেমেয়ে কি ?

হয়নি কিছু ভাই।

বেশ আছ। ছেলেমেয়ে হলে বুঝতে পারতে তাদের চ্যানেলাইজ করতে কী না করতে হয়। একই ছেলে সে কুকুর নিয়ে পড়ে আছে। আমি হাল ছাড়িনি। পনের বছর আগে কোটালপাহাড়ে ভাদৌড়ি কোঠির পঞ্চাশ

বিঘায় একষট্টিটা সেগুন গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ছ'টা মেহগনি গাছও লাগাই। তাছাড়া অনেকগুলো শিশুগাছ। সেসব গাছ এখন বড় হয়ে রীতিমত মহীরুহ। আমার মৃত্যুর পর ছেলে যদি বেগড়ায়— একটা গাছ বেচলে তার এক বছরের খরচখরচা চলে যাবে ভালভাবেই। ভাদৌড়ি কোঠি বেচে দেবার দুর্বুদ্ধি হবে না কোনওদিন।

গাছগুলো যদি ফুরিয়ে যায় সুরথ?

সেগুন, শিশু, মেহগনি মিলিয়ে প্রায় একশ গাছ। অতদিন আমার ছেলে বাঁচবে না। চাই কি কোটালপাহাড়ের জন্যে ছেলের মায়াও জন্মাতে পারে।

তরুবালা হালদার এসে চা দিলেন। তাঁকে দেখে সুরথ ভাদুড়ি বললেন, বুঝলেন বৌঠান— কোনও স্বার্থ নিয়ে এই বয়সে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। এসেছি— দেখা হলে শুধু দুটো কথা বলব বলে। অনেকদিন প্রাণের কথা হয় না।

এতদিন মামলা করেছ—

মামলা মানে! প্রথমে কাজিনদের সঙ্গে। তারপর কোটালপাহাড়ে আরেক মামলা।

সেখানে কীসের মামলা?

আর বল কেন? আসাদুল্লা তো ইস্ট পাকিস্তান চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর এক বেগম—রোশেনারা বেগম এসে প্রপার্টি দাবি করলেন।

তা করতে পারেন?

করলেই হল! রোশেনারা আবার আসাদুল্লার ফোর্থ বেগম। আসাদুল্লা রোশেনারার সেকেন্ড হাজব্যান্ড। বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রোশেনারা কী একটা অবিশ্বাসের কাজ করেছিলেন— তাই নবাব আসাদুল্লা ওত পেতে থেকে রোশেনারাকে হাতেনাতে ধরেন। ধরেই গুলি করেন। বাঁ হাতে গুলি লেগেছিল। তাই সে হাতখানা কনুই থেকে কেটে বাদ দিতে হয়।

দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি তো সুরথ স্বয়ং মহাভারত। গল্পের ঢাকনা খুললে গল্প গলগল করে বেরিয়ে আসে।

আরে শোনই না। সবাই তাঁকে হাতকাটা রোশেনারা বলে কোটালপাহাড়ে। এক হাত দিয়েই তিনি চমৎকার পান সাজতে পারেন। আমি যখন তাঁকে দেখি— তখন তিনি ষাটের ওপর। ইস্ট পাকিস্তানে চলে যাবার সময় আসাদুল্লা তাঁকে ফেলে যান। মহিলাকে দেখলে মনে হত চল্লিশের নিচে।

খুব ট্রাবেল দিয়েছেন।

ট্রাবেল মানে! সুন্দরী মহিলা বাঙালি-বিহারি টেনশন তৈরি করে

দিলেন। আমি তখন ঘোষণা করলাম— আমি পুওর হিন্দু রেফিউজি ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান। একবার তো লুট আটকাতে শূন্যে গুলি চালালাম।

তুমি লকি সুরথ। আমার জীবনের অ্যাতো সব কিছুই ঘটেনি। খুব সাধারণ জীবন কাটিয়ে এসেছি। তোমার জীবনে পরতে পরতে ঘটনা। রহস্য। সংঘর্ষ। টেনশন। গুলি। নবাব। বেগম। মামলা। কত কি!

এসব কি খুব সুখের অম্বর?

শুধু এর ভেতর মন্দিরা বলে একটি মেয়ের ভালবাসা পেয়েছিলাম।

সে তো খুব ভাল।

কিন্তু টিকল না।

কেন? কেন?

তরুবালা হালদার ডিভোর্স দিল না।

ডিভোর্স কেন? দুজনকে বিয়ে একসঙ্গে কাটিয়ে দিতে। একটাই তো জীবন।

দুজনের একজনও রাজি হল না সুরথ। আচ্ছা — এত বছর মামলা করেছ -- তো টাকা লেগেছে অনেক।

তা তো লেগেইছে।

সংসার চালাতে হয়েছে।

তা তো হয়েইছে।

কোনও চাকরি করতে?

না-না।

তাহলে চালাতে কী করে?

বালিতে গভরমেন্ট আমাদের তেষট্টি বিঘে অ্যাকোয়ার করে নেয়। মামলা করে তার পঁচিশ বিঘা ছাড়িয়ে নিই।

আবার মামলা?

আমি চল্লিশ বছর মামলা করেছি। পাকুড় কোর্টে। কলকাতায় হাইকোর্টে গভরমেন্টের এগেইনস্টে। আবার শ্রীহট্টেও করেছি।

শ্রীহট্টেও।

হ্যাঁ। বাবা মারা গেলেন ইস্ট পাকিস্তানে। তিনি ওখানকার সিটিজেন। মা বেঁচে। মায়ের ওকালতনামা নিয়ে শ্রীহট্টের আদালতে নেমে গেলাম।

এত সব চালিয়েছ কী করে?

বালির জমিটার খানিকটা বিক্রি করেছি। কোটালপাহাড়ের ধান বিক্রি। কলকাতায় কোথায় থাক? বাড়ি করেছ?

নাঃ। নাইনটিন থার্টি ফোরে বাবা বালিগঞ্জ সার্কুলারে একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করেন। সেটাতেই থাকি কলকাতায় এলে।

তোমার গিন্নি? ছেলেমেয়ে?

ওরাও কলকাতায় ওই বাড়িতে থাকে। আমিই কোটালপাহাড়, ডুয়ার্স, আসাম করে বেড়াই। এবার শ্রীহট্ট যাব। চা-বাগানটা বেচে দেব। মালিকানা আছে?

ওই যে বাংলাদেশে সম্পত্তি ফেরত দিচ্ছে। ওখানে সুপরিম কোর্টের জাস্টিস মকবুল আমার পুরনো বন্ধু। মকবুল বলেছে, সুরথ এবার তুমি তোমার চা-বাগান বেচে দিতে পার। যা পাওয়া যায়।

নীলাম্বর কোনও কথা না বলে সুরথের মুখে তাকিয়ে থাকলেন। কী আশ্চর্য! কতরকম রঙের মানুষ। নীলাম্বরের চোখের সামনে ভাদৌড়ি কোঠি ভেসে উঠল।

নীলাম্বর অবাক হয়ে দেখলেন— তাঁর চোখের সামনে বিশাল কম্পাউন্ড ওয়ালের গায়ে গেটের মুখে কোঠি নয়—হিন্দিতে লেখা— ভাদৌড়ি হাবেলি। অনেকখানি জায়গার ওপর বাড়িটা। একটা দিক পড়ে গেছে। সেখানে বটের চারা। অশ্বত্থ। আর গেটে ছায়া করে দাঁড়িয়ে মহুয়া গাছ— ঝাঁকড়া মত। দু'পাশে দুটি।

নীলাম্বর হালদার দেখতে পেলেন, গাছপালার ছায়ার ভেতর তিনি নিজে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন। গায়ে খাকির উর্দি। হাফপ্যান্টের ভেতর হাফশার্ট। পায়ে পট্টি জড়ানো। বুটের নিচে শব্দ উঠছে রাস্তায়। মাথায় খাকির ছোট্ট পাগড়ি টুপি করে বসানো। সেই টুপির ভেতর দিয়ে পাগড়ির ডগা উষ্ণীষ হয়ে বেরিয়ে আছে। 'তাঁর দু'পাশে— পেছনে ছ-সাতজন পুলিস। তাদের হাতে বেঁটে বেঁটে বন্দুক।

ভাদৌড়ি হাবেলির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নীলাম্বর। এখন তিনি পুলিসের লোক। একজন সেপাইকে নীলাম্বর বললেন, যাও— অন্দর যাকে খবর কর— কোটালপাহাড় কোতোয়ালিকা, কোতায়াল সাহাব আয়া—

খবর পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে সুরথ ভাদুড়ি বেরিয়ে এল। পাজামার ওপর কালিদার। পায়ে মোকাসিন।

আপহি ভাদৌড়িজি?

জি. হ্যাঁ—কোতোয়াল সাহাব।

বড়ে মজেমে হ্যায় আপ ইস হাবেলিমে—

থা তো। মগর রোশেনারা বেগমনে জিনা হারাম কর দিয়া—

কোতোয়াল নীলাম্বর হালদার ভাল করে সুরথ ভাদুড়ির মুখ দেখলেন। সাতচল্লিশ বছর আগে কলেজের সেই মুখ আর নেই সুরথের। নীলাম্বর নিজেকে বললেন, আচ্ছা নীলাম্বর— আমি একই সঙ্গে কোটালপাহাড়ের কোতোয়াল— আবার সুরথের ক্লাসফ্রেন্ড নীলাম্বর হালদার। এই দুটো ব্যাপার একসঙ্গে হয় কী করে? আমি কখন কে হয়ে যাই— তার ঠিক কি?

হাঁটতে হাঁটতে কোতোয়াল নীলাম্বর হালদার ভাদৌড়ি হাবেলির ভেতর গেট ঠেলে ঢুকলেন। বেশ জায়গা মেপে বসানো সব সেগুন গাছ বড় হয়ে উঠেছে।

সুরথ বলল, থোড়া আরাম কিজিয়ে—

আপ রোশেনারা বেগমসে শান্তি সে কাম লিজিয়ে।

উহু শান্তি চাহে তো।

কোতোয়াল নীলাম্বর পলকে কলকাতায় নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। এ এক আশ্চর্য অবস্থা। এই তিনি শুধু নীলাম্বর। আবার পলকে তিনি অন্যরকম হয়ে যান। জীবনেও কোটালপাহাড়ে যাননি। অথচ সকালবেলা নিজের বাড়িতে বসে তিনি এক পলকে কোটালপাহাড় চলে গেলেন। সেখানকার কোতোয়ালির কোতোয়াল হয়ে গেলেন। নিজেকে তিনি মনে মনে বললেন, ভাগ্যিস কোতোয়াল হয়েছিলাম। তাই তো সুরথকে— কয়েক বছর আগের সুরথকে দেখতে পেলাম। দেখলাম—ভাদৌড়ি হাবেলি। কোটালপাহাড়ের রাস্তাঘাট। সেগুন গাছ।

তোমার সেগুন গাছগুলো বড় হয়েছে?

বড় মানে! রীতিমত বড়।

গাছের গুঁড়ি কেমন মোটা হল?

বেশ মোটা গুঁড়ি হয়েছে নীলু।

মেহগনি গাছগুলো?

মেহগনি ভাই অনেকদিন ধরে বড় হয়। অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে বড় হয়। তারপর ওরা শদেড়েক বছর ধরে মাটির গভীরে শেকড় চালিয়ে মাটির ওপরের ভারি শরীরটাকে সিধে— সটান রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

তাহলে একটা মেহগনি গাছ কতদিন বাঁচে?

কেউ ক্ষতি না করলে চারশ বছর তো একটা মেহগনি বহাল তবিয়তে থাকে।

তুমি কি তোমার মেহগনিদের অতদিন রাখতে চাও সুরথ?

ঠিক এইসময় আবার তরুবালা চা এগিয়ে দিলেন। তাঁকে থ্যাঙ্ক ইউ

বলে সুরথ জানালেন, মেহগনিদের আমি রাখার কে নীলু ! আমার জীবন ফুরিয়ে যাওয়া তো মেহগনিরাই দেখতে পাবে। ছেলে বড় হয়ে— বুড়ো হয়ে যদি কোনওদিন মেহগনিদের বিদায় দিতে চায় তো দেবে। তখন তো বাধা দিতে আমি থাকব না। মেহগনি, সেগুন— আসলে ছেলের ফিউচারের জন্যে ইনসিওরেন্স। বিপদে পড়লে— টাকার টান পড়লে ছেলে বেচতে পারবে গাছগুলো। একটা একটা করে।

যেমন আর কি তুমি তোমার বাবার করে যাওয়া জমিজমা নাড়াচাড়া করে চালিয়ে যাচ্ছ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর। মানে আধখানা শতাব্দী। আমি এই পঞ্চাশ বছরে বড় হয়েছি। যাকে বলা বুড়ো হওয়া— তাই হয়েছি। অবশ্য আমার ভেতর বুড়ো হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। তবু মানুষকে চলে যেতে হয়। ডাক্তারি ভাষায় যতই দিন যায়— মানুষের শরীরের ভেতরে ভেতরে ডিজেনারেশন হয়। মৃত্যু একটা অদ্ভুত জিনিস। ঠিক ওত পেতে থাকে। সময় হলেই সে তোমাকে তার কোলে তুলে নেবে। এইভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নতুন নতুন মানুষ সেসব জায়গায় এসে গেছেন। একটা মেহগনি গাছও মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে না। মৃত্যুর বয়স অনেক। তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে পাহাড়। সমুদ্র। সূর্যের আলো। চাঁদের জ্যোৎস্না। এইসব জিনিস সহজে হারায় না।

এসব কথা ভাবা যায়। মুখে তো বলা যায় না। নীলাম্বর মুখে বললেন, আচ্ছা সুরথ এমন কোনও যদি উপায় থাকত যে চাকা ঘুরিয়ে ১৯৫০-৫১ সনকে ফের সামনে নিয়ে আসতাম—

তাহলে ভাই মুশকিল হল। এই শরীর নিয়ে ফের বি এসসি ভর্তি হওয়া। সে বড় কঠিন কাজ হত।

কঠিন কেন ? বল সহজ। তোমার-আমার দুজনেরই মা-বাবা বেঁচে। সামনে নতুন পৃথিবী। এবার জীবন শুরু করতাম অনেক ভেবেচিন্তে। কোনও ভুল স্টেপ ফেলতাম না। সামনে কত আশা।

স্টেপ ফেলবে কি ! এখন তো পায়ে ব্যথা।

শরীরটাও তখনকার মত হয়ে যেত। আমাদের কারও বিয়ে হয়নি। পেট্রলের গ্যালন আড়াই টাকা। তুমি জলের মত তোমার মোটরগাড়ি চালাবে সুরথ।

এ ব্যবস্থা কি শুধু আমার আর তোমার জন্যে ফিরে আসত ? না সারা পৃথিবীর জন্যে ?

না-না। তা হয় কী করে? শুধু তোমার আর আমার জন্যে নাইনটিন ফিফটি ফিরে এসেছে ধর।

বাকি পৃথিবী কি তাহলে এখনকার সময়ে থেকে যাবে?

চিন্তিত হয়ে পড়লেন নীলাম্বর। সে তো ঠিক বলেছ। সবকিছু আজকের—আর তার ভেতর শুধু তুমি আর আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের সুবিধাগুলো পাচ্ছি—তাহলে তো সব জট পাকিয়ে যাবে। সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেড়ে যাবে।

মুশকিল তো সেখানেই নীলু। ধর বয়সটাও তখনকার ফিরে পেয়ে গেলাম। তারপর এখনকার স্মৃতি নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীতে ঢুকে পড়ে কিছুই মেলাতে পারব না।

নীলাম্বর বললেন, পঞ্চাশ বছর আগে জানতাম না— সামনে কী আছে। তখন শুধুই পথ হাতড়াচ্ছি। কোনদিকে যাব জানি না।

কিন্তু কত হাউস ছিল মনে। ভাবতাম— পারি না এমন কিছুই নেই জগতে।

এই পঞ্চাশ বছর যে বেঁচে থেকেছি—সেটাও কম কিছু নয়। এই সময়ের ভেতর কত কোটি কোটি নতুন মানুষ এল। কত ফুল ফুটে উঠে ঝরে গেল।

অম্বর। ভাই আমাদেরও ঝরে পড়ার সময় হয়ে এসেছে। নতুন ফুলকে তো ফোটার জায়গা দিতে হবে। আমরা তো অমর নই।

আচ্ছা সুরথ, তোমার পঁয়ষট্টি ঘরের ভাদৌড়ি হাবেলির যেসব ঘর পড়ে গেছে— সেগুলোর দশা কেমন?

সব খসে খসে পড়ছে। মাটি নিয়েছে কিছু ঘর। কিন্তু তুমি জানলে কী করে অম্বর রিসেন্টলি— আমি কোঠি কথাটা তুলে দিয়ে ঢালাই করে হাবেলি কথাটা বসলাম সুরথ।

এসে গেল মুখে তাই বললাম সুরথ।

আসলে সরফরাজ খাঁয়ের প্যালেস নবাব আসাদুল্লা খাঁয়ের হাতে পড়লে তিনি প্যালেসের নাম রেখেছিলেন— আসাদুল্লা মঞ্জিল। এক্সচেঞ্জ করে আসাদুল্লা মঞ্জিল বাবার হাতে এলে তিনি লোকাল ট্র্যাডিশনে বলতেন— ভাদৌড়ি কোঠি। একবার গিয়ে সিমেন্ট দিয়ে তিনি ভাদৌড়ি কোঠি কথাদুটো ঢালাই করে রেখে আসেন গেটের মুখে। কিন্তু কোঠি বললে প্যালেস বা মঞ্জিলের চেয়ে ছোট বোঝায়। বাবা ইস্ট পাকিস্তানে মারা গেলেন। আমি কোঠি কথাটা পালটে হাবেলি করে দিলাম।

তোমার ফ্যামিলি ওখানে থাকে না?

আগে বেড়াতে যেত। গত বিশ বছর আর যায় না। ছেলে বলে, বেচে দাও বাবা। আমি বলি— একটা অমন তৈরি কর। তারপর বিক্রি কর।

বিক্রি করে টাকাটা ফিক্সড করলেই তো ভাল।

তুইও বলছিস নীলু? বিক্রি করা সহজ। বানানো কঠিন। বিক্রির টাকা ফিক্সড করলে ব্যাঙ্ক কি আমাকে সেগুন গাছ বসাতে দেবে? মেহগনি বড় করতে দেবে? কাছাকাছি চাষে যে-ধান হয়— হাবেলি বেচে দিলে সে-ধান আর পাব না।

সকালটা নীলাম্বরদের বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশটা বছর চলে গেছে। তারপর সুরথ ভাদুড়ি উদয় হল। অবিশ্বাস্য। আমি মাঝখানে এই প্রায় পঞ্চাশ বছরে চাকরি করলাম, বিয়ে করলাম, একদিন বাড়ি কিনলাম, রিটায়ার করলাম— আবার প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নিলাম— তারপর ভাদৌড়ি হাবেলির সুরথ এসে হাজির।

পুরনো বন্ধুদের কথা মনে করে করে দুজনে বলতে লাগলেন। নীলাম্বর বললেন, সুকুমারের কথা। ছেলে দিল্লিতে ইঞ্জিনিয়ার। বউ কলকাতায় এক গার্লস কলেজে পড়ায়। সুকুমার সেরিব্রালে ভুগে ভুগে মারা গেছে। পিঠে বেডসোর হয়েছিল। পাইপ দিয়ে খাইয়ে দিতে হত। টেলিফোনের ওপাশ থেকে লীলা শেষে বলল, উনি মারা গিয়ে ভাল হয়েছে। বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন।

সুরথ বললেন, তপনকে মনে আছে। তপন শিকদার। চমৎকার স্বাস্থ্য। প্যাংক্রিয়াসে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ওদের ফ্যামিলি বাড়িটা পেয়েছিল। গরচায়। বড়ভাই চার্টার্ড। ও একা থাকে। দুই ছেলে। দোতলায় থাকা হয়। একতলা আর তিনতলায় ওর বউ আর্ট স্কুল করে। অনেক স্টুডেন্ট।

চল না একবার দেখে আসি।

যাব। তোর কমলকে মনে আছে? কমল ঘোষ। জি এস আই-এর ডি জি হয়ে রিটায়ার করেছে। খুব ক্লাব মাইন্ডেড। এখন ক্যালকাটা ক্লাব করে খুব মন দিয়ে।

ছেলেপুলে?

বড় ছেলে আরব এমিরিটাসে খবরের কাগজে বড় চাকরি করে। ছোট ছেলে খৈতানদের ম্যাকলিনে একজিকিউটিভ। মাঝেরটি মেয়ে। জামাই

জি এস আই-এ জিওলজিস্ট। খুব স্ট্যাটাস কনসাস।

কে ?

কমল।

তাই নাকি। স্বাধীন দেশে স্ট্যাটাস নিয়ে মাথা ঘামায় শুধু কিছু ব্যাকডেটেড লোক। কমল এরকম নাকি ? জানতাম না তো ?

॥ তিন ॥

টেলিফোনে পেয়ে গেলেন নীলাম্বর। আর আসছ না কেন সুরথ ?

ওপাশ থেকে কিছু ভারি গলায় সুরথ বললেন, দাঁতের মাড়ি ফুলেছে। মুখও ফুলেছে। কমলেই তোমার ওখানে যাব।

ওষুধ খেয়েছ ?

হ্যাঁ। ডেন্টিস্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে।

দিনে তিনটি করে তো ?

হ্যাঁ পাঁচদিনের। বড্ড দাম এক একটা ক্যাপসুলের। এক একটা সাড়ে এগার টাকার ওপর।

হাসালে সুরথ। লাখ লাখ টাকার প্রপার্টি হ্যান্ডেল কর তুমি। আর সাড়ে এগার টাকার ক্যাপসুলকে দামি মনে হচ্ছে!

গায়ে লাগে ভাই। অসুখ তো বড় একটা করে না।

শোন সুরথ। ক্যাপসুলে না কমে যদি গাল ফুলতে থাকে—তাহলে রোগটার নাম সেলুলাইটিস। একটুও দেরি না করে ডাক্তারকে বলবে—জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন দিন।

কী ইঞ্জেকশন ?

জেন্টামাইসিন। সেলুলাইটিসকে অ্যারেস্ট করতে এই ইঞ্জেকশন একদম মাস্ট। আমার হয়েছিল। আমি জানি।

বলতে হবে তো ডাক্তারকে। ছাড়ছি ভাই। মুখের ভেতর খুব ব্যথা করছে। কথা বলতে পারছি না।

ফোন নামিয়ে সুরথ দেখলেন, তাঁর ছেলে অশোক বেরচ্ছে। পেছনে পিঠের দিক থেকে ছেলেকে তাঁর লোক লোক লাগল। একমাথা চুল। ঘন। কালো। তার দিকে ফিরে তাকালে — সুরথ জানে — অশোকের মুখে একগাল দাড়ি। চোখে চশমা।

এই অবেলায় কোথায় বেরচ্ছ ?

একটু এয়ারপোর্টে যাব।

কেউ আসছেন?

হ্যাঁ। খানিক আগে ফ্যাক্সে খবর এসেছে। জার্মানি থেকে একজোড়া সেন্ট বার্নার্ড আসছে।

কঠিন হলেন সুরথ। একটি কুকুর বাড়িতে ঢুকিয়েছ। আর কোনও কুকুর আমি এ বাড়িতে ঢুকতে দেব না খোকন।

সেন্ট বার্নার্ড বড় হলে খুব বড় কুকুর। কিন্তু এখন ওদের বয়স মোটে দশ সপ্তাহ। এখনও ছোট সাইজেই আছে। মাস দুই রেখে পার্টিকে দিয়ে দেব।

এখুনি পার্টিকে দিয়ে দাও।

অশোক কোনও কথা বলছে না। বেরবার জন্যে ট্রাউজারের ঢোলা শার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে। কালো চাপ দাড়ি। মোটা, কালো গোঁফ। সে বলল, মা তো পারমিশন দিয়েছে।

তোমার মায়ের ঘরে রেখ তাহলে।

একজোড়া সেন্ট বার্নার্ডের পক্ষে মায়ের ঘর খুব ছোট বাবা।

কী দরকার? এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে সিধে পার্টিকে দিয়ে দাও। এবার পার্টিটি কে?

তুমি চিনবে না।

শুনি না কে? কে সেই ভাগ্যবান? কোথায় থাকেন?

ফোর্ট উইলিয়ামে। ইস্টার্ন এরিয়া কমান্ডারের জি ও সি — লেফটেনান্ট জেনারেল চিব।

একসঙ্গে দু'টোই নেবেন তিনি?

হ্যাঁ।

অবশ্য ফোর্ট উইলিয়ামে তো জায়গার কোনও অভাব নেই। সেন্ট বার্নার্ড বড় জাতের অ্যানিম্যাল বাবা। এদের রাখতে হলে অনেক জায়গা চাই। — বলেই অশোক বেরিয়ে গেল।

বাড়িটা সুরথের বাবা ভাড়া নিয়েছিলেন। সে অনেককাল আগের কথা। এই ধরনের বাড়ি এ রাস্তায় আর নেই। সেসব ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন সব বাড়ি উঠেছে — তাও বিশ বছর হয়ে গেল। একতলা-দোতলা মিলিয়ে সাতখানি ঘর। পুরনো কাযদার। জমাদার আসার রাস্তা বলতে বাড়ির পেছন দিকে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

সুরথ ভাদুড়ি ফোলা মুখ নিয়ে জানলায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, কালো

মেঘ একটা মাল্টিস্টোরিডের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। বেলা আড়াইটে-তিনটে। এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে।

তক্ষুনি সুরথ মনে মনে নিজেকে বললেন, আমার কোনও বন্ধু নেই। মানুষের কোনও বন্ধু থাকে না। সব মানুষ যত বয়স বাড়ে ততই সে একা একা নিজের কাজ করে। নিজের কাজ কী কী?

যেমন — দাড়ি কামানো, দাঁত মাজা, হাত দিয়ে মুখে খাবার পাঠানো, গা চুলকানো, রোদ-বৃষ্টিতে ছাতা তুলে ধরা। ফোন ধরা। ফোন করা। লেখা। বই পড়া। বই বন্ধ করা। চোখ খোলা। চোখ বন্ধ করা। পাশ ফেরা। চিঠি লেখা।

আরও একরকমের নিজের কাজ আছে। আমার বউ আমার ওপর নির্ভর করে। আমার ছেলেমেয়ে তাদের বিপদের সময় প্রথমেই আমার কথা ভাববে। বাবা! তাই— আমি যখন থাকব না— সেসময় এদের যাতে ভেসে যেতে না হয়— সেজন্যে কিছু কিছু কাজ করে যেতে হয়।

আমি এখন এই ধরনের কিছু নিজের কাজ করে যাচ্ছি। এই কলকাতায় স্কুল লাইফে মনে হত কত বন্ধু। বাবা টাঙ্গাইল, শ্রীহট্ট থেকে এসে ঘুরে যেতেন। বাবা আসার আনন্দটা আমি যেন কৌটোয় মজুত করে রাখতাম। কলেজে পড়ার সময় বাবা একবার ইস্ট পাকিস্তান থেকে এলেন। এসে বললেন, একটা গাড়ি কেনো। টাকাটা আমি দিচ্ছি। কিন্তু ধার হিসেবে। মনে রেখ সে কথা। আয় করে টাকাটা আমাকে ফেরত দিও।

বাবার পরিস্কার ইচ্ছে ছিল— ছেলে যেন কলেজে পড়ার সময় ক্যাপ্তেনি না করে— কিন্তু অবশ্যই নিজের গাড়ি নিজে চালিয়ে কলেজে যাবে।

সন্ধেবেলা বাড়ি খুঁজে খুঁজে নীলাম্বর হালদার এসে হাজির। টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় করে। কেমন আছ দেখতে এলাম সুরথ।

ব্যথা তো কমেনি। মোটে দুটো ক্যাপসুল পড়েছে।

কাল বিকেলেও যদি দেখ— কমেনি— তাহলে ইঞ্জেকশন নেবে সুরথ।

সুরথ মাথা নাড়লেন। কোনও কথা নেই মুখে। নীলাম্বর বাড়ির ঘরদোর দেখছিলেন। অত টাকার প্রপার্টি নাড়াচাড়া করে সুরথ। কিন্তু সেই আন্দাজে কোনও বাড়াবাড়ি নেই। না আসবাবে। না বিছানাপত্তরে। তবে দেওয়ালে পেইন্টিং।

কার আঁকা ছবি সুরথ?

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের। বাবা কিনেছিলেন। তাও ষাট বছর আগে। বেশিরভাগ ছবি এখন কোটালপাহাড়ের বাড়িতে।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। তরপর সুরথই আস্তে আস্তে বললেন, কোটালপাহাড়েই আমার বাড়ি। এটা তো ভাড়াবাড়ি। কলকাতায় একটা আস্তানা রাখতে হয় তাই।

ছেলেমেয়ে কোথায় ?

ছেলে এয়ারপোর্টে কুকুর রিসিভ করতে গেছে। মেয়েকে নিয়ে মা কোচিংয়ে গেছে। ফেরার পথে মা-মেয়েতে কেনাকাটা করে ফিরবে।

আবার চুপচাপ। শেষে সুরথ বললেন, তুমি না বলছিলে—চাকা ঘুরিয়ে ১৯৫০ সালে চলে যাওয়ার কথা—

হ্যাঁ।

গেলে কিন্তু মন্দ হয় না। আমাদের প্রথম যৌবনের রাস্তাঘাট। কলেজ। বন্ধু-বান্ধব। স্বপ্ন। সবই সেখানে পড়ে আছে অম্বর।

দেখ সুরথ— আমার এক বন্ধু— তুমি চিনবে না— পশুপতি গুহরায় বলেছিল— আমরা কথা বলতে না পেরে যে কথাগুলো মনে মনে নিঃশব্দে ভাবি— সেই আনটোল্ড কথারাই আসল কথা।

সাইলেন্স হল গিয়ে আসল কথা। বিশেষ করে যৌবনের স্বপ্নে। প্রেমে। ভালবাসায়। তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ ?

না ভাই। বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়সে পরে বিয়ে করেছিলাম। বউকে ছাড়া আর কাউকে আমার ভালবাসা হয়নি।

আমি দীর্ঘদিন বউকে ভালবেসেছি। তারপর অনেক পরে একটি মেয়েকে ভালবেসেছি।

বললে তো তার কথা। ভালবাসা ভাল জিনিস অম্বর।

হ্যাঁ। ভালবাসা হলে মনে হয় আমার কেউ আছে। আমার কোথাও যাওয়া আছে। আমি গেলে সেখানে আনন্দ পাব।

যাও না কেন, আমার তো ওসব নেই। আমি পুরনো বন্ধুদের খুঁজি। সেখানে যাই। একজনের কাছে যেতে হবে। তপন শিকদার।

ক্যানসার হয়েছে বলেছিলে। বাড়িটা চিনি আমি। একবার ঘুরে আসতে হবে।

দুজনে যাব নীলু। গেলে খুশি হব। আবার কমল ঘোষের ওখানেও যেতে হবে। কিন্তু বড্ড স্ট্যাটাস নিয়ে মাথা ঘামায়। ওর কাছে গেলে

বাতাসটা কেমন ভারী হয়ে যায়। দম বন্ধ লাগে।

এমন কেন হয়ে গেল কমল?

দেখ অম্বর। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে পড়াশুনো করে খেটে কমল বড় চাকরি পেয়েছিল। ভাইপোকে আর্মির লেফটেনান্ট কর্নেল করেছে। স্ট্যাটাস নিয়ে মেতে থাকে কমল— তার কারণ পুরনো সেই সাধারণ অবস্থাকে ভয় পায়। একদম রিলাক্স করতে পারে না। শুধু ক্লাবের মিটিং করে। পার্টি দেয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে নিশ্চয়। পাছে সেই আগের অবস্থায় গিয়ে পড়ে।

আমার তো ভালবাসতে ইচ্ছে করে। মন্দিরাও আমাকে খুব ভালবেসেছে একসময়। আমাদের বয়সের ডিফারেন্সটা সে-ভালবাসায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ও জেদ ধরেছিল— তরুবালাকে ডিভোর্স করতে হবে।

এতদিনকার বউ তরু বৌঠান— তাকে ডিভোর্স করবি কী করে? তিনিই বা এই বয়সে কাকে নিয়ে থাকবেন?

তরু ডিভোর্স দিলে আমি তাকে বউয়ের মতই দেখতাম। কোনও অযত্ন হত না। ওই বাড়িটা তার। তরু ওখানেই থাকত। টাকা-পয়সার কোনও অভাব হত না। শুধু আমি চলে গিয়ে মন্দিরার সঙ্গে ঘর বাঁধতাম।

কিন্তু তরু একা থাকত কী করে?

আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম।

যখন চলে আসতিস— তখন তরুর কেমন লাগত? সেটা ভেবেছিস নীলু?

নিত্যানন্দ ভোজনালয়ের পাশেই তপনদের তেতলা বাড়ি। সুন্দর গেট। বাড়িটা আগাগোড়া স্নোসেম দিয়ে রঙ করা। বিকেলের বৃষ্টি ধোয়া রোদে সারাটা বাড়ি চকচক করছে।

নীলাম্বর হালদার একাই তপন শিকদারের বাড়ি চলে গেলেন। বাড়িটার গায়ে একটা আর্ট স্কুলের নামে সাইনবোর্ড লাগানো। একজন যুবক বেল টিপতেই বেরিয়ে এল।

তপন আছে?

বাবা তো অসুস্থ। শুয়ে আছেন।

জানি। আমি তোমার বাবার সঙ্গে পড়তাম। কলেজে। দেখা করতে এসেছি।

আসুন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে নীলাম্বর একতলার দেওয়ালে ছবিগুলো একঝলক দেখতে পেলেন। সাজানোগোছানো বাড়ি। টিপটপ। কিন্তু নিঃশব্দ।

তপন শুয়েই ছিল। উঠে বসার চেষ্টা করল। নীলাম্বর বললেন, আমি নীলাম্বর হালদার। বসতে হবে না। শুয়েই থাক। আমি তোমার সঙ্গে কলেজে পড়েছি।

তপন বললেন, নামটা মনে পড়ছে। চেহারা তো বদলে গেছে তোমার এত বছরে। আগের চেহারা তোমার মনে করার চেষ্টা করছি।

বলে দিচ্ছি একটা ঘটনা। তাহলে তপন আমাকে তোমার মনে পড়বে। সুরথ ভাদুড়িই তোমার কথা আমাকে বলল। ও আসত। কিন্তু খুব ভুগছে।

ওঃ! সুরথ। ও ফোন করেছিল। ও খোঁজ করে গত বিশ বছর মাঝে মাঝে।

তোমার মনে আছে কি না জানি না তপন— কলেজে ১৪ নম্বর ঘরে ম্যাথমেটিক্সের ক্লাস হত। ঠাসাঠাসি করে বসতাম সবাই। সেই সময় ম্যাথমেটিক্সের যামিনী স্যার তোমাকে আর আমাকে একদিন বোর্ডে ডেকে সবার সামনে অঙ্ক করতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ। মনে আছে।

তুমি পেরেছিলে তপন। আমি পারিনি।

ওঃ! তখনকার জীবন— সব ছেলেমানুষিতে ভর্তি। কে পারল— আর কে পারল না— সে কোনও বড় কথা নয়!

আমার বিশেষ করে মনে আছে তপন— কারণ, আমাকে যামিনী স্যার খুব আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছিলেন। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এবার মনে পড়ছে। তোমার চেহারাটা মনে ভাসছে। তুমি ছিপছিপে ছিলে। এখন মোটা হয়ে গেছ নীলাম্বর।

তুমি আমাকে নীলু বলে ডাকতে।

তাই ডাকব। অনেকদিন অভ্যেস নেই তো। এই দেখ না— তখন কী জানতাম— একদিন আমার ক্যানসার হবে। জানলে বিয়েই করতাম না। এখন আমার জন্যে ওরা কষ্ট পাচ্ছে।

ওরা মানে— নীলাম্বর দরজায় তাকিয়ে বুঝতে পারলেন। তপনের বউ দাঁড়িয়ে। পাশে সেই ছেলেটি। তপনের স্ত্রী নীলাম্বরের চোখে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন।

নীলাম্বর ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, বড় ছেলে?

তপনের বউ বললেন, না। ছোট। বড়জন চাকরিতে ঢুকেছে। হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজে ইকনোমিক্স পড়ায়। ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়।

শুয়ে শুয়েই তপন ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও চাটার্ড পড়ছে— দাদার ফার্মেই।

নীলাম্বর বললেন, তোমার দাদা আমাদের কলেজ লাইফেই চার্টার্ড শেষ করে এনেছিলেন।

হ্যাঁ। দাদা চার্টার্ড ফার্ম করেছেন অনেকদিন হল। বাড়ি করে উঠে গেছেন। এ-বাড়িটা আমাকেই দিয়ে গেছেন। আমরা তো দু'ভাই।

তোমার স্ত্রী তো ছবি আঁকেন।

হ্যাঁ। মনীষা ছবি আঁকার স্কুল খুলেই সংসার চালিয়ে দিচ্ছে। আর্ট কলেজ থেকে পাস করেছিল। আমি তো দেড় বছর হল কোনও কাজ করি না। শুয়েই থাকি। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ছবি আঁকার স্কুলটা করেছিল।

মনীষা এগিয়ে এসে তপনের পিঠের নিচে একটা বালিশের ঠেসান দিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, এত চিন্তা করছ কেন? তোমার তো চিকিৎসা হচ্ছে।

তপন শুকনো মুখে বললেন, হ্যাঁ। ডাক্তার বলছেন অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু প্যাংক্রিয়াসে ক্যানসার তো ছড়াবেই। আমি প্রথম জীবনে মেডিকেল রিপ্রেজিন্টেটিভ ছিলাম। আমি জানি।

তুমি তো ভাল চাকরিই করতে।

ভাল আর কি! নামী কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার অব্দি উঠেছিলাম। তা সে তো ছেড়ে দিতে হল।

তোমার চেহারাটা বড় সুন্দর ছিল তপন। আমরা তাকিয়ে থাকতাম। কী ব্রাইট চেহারা!

সে বাদ দাও। এখন আর চেহারার কী আছে! প্রতি মাসেই ওজন কমছে।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই ঘরে। বর্ষাকালের সন্ধে হয়ে আসছে। নীলাম্বরদের স্টুডেন্ট লাইফে এইসব রাস্তায় সন্ধ্যেবেলায়—'চাই ডালপুরি'—বলে হাঁক দিয়ে ফেরিওয়ালা কাচের বাক্স মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেসব খাবার উঠে গেছে কবে। সেইসব ফেরিওয়ালা—তাদের কাচের বাক্স যেন কুয়াশার ভেতর আবছামত—অনেক দূরে—মিলিয়ে যাচ্ছে মনে হয়।

জীবন শুরুর সময় এসব বোঝা যায় না। মাথায় আসেও না।

জান তপন। একটা কথা আমার খুব মনে পড়ছে। মনে আছে কি তোমার—একবার কলেজের গেটের সামনে স্ট্রাইক নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছিল? আমি ছিলাম। তুমি ছিলে। কলেজ টিমের গোলকিপার নাণ্টা ঘোষ ছিল। সে হঠাৎ লাথি মেরে বসল তোমাকে। খুব রগচটা ছিল নাণ্টা। কিন্তু আমার সাপোর্টার ছিল। তুমি ভাবলে—আমার কথায় নাণ্টা তোমায় লাথি মেরেছে—

ভেবেছিলাম নাকি? আজ আর মনে নেই।

সেদিন থেকে আমি কিন্তু তোমার কাছে অপরাধী হয়ে আছি। তুমি—তোমার বন্ধুরা মনে করেছিলে— আমার তাতানিতেই রগচটা নাণ্টা তোমায় লাথি মেরে বসে।

কিচ্ছু মনে নেই ভাই। এত আগের কথা নীলাম্বর।

আমি কোনওদিন তোমাকে বলতে পারিনি। বলার সুযোগ পাইনি। মনে মনে গুমরে মরেছি তোমাকে বলার জন্যে—

আমি কিচ্ছু মনে রাখিনি। সব ভুলে গেছি অম্বর। আজ ক্যানসারের সামনে দাঁড়িয়ে ওসব কথা তুচ্ছ। ভাব তো একবার-- ক্যানসার কত বড় জিনিস। সে কারও দিকে তাকায় না। নিজের কাজ করে যায়। শুধু ছড়িয়ে যায়। সারা শরীরে।

সেজন্যেই তো আজ আমি আরও বলতে চাই। পরিস্কার হতে চাই তোমার কাছে। সেদিন আমি নাণ্টাকে বলিনি— এই নাণ্টা তপনকে লাথি মার। ও যখন ধাঁই করে তোমার গায়ে লাথি কষাল— আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আটকাতে গেলাম।

হ্যাঁ। আমি ফুটপাতে পড়ে গিয়েছিলাম।

সবাই ভাবল— আমিই তোমাকে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু আমি তোমাকে ফেলে দিতে চাইনি। আসলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে নাণ্টাকে আটকাতে গিয়েছিলাম। যাতে না ও আবার তোমার গায়ে হাত দিতে পারে।

আমি তো সব ভুলে গেছি।

আসলে তপন আমি তখন ভেতরে ভেতরে তোমার চেহারা— কথা বলার ভঙ্গি— তেজিভাবের ভীষণ অ্যাডমায়ারার—

বাদ দাও তো—

না। আজ আমাকে বলতে দাও। তোমাকে কোনওদিন বলতে পারিনি। আমি গোপনে তোমার কথা ভাবতাম সবসময়। যদিও আমি

এস এফ করি। তুমি ফরোয়ার্ড ব্লক। কলেজে স্ট্রাইক নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল ছিল না। কিন্তু আমি তো গোপনে তোমার ভক্ত তখন।

তাই বুঝি! আমি তখন কিছুই বুঝতে পারিনি নীলু। ওসব ভুলে যাও।

আমি কখনওই নাণ্টাকে বলিনি— তপনকে মার। রগচটা নাণ্টা নিজের থেকেই—আজ আমাকে বলতে দাও তপন।

নীলাম্বর হালদারের গলা বুজে এল।

তপন বললেন, আজ আমি চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারছি না।

হঠাৎ তপনের বউ বলে উঠলেন, ও কি? আপনি কাঁদছেন? এই দেখুন! কী ছেলেমানুষি বলুন তো। কবেকার স্টুডেন্ট লাইফের কথা। কেউ মনে করে রাখে নাকি নীলাম্বরবাবু? — আসুন। চেয়ারটা সরিয়ে পাখার নিচে বসুন।

ঘরে কোনও কথা নেই। তপন শিকদার ভারি চশমা চোখ থেকে খুলে মুছতে লাগলেন। এই অসুখের ভেতর তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেছে। তিনি নীলাম্বরের মুখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, তুমি না— একটা....হাসালে।

আসলে তপন আমি তখন তোমায় খুব ভালবাসতাম। গোপনে। ভীষণ ভালবাসতাম।

॥ চার ॥

বেলা ন'টার সময় মিলিটারি পুলিসের জলপাই রঙের একটা জিপ এসে সুরথ ভাদুড়ির বাড়ির সামনে দাঁড়াল। মাথায় পাগড়ি বাঁধা ভীষণ স্মার্ট দুই পুলিস— গায়ে মিলিটারির উর্দি— পায়ে ভারী বুট— সেই জিপ থেকে লাফিয়ে নামল। তাদের একজনের হাতে একখানি কাগজ। সে কাগজ দেখে। ফুটপাত ধরে হাঁটে। আর এক একটা বাড়ির নম্বর চেক করে। পাশে তার সঙ্গী। তাদের বাঁ হাতে কাপড়ের পটিতে বড় করে লেখা দুটি ইংরেজি হরফ— এম পি।

সুরথ ভাদুড়ি একতলায় বসে শ্রীহট্টের বানিয়ারঙ্গ চা-বাগানের কাগজপত্র দেখছিলেন। ১৮৭০ সনে রবার্ট নামে এক ইংরেজ ওখানে

প্রথম চা গাছের নার্সারি বেড তৈরি করেন। খুব অ্যাডভেনচারাস লোক ছিল রবার্টস। সে ফার্স্ট বার্মা ওয়ারে গিয়েছিল।

ঠিক এইসময় দরজায় বেল বেজে উঠল। সুরথ ভাদুড়ি দরজা খুললেন। খুলে দেখেন— সামনে দুই মিলিটারি দাঁড়িয়ে।

অশোক ভাদুড়ি ?

হ্যাঁ। আমার ছেলে।

একজন মিলিটারি এগিয়ে এসে বলল, কিল্লামে যানে পড়েগা—

কিল্লা শুনে ঘাবড়ে গেলেন সুরথ ভাদুড়ি। কিল্লা যে ঠিক কী তা তখনি তাঁর মাথায় এল না।

পেছনে দাঁড়ানো মিলিটারি বলল, ফোর্ট উইলিয়ামে জেনারেলসাব বুলায়া—

ওঃ ! দাঁড়ান। ডেকে দিচ্ছি।

সুরথ একতলায় বসে শ্রীহট্টের বানিয়ারঙ্গ চা-বাগানের কাগজপত্র দেখছিলেন। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে দেখলেন -- তাঁর ছেলে অশোক ভাদুড়ি খুব মন দিয়ে বাড়ির কুকুরটির গলা চুলকে দিচ্ছে।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোমার ডাক এসেছে—

অশোক উঠে দাঁড়াল। লেফটেনান্ট জেনারেল চিব ফোন করেছেন ?

না। তিনি তোমার জন্যে দু'জন মিলিটারি পুলিস দিয়ে জিপ পাঠিয়েছেন।

ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গলাতে গলাতে অশোক নিজেই বলল, একটা সেন্ট বার্নার্ডের পেট খারাপ ছিল। হয়ত কেল্লার জল পেটে সহ্য হচ্ছে না।

হু হু করে ছুটে এসে জিপ ফোর্ট উইলিয়াম লেখা গেট দিয়ে ভেতরের ঢুকল। গঙ্গার দিক থেকে গাছপালা দোলানো হাওয়া। জেনারেলের বাড়িটি দোতলা। সামনে একটি কামান বসানো।

ঢিলেঢলা উর্দি গায়ে এক শিখ বহুদূর দিয়ে একটি বড় লাউ কাঁধে কেল্লার ভেতরকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। সারাটা কেল্লার মাঠ, বাড়ি, ঘরদোর, অফিস বাড়ি, রাস্তাঘাট—বাকি কলকাতার চেয়ে বেশ অনেকটা নিচে। ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে গঙ্গা থেকে কেটে আনা চওড়া বাঁধানো নালায় নদীর জল। কুচকাওয়াজের মাঠ। বাকি কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা নিচে আরেকটা মিনি শহর।

অশোককে লেফটেনান্ট জেনারেল চিবের বাড়ির বারান্দা অব্দি এগিয়ে

দিয়ে মিলিটারি পুলিস দুজন যেভাবে পিছিয়ে ফিরে গেল—তাতে অশোকের মনে হল—জেনারেল চিব যেন ওদের কাছে একটি আতঙ্কবিশেষ।

পরিষ্কার, চওড়া, ছিমছাম ঢাকা বারান্দায় অশোক কয়েক পা এগিয়েই দেখতে পেল— চিব ঘরের ভেতর থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছেন। পুরো ইউনিফর্ম গায়ে। বুকের কাছে অনেকগুলো নীল, লাল রিবনের লাইন। পেছনে বিশাল অফিসঘরে টেবিলের ওপর জেনারেলের কার্নিশ দেওয়া টুপিটি পড়ে আছে।

সাদা-কালো পাকানো গোঁফের নিচে হাসি। সেন্ট বার্নার্ড দুটি তাঁর দুই বগলে। হ্যালো ভাদুড়ি। দে আর নট ড্রিঙ্কিং দেয়ার মিল্ক। হোয়াট টু ডু ?

অশোক জেনারেল চিবের বগল থেকে সেন্ট বার্নার্ড দুটিকে নামিয়ে নিয়ে বারান্দায় ছেড়ে দিল। একদম বড় সাইজের উলের বল। প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোনও শব্দ নেই। কোথায় ইউরোপ। আর কোথায় ফোর্ট উইলিয়াম।

জেনারেল চিব বললেন, আই থিঙ্ক দে আর হোমসিক।

অশোক বাংলাতেই বলল, তা তো হবেই একটু।— শেষে হিন্দিতে বলল, হো সাকতা—

দে আর রিমেমবারিং দেয়ার মাদার—

মে বি ব্রাদার্স অলসো।

অশোকের একথায় জি ও সি ইন সি—ইস্টার্ন কমান্ড লেফটেনান্ট জেনারেল চিব বললেন, চেঞ্জ অব অ্যাটমোসফেয়ার ও দোনো বরদাস্ত নেহি কর পায়ে। দে কাম ফ্রম নর্থ জারমানি। দোজ আর দ্য হিলি এরিয়াস—

অশোক বলল, ভেরি কোল্ড অলসো।

দেন মিস্টার ভাদুড়ি— ইয়ে দোনো কো ম্যায় হামসফর লে যায়েঙ্গে।

কাঁহা যা রহে হ্যায় আপ ?

আই উইল গো টু ফরোয়ার্ড এরিয়াজ। হিলি আউর বহুৎ ঠাণ্ডা এরিয়া। ইয়ো দোনো কো সুট কর যায়েঙ্গে। মিল্ক বাগারয়া বাগারয়া কুছ ভি খাতা নেহি।

অশোক দেখল সেন্ট বার্নার্ড বাচ্চাদুটো বারান্দা জুড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সে চারদিকে চোখ তুলে তাকাল। গড়খাই। চাতাল। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া রাস্তা। রাস্তার একদিকে ইতিহাসের দুর্গের মত দেওয়াল উঠে

গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে বলল, ফোর্ট উইলিয়াম তো ইতিহাস।

লেফটেনান্ট জেনারেল চিব এই বাহান্ন-তিপ্পান্ন হবেন। তিনি অশোককে চারদিক তাকাতে দেখে বললেন, দিজ ইজ এ ফোর্ট। মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড। ইউ ক্যান গো অ্যারাউন্ড অ্যান্ড সি ফর ইওরল্ফে। আই উইল গিভ ইউ টু এসকর্টস টু অ্যাকমপ্যানি ইউ।

অশোক একদম অন্যকথা বলল। সে এখানে কয়েকবার এসেছে। জেনারেল কুকুর ভালবাসেন। কুকুর নিয়ে মাথা ঘামান। অশোক তাঁকে কুকুর দেখাশুনোর অনেক টিপস দিয়েছে। জেনারেল তা মন দিয়ে শুনেছেনও। অশোক বলল, ইয়ে দোনো বেবিকো খেলকুদ করনা চাহিয়ে। ওরা খেলাধুলো করলে তবেই ওদের খিদে পাবে। বড় জাতের কুকুর তো।

দেখা গেল, জেনারেল বাংলা খানিকটা বোঝেন। তিনি বললেন, দেন লেট দেম প্লে হেয়ার।

ঠিক এইসময় মিসেস চিব এলেন। শাড়ি পরা। তিনি এসেই অশোককে বললেন, হোয়াই নট জয়েন আস অশোক—

অশোক ঠিক বুঝতে পারল না।

মহিলা বললেন, আও বেটা। থোড়া চায়েকা ইন্তেজাম হুয়া—

দু'খানা প্রায় হলঘর পেরিয়ে তবে খাবার জায়গা। সে জায়গাও বেশ বড়। তিনজন শুয়ে থাকা যায় এমন টেবিল। টেবিলের তলা থেকে বাড়ির কুকুরটি বেরিয়ে এসে অশোকের কাছে গলা বাড়িয়ে দিল। সে অশোককে চিনে রেখেছে। অশোক তার গলা চুলকে দিল বাঁ হাত দিয়ে। কালো রঙের কুকুরটির লালচে চোখ। সেই চোখে ভাল লাগার ভঙ্গি। জেনারেল আর তাঁর স্ত্রী তাকিয়ে আছেন। সব মিলিয়ে যেন একটি ছবি আঁকার বিষয়। দূরে গঙ্গার দিক থেকে এই সকালবেলায় ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। তার ভেতর একখানা জাহাজ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।

পশুপতি গুহরায় সকালবেলা কিছু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠেন। খুব পিনিধানী মানুষ। নন্দনা বহুদিন মর্নিং স্কুল করেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে পৌঁছতে হত স্কুল বসার আগে। সবসময় ঘুম ভেঙে যাওয়ার একটা অস্বস্তি চোখে লেগে থাকত। রিটায়ার হয়ে যাওয়ার আগেই স্কুল থেকে রিটায়ার করে

এখন বেশ কিছুদিন ঘুম পুরো হলে তবে বিছানা থেকে ওঠেন নন্দনা। চা করে পশুপতিকে ঘুম থেকে তোলেন। চাপা গলায় বলেন, চা হয়ে গেছে—

একবার ঘুম থেকে উঠে গেলে—পশুপতি রীতিমত হালকা-পাতলা মানুষ—চরকির মত কাজ করতে থাকেন। বর্ষা চলে গিয়ে রোদ নরম হয়ে এল। চা খেয়ে ঘড়িতে দেখলেন সওয়া আটটা। বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামলেই বাজার।

ব্যাগ হাতে তিনি বাজারে গেলেন। দুজনের জন্যে বাজার করতে ইচ্ছে করে না তাঁর। একটিই মেয়ে। বিয়ে হয়ে চলে যাওয়ায় বাজার করার আনন্দই কেমন ফুরিয়ে গেছে।

এটা-ওটা কিনে বাজার থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন পশুপতি। দেখলেন, একখানি জরিপাড় শাড়ি পরে আর কেউ নয়—শিখা বসে আছে।

চমকে উঠলেন পশুপতি। এ কি ? তুমি ?

শিখা কোনও কথা বলল না।

ওপরে খাবার টেবিলে বাজার নামিয়ে রেখে পশুপতি একবার রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। নন্দনা কেটলির ভেতর থেকে চায়ের সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পাতাগুলো বের করছেন। জানলার তাকে টবের নয়নতারার গোড়ায় দেবেন। ভাল সার হয়।

কোনও শব্দ না করে গায়ের হাফ সোয়েটারটা খুলে আলনায় রাখলেন পশুপতি। নতুন নতুন শীত পড়ছে। সকালে সোয়েটার লাগে। বেলা বাড়লে গা কুটকুট করে। ট্রাউজারের ওপর সুতির মোটা পাঞ্জাবিটাই যথেষ্ট। একথা মনে মনে বলে নিচে নেমে এলেন পশুপতি।

চল। বসে কেন ?

কোনও কথা না বলে শিখা উঠে দাঁড়াল। পশুপতি দেখলেন, ফ্ল্যাটবাড়িতে সিঁড়িতে বসে থাকায় শিখার শাড়ির জরিপাড়ের শক্ত শক্ত জায়গা দুমড়ে-কুঁচকে গেছে। মাথার চুল আঁচড়ায়নি। কাল রাতে বালিশে-মাথায় বেণীটা গোছের জায়গায় অনেকটা থেঁতলে গেছে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চেতলা ব্রিজ। শীত আসবে বলে বাতাস উল্টোমুখো বইছে। তাই দু'জনে মাথা নামিয়ে নিচে আদিগঙ্গা দেখতে দেখতেও শ্মশানের কোনও গন্ধ পেল না। বাঁ দিকে ব্রিজের নিচের রাস্তায় বাস্তুহারা বাজারে ভিড়। বড় বঁটিতে বড় কাতলা কাটা হচ্ছে। বাজার ছাড়িয়ে মৃতের জন্যে ফুলমালা, তোড়া। কালচে সবুজ দেবদারু পাতার

ভেতর সাদা ফুল। দুই লাইনে সারি সারি মোটরগাড়ি।

পশুপতি চাপা গলায় জানতে চাইলেন, চলে এলে যে—

শিখা চোখের চশমাটা ঠেলে নাকের ঠিক জায়গায় রাখলে, দেবব্রত ভোরে অফিসের ট্যুরে বেরিয়ে গেল। ফ্ল্যাটের দোরে চাবি দিয়ে চলে এলাম।

চুরি হয়ে যাবে সব।

নাঃ। ফ্ল্যাটবাড়িতে সবাই সবসময় ওঠানামা করছে। চুরি করবে কী করে?

তুমি জানো না শিখা। চোর তক্কে তক্কে থাকে। তোমাদের বিয়ের পর কেনা শখের জিনিসপত্তর চুরি গেলে দেবব্রতবাবুর—তোমার গায়ে লাগবে।

শিখা অনেকক্ষণ পরে বলল, নিলে নেবে। আছে তো একটা কালার টিভি। একটা টু-ইন-ওয়ান। নিলে নেবে। ওসব চলে গেলে কী হয়?

একথা জানতে চেয়ে চোখ তুলে তাকাল শিখা। পশুপতি দেখলেন, আগের চেয়ে শিখার মুখখানি অনেক ভরাট হয়েছে। বড় বড় চোখ। দেবব্রত নিশ্চয় ক'দিনের জন্যে ট্যুরে বেরবার আগে শিখাকে সোহাগ করে কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছে। দু বছর হল বিয়ে হয়েছে। শিখার বাঁ চোখটি একটু যেন ব্যথা পাওয়া গোছের। কিছুটা লাল হয়েছে। মণির নিচে ঘোলাটে সাদা জায়গায় একটি রেখা স্পষ্ট হয়ে চোখটা লাল করে দিয়েছে।

কিনতে তো টাকা লাগে। দেবব্রতর তো কষ্ট করে আয় করতে হয়।

শিখা ফের জলের দিকে তাকিয়ে। এই বোধহয় বড় গঙ্গা থেকে জোয়ারের জল এল। নিচে হোগলার ছই ঢাকা ডিঙি নৌকোটা দুলে উঠল।

কাল রাতে ঘুমোওনি?

শেষরাতে যা একটু—

পশুপতি দেখলেন, শিখা মুখই তুলছে না। এই দু'বছরে শিখার হালকা-পাতলা গড়ন বদলে গেছে। বিয়ে হওয়ার পরেও শিখা আর কতদিন পুরনো প্রেমের স্মৃতি আঁকড়ে থাকবে? পশুপতি লক্ষ্য করে দেখলেন, শিখার জন্যে তাঁর নিজের ভেতরকার প্রেমিককে তিনি জাগাতে পারছেন না। বরং মনে হচ্ছে—শিখার এইসময় ঘুম দরকার। চোখ বুজে শুয়ে থাকা দরকার। মাথা আঁচড়ে একখানা পাটভাঙা শাড়ি পরলে দেবব্রতর

বউ বউ দেখাবে। এইসব ভাবনা একজন কাকা, বাবা, জ্যাঠামশায়ের ভেতরেই কাজ করে।

আবার একই সঙ্গে খুব সরু সুতো হয়ে পশুপতির মনে ঢুকে পড়ে একটি ছবি। কী আনন্দ করে বৃষ্টির ভেতর ভিজতে ভিজতে শিখা আর তিনি ফুটপাতের গায়ে কফি হাউসে ঢুকে পড়লেন। ছবিটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে। কফি হাউসের ভেতর দুপুরবেলাতেই আলো জ্বেলে দিতে হয়েছে। বাইরে আকাশ কালি করে মেঘ। সেদিন যেন মেঘ ফুটো হয়ে বৃষ্টি পড়ছিল।

শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে শিখা বলল, গরম কফি নাও। সেই সঙ্গে চিকেন ওমলেট। আর কড়া করে ভাজা মাখন টোস্ট তো তোমার খুব পছন্দ।

পশুপতির মনে হল—এইমাত্র তিনি একটা খুব নিরাপদ পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছেন। এখানে যেন পশুপতির বয়স ফের তেত্রিশ হয়ে গেল।

পশুপতি মুখে বললেন, চল যাই। সেখানে যাই।

তখনও শিখা ব্রিজের ওপর দিয়ে নিচে আদিগঙ্গায় তাকিয়ে। ব্রিজটা চেতলার দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়ার সময় লাগোয়া বাড়িগুলোর দোতলা সমান উঁচু। সেরকম এক দোতলায় একজন ঘরের বউ ভিজে কাপড় মেলতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পশুপতি দেখলেন, বউটি তাঁকে আর শিখাকে খুব মন দিয়ে দেখছে। আসলে বুঝতে চাইছে— এই কাঁচাপাকা মাথাটির পাশে কালো মাথা মেয়েটি তার কে হয়। বাবা আর মেয়ে? উঁহু। এমন তো দাঁড়াবে না। এটা দাঁড়াবার জায়গা নয়। স্বামী-স্ত্রী? কিন্তু অ্যাতোই বয়সের ফারাক!

পশুপতি নিজেকে বললেন, হ্যাঁ আমি শিখাকে একজন স্বামীর মতই— যাকে বলে পুরুষের মতই ভালবাসি— ভালবাসতাম। এখন আসলে ভালবাসাটা বয়সের জলে গুলে গিয়ে— মানে এমন একটা বয়সে পৌঁছে গেছি— যেখানে ভালবাসাটা কেমন যেন মিনিংলেস হয়ে গেছে। এখন মনে হয়— শিখার যেন শীত না লাগে। ভাল ঘুম হয় যেন। সুখী হয় যেন। রোদে যেন না বেরয়। ওর খুব রোদে বেরনোর অভ্যেস। বিশেষ করে গরমের দুপুরে। আধকপালে ব্যথায় ভোগে তাই। শীতে সর্দি কাশি চেপে ধরে। এমনকি এও মনে হয় পশুপতির—শিখা যেন পেট ভরে খায়। এসব কি ভালবাসার লক্ষণ? বিশেষ করে একজন স্বামী কি এভাবে ভাবেন? না, একজন প্রেমিক ভাবেন?

ট্যাক্সি এস এস কে এম হাসপাতাল আর শিখ গুরদোয়ারার মাঝের

রাস্তা দিয়ে এসে আদিগঙ্গার ওপর ফের আরেকটা সিমেন্ট ব্রিজের মুখে থামল। পাশেই প্রাচীন কবরখানাটির বিশাল রাজকীয় গেট। গোল গোল থামের ওপর তোরণ। তাতে অশ্বথের চারা। তার আগে লোহার গেট। কবরখানার জমিতে সস্তার কিছু সরকারি ফ্ল্যাট। খুব সম্ভব ইরিগেশনের বাড়ি। এই আদিগঙ্গা দেখাশোনার চাকুরেরা থাকে। তারপরেই মালি, দারোয়ানের কোয়ার্টার। ঘর-গেরস্থালি।

কলকাতার এতখানি জায়গা জুড়ে নানা সময়ে গোর দেওয়া মানুষের হরেক স্মৃতিবেদি। ক্রস। উড়ন্ত পরী। পাতাবাহার গাছ। যতদূর দেখা যায়— বেদির পর বেদি। কোনও বেদিকে ঘিরে একসময় আত্মীয়স্বজন— মানে স্বামী বা স্ত্রী কিংবা মা নয়ত বাবা খরচ করে যেসব শৌখিন পাথরের কাজ করিয়েছিলেন— তা প্রায় নেই। ভাঙা দাঁতের মত পাথরের গোড়া মাটির ভেতর প্রায় গেঁথে আছে। কোথাও বা ছেঁড়া শেকল। লোহার। তার ওপর ঘাস গজিয়ে কিছুই রাখেনি।

এখনও রোদ নরম। এতটা খোলা জায়গা কলকাতায় ময়দান ছাড়া আর কোথায় আছে। একজন পাকা গোঁফ, পাকা মাথা লোক কুঁজো হয়ে খুরপি দিয়ে রাস্তার দু'ধারের ফুলগাছের গোড়া খোঁচাচ্ছে।

শিখা একটা বড় কবরের ধাপে বসে পড়ল। ওখানটায় পশুপতি শিখার পাশে আগে বসেছেন। স্যান্ডেলের বাইরে বাঁ পা বের করে শিখা বুড়ো আঙুল দিয়ে নরম মাটি তোলার চেষ্টা করছে।

পশুপতি বললেন, করছ কী? নখে মাটি ঢুকে যাচ্ছে।

শিখা কোনও কথা বলল না।

খুরপি হাতে সাদা মাথার মালি মত লোকটি গায়ের ফতুয়ার ওপর কাঁধে মাথার গামছাটি রেখে বলল, দিন না করতে বাবু।

পশুপতি জানেন এবার লোকটি কোন দার্শনিক কথা বলবে। তার আগেই তিনি জানতে চাইলেন, তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ, ভাই?

সে কি বছরের কোনও ঠিক আছে। আগে বাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতাম। এখন আমার সঙ্গে আমার ছেলে করে। বলে সে বেশ দেমাকি ঢঙে বলল, গোরস্থানে এ কাজের নিয়মকানুন তো সবাই জানে না— সবাই পারেও না।

কী রকম?

এই তো বর্ষা গেল। জল বুঝে প্ল্যার্টফরামের পাশে নালা করে দিতে হয়। নইলে জল বসে গিয়ে—

প্ল্যাটফর্ম ?

কবর আর কি। পাথরের আছে। যাদের পয়সা কম তাদের সব ইটের আছে। বর্ষায় যদি জল বসতে থাকে তো—

তোমার দেশ কোথায় ভাই ?

দেশ বলুন— ঘর বলুন এখানেই আমার ঠাকুর্দা থেকে থাকি আমরা

কোয়ার্টার পাও।

হ্যাঁ। পাকা ঘর। আমার জন্ম-- আমার ছেলের জন্ম এখানেই। তার ছেলে হলে সেও এখানে কাজ করবে। যতদিন এই কবরখানা থাকবে

পশুপতির যেন রোখ চেপে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, কতদিন এই কবরখানা থাকবে মনে কর ?

তা তো জানি না বাবু। তবে দেশ যখন স্বাধীন হল— মাইনে আনতে গিয়ে দফতরে শুনেছি— ইংরেজ চলে যাবার সময় চুক্তি হয়েছে একটা

কীসের চুক্তি ?

ইংরেজ বলে গেছে— স্বাধীন হয়েছ হও। ভাল কথা। কিন্তু আমাদের অনেক লোককে এখানে গোর দেওয়া হয়েছে। তাদের কবর তোমাদের দেখাশুনো করতে হবে। কবরে বাগান করবে। দেখো যেন— এত বড় জায়গাটা বেদখল না হয়। কবরের পাথর যেন কবরেই থাকে।

তা কি আছে ?

নাঃ। একখানা দু'খানা করে অনেক পাথর চুরি হয়ে গেছে।

অফিসে বলনি ?

বলে কী হবে! কেউ গা করে না।

যারা নিয়ে যায় তারা ওসব পাথর দিয়ে কী করে ?

গুণ্ডা বদমাশের কাজ। যারা বাড়ি ঘরদোর বানায়— তাদের কাছে ঝেড়ে দেয়।

পশুপতির মনে পড়ে গেল— সে যেন গেট দিয়ে ঢুকতে মাথার ওপরে তোরণে সিমেন্ট দিয়ে ইংরেজিতে লেখা দেখেছে— মিলিটারি সিমেট্রি সেই জন কোম্পানির আমল কবেই চলে গেছে। চলে গেছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার খাস শাসনের আমল। স্বাধীন হয়ে গেছে দেশ—সেও কে কতকাল। এদেশে ম্যালেরিয়া, আমাশায় ভুগে মারা যাওয়া সাহেব-মেম যেমন এখানে শুয়ে আছে— তেমনি শুয়ে আছে এদেশে যুদ্ধ করে মরে যাওয়া সাহেবও। জেনারেল থেকে সাধারণ ক্যাপটেন, মেজরও তাদের ভেতর আছে। একটি কবর দেখেছিলেন তিনি— যার গায়ে শুধুই ঘাস

তার ভেতর একখানি পাথর জেগে। সেখানে লেখা 1811.

১৮১১ ভাবার চেষ্টা করেছেন পশুপতি। এখন চারদিক যা সব দেখছেন—সব মুছে ফেলে সেখানে আঠারশ এগারকে জায়গা করে দিতে হবে। চেষ্টা করেছেন তিনি। পারেননি। খুব কঠিন।

এখন শিখার বিয়ে হয়ে গেছে দু'বছর। এইসব মুছে দিয়ে আমি কি তার আগেকার শিখাকে নিয়ে আসতে পারি।

পশুপতিকে একা হেঁটে এগিয়ে যেতে দেখে শিখা উঠে দাঁড়াল। পশুপতি সামনে যতদূর দেখতে পাচ্ছেন— শুধুই বেদি, ক্রুস। দু'ধারে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। মালি পেছনে পড়ে গেছে। সে রাস্তার গায়ে পাতাবাহারের ডাল ছেঁটে দিচ্ছে। কবরের গায়ে ঘাসের গোড়া খুঁচিয়ে দোআঁশলা জংলি লতা গোড়াসমেত টেনে উপড়ে ফেলছে।

পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করল শিখা। দু'জনের কেউই কোনও কথা বলছে না। বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার ঝলমলে রোদে সারাটা সিমেট্রি যেন হেসে উঠল। এখানে-সেখানে নানা রঙের ফুল। দূরে কারা—তিন-চারজন লোক—কোটপ্যান্ট—এক মহিলা—গাউন—একটি কবরই হবে—ঘিরে দাঁড়িয়ে।

শিখা কোনও কথা না বলে পশুপতির সামনে ছুটে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই পশুপতির দু'খানি কাঁধ দু'হাতে ধরে বলল, এই তিনটি দিন আমার সঙ্গে থাকবে চল। আগে তো একসঙ্গে আমরা থেকেছি অনেকসময়। অনেকক্ষণ।

এই তো আছি শিখা।

শিখা তার দু'খানি হাত নামিয়ে নিল। নিয়ে খুব আস্তে বলল, এরকম নয়। আগের মত—

আর হয় না শিখা। তোমার সামনে বড় একটা জীবন।

শিখা কোনও জবাব না দিয়ে পুরু ঘাসে ঢাকা একটা ঢিবির ওপর গিয়ে বসল। চোখের চশমাটা ফের নাকের ওপরের দিকে ঠেলে দিল।

পশুপতি উঁচু ঢিবিতে বসা শিখার দিকে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। খুব সুন্দর লাগছে শিখাকে। মেয়েটা একদম কিছু বোঝে না। দেবব্রত এখন জলজ্যান্ত। আমি সেখানে কী!

আমার এক বন্ধু আছে শিখা। নীলাম্বর।

চিনি তো। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে।

সে বলে—এখনও নাকি অনেকদিন সে বেঁচে থাকবে।

বেঁচে থাকা তো খুব ভাল।

কিন্তু কীভাবে শিখা?

শিখা কিছু বলতে পারল না। পশুপতিও আর কথা বলতে পারলেন না। রোদ বাড়লেও গরম তত নয়। এদিকটা খোলামেলা। রোদের ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় বড় গঙ্গার দিকটায় কোথাও ফাঁকা আছে। কোনও বড় বিল্ডিং নেই মাঝখানে।

ওরা দু'জন আস্তে আস্তে কবরখানার মতই চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দূরে মালি একা একা কী যেন গাইছে। আর আপন মনে খুরপি খুঁচিয়ে চলেছে।

॥ ছয় ॥

ঠিক বেলা দশটায় জি ও সি ইন সি ইস্টার্ন কমান্ড লেফটেনান্ট জেনারেল চিব আর্মির অ্যাভ্রো এয়ারক্র্যাফট থেকে বাগডোগরায় নামলেন। এয়ারক্র্যাফট থেকে বেরিয়ে গ্যাংওয়েতে তিনি দাঁড়াতেই রানওয়ের ওপর জওয়ান, অফিসাররা যারা ওয়েট করছিল—তারা দেখতে পেল, জেনারেলের দুই বগলে দুটি কুকুর। লোমে ঢাকা। চোখ চারটে যেন কাচের চারটে নীল মার্বেল।

চিব সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতেই দু'জন জওয়ান দু'দিক থেকে ছুটে এসে জেনারেল সাহেবের কাছ থেকে সেন্ট বার্নার্ড দুটিকে কোলে নিল। একজন মেজর সটান দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। জেনারেল একটু মাথা ঝোঁকালেন। লেফটেনান্ট জেনারেল চিব ওদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে রানওয়ের ওপর দিয়ে মার্চিং ভঙ্গিতে গিয়ে আর্মির একটা হেলিকপ্টারে গিয়ে বসতেই মাথার ওপর পাখনা বনবন করে ঘুরতে লাগল। পলকে আকাশে।

পাহাড়, জঙ্গল, নিচে তিস্তা—তার ওপর ভিক্টোরিয়া ব্রিজ—সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে সেন্ট বার্নার্ড। কিছুই বুঝতে পারছে না। চিব তার পকেট থেকে দু'খানি বিস্কুট বের করে ওদের দিলেন। ওরা চিবোতে লাগল। চুষতে লাগল। একসময় এই বিরাট ফড়িং গ্যাংটক পার হয়ে গেল। সামনেই পরিষ্কার রোদে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথায় বরফ মেলে দাঁড়ানো।

পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় ফড়িংটা নিচের আন্ডা পোল পেরিয়ে গেল। চিব জানেন—এই পোলের এমন নাম কেন। এই পোল পেরিয়ে যেখানে যেখানে পোস্টিং জওয়ানদের—ফরোয়ার্ড এরিয়া বলে—সেই নাথুলা

অব্দি—ব্রেকফাস্টে দুটো করে ডিম বেশি পায়। তাই জওয়ানদের মুখে মুখে পোলটার নাম হয়ে গেছে আন্ডা পোল।

পয়লা পোস্ট ছাঙ্গু লেকের তীরে। হেলিকপ্টার নিচের ফ্ল্যাগ দেখে হেলিপ্যাডে গিয়ে নামল। মাথার ওপরের ডালা খোলার আগে জেনারেল সেন্ট বার্নার্ডদের গায়ে উলের ছোট্ট সোয়েটার পরিয়ে দিলেন। পেছনের সিটে বসে থাকা দু'জন জওয়ান তাদের কোলে নিল। চিব নামলেন। তাকিয়ে দেখলেন, ছাঙ্গুর জল বরফ হয়ে তখনও জমাট। বিরাট লেক। অনেক নিচে জমা বরফের গা ঘেঁষে একটি পাহাড়ি কুকুর ঘুর ঘুর করছে। এক দল পায়রা কুকুরটার মুখোমুখি গজ দুই দূরে জমাট বরফের ওপর বসে। কুকুরটা যেই ভাবে এবার সে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকাবে—অমনি পায়রার দল জায়গা বদলে আরেক জায়গায় গিয়ে বসে। কুকুরটা একদম হন্যে হয়ে উঠেছে।

জেনারেল কোমর থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করলেন। কুকুরটাকে গুলি করবেন বলে তাক করেছেন। কী মনে হল তাঁর। রিভলভার খাপে রেখে তাঁর সামনে দাঁড়ানো এক সেকেন্ড লেফটেনান্টকে বললেন, কল হিম অ্যান্ড গিভ সাম ফুড।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জওয়ান মুখের ভেতর কী একটা আওয়াজ করল একসঙ্গে। অমনি ঘোর কালো রঙের কুকুরটা লালচোখ নিয়ে তীরের মত ছুটে এল। চিব বুঝলেন, ফরোয়ার্ড পোস্টে ওরা তাঁবুর পাশে ঘোরে বলে এটা-ওটা খেতে পায়। কুকুরটি বেশ লোমে ঢাকা। সে এসেই রাগে গর গর করতে লাগল। দুই জওয়ানের কোলে দুই সেন্ট বার্নার্ড। তারাও কোল থেকে কুঁই কুঁই আওয়াজ তুলল।

লেফটেনান্ট জেনারেল চিব এই ছবি দেখে হো হো করে হাসলেন। তারপর পাহাড় খুঁড়ে বানানো পোজিশন দেখতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। পাহাড় ড্রিল করে গর্ত নেমে গেছে নিচে। সেই গর্ত যতই নিচে নেমেছে—ততই বড় হয়ে হয়ে একেবারে চাতালে এসে রীতিমত হলঘর। সিগনালের যন্ত্রপাতি। ট্রান্সমিটারে দু'জন বসে। টেলিফোন। ঘর গরম রাখতে দু'রকম হিটারই মজুত। কেরোসিনের। আবার ইলেকট্রিকেরও। সেজন্যে স্ট্যান্ডবাই ডিজেল জেনারেটর।

এখানেই লাঞ্চ সারার কথা জেনারেলের। সেইমত আয়োজনও হয়েছে। এখানে লাঞ্চ সেরে জেনারেল জিপে চড়ে আরও সামনের ফরোয়ার্ড পোস্টগুলো দেখতে দেখতে যাবেন। চিব ঘুরে ঘুরে পোস্টটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখছেন। আর তাঁর সঙ্গে সেই বার্নার্ড দুটি পাথরের চাতালে তুরতুর করে ঘুরছে।

পাহাড় ফুটো করে শুধু নজেলটা যাতে ওপরে উঠে যেতে পারে সেইভাবে মেশিনগান বসানো। এই পোস্টের আরমামেন্টস ঠিকঠাক কি না তাই দেখতে দেখতে জেনারেলের হঠাৎ মনে হল—সেন্ট বার্নার্ড দুটো তো খুব খুশি। তারা দিব্যি কাঁই কুঁই করে কথা বলছে নিজেদের ভেতর। কোথায় জার্মানির পাহাড়ি এলাকা। হিম ঠাণ্ডা। আর কোথায় হিমালয়ের রেঞ্জের ভেতর আরামের শীত।

জওয়ান, অফিসার মিলিয়ে এই পোস্টটি মোট একুশজনের। করিৎকর্মা সবাই। টেবিল সাজানো সারা। জেনারেল দেখলেন, সেন্ট বার্নার্ড দুটি দিব্যি খেলে চলেছে। একটা টেনিস বল কোত্থেকে জোগাড় করেছে জওয়ানরা। সেটা নিয়ে ওরা কামড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু হাঁ-মুখ খুবই ছোট্ট। কামড়ে ধরতে পারছে না।

লাঞ্চের পর জেনারেল চিব জিপে বসলেন। তাঁর পেছনে দু'জন সিকিউরিটি। হাতে স্টেন। পাহাড়ের গা কেটে তাক বানানো হয়েছে। সেই তাকের নাম জওহরলাল নেহরু মার্গ। কালো পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙ দিয়ে হিন্দিতে লেখা। দু'খানা ট্রাক দু'দিক থেকে যাতায়াত করতে পারে। বাঁয়ে পাহাড়। ডাইনে অথৈ খাদ। আর্মি কোটের কলার তুলে দিলেন জেনারেল।

কাগজকুচির মত বরফ পড়তে শুরু করল বিকেল চারটে নাগাদ। এর ভেতর আরও দুটো পোস্ট ইনস্পেকশন করা হয়ে গেছে। জওয়ান দু'জনের পায়ের ফাঁকে সেন্ট বার্নার্ড দুটো খেলছে। জেনারেল দেখলেন, ডানপাশে খাদের অনেক নিচে গাছের মাথাগুলো অন্ধকার হয়ে এল। জিপের চাকার ছ'ইঞ্চি পরেই খাদ। পিছলে পড়লে ঠিক কাটা ঘুড়ির মতই অথৈ খাদে। তবে ভাসতে ভাসতে নয়। রাস্তা হরদম ভাঙছে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্টোন চিপ, সিমেন্ট, লোহার জাল দিয়ে পলকে সারাই চলছে।

বাঁ হাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বিকেলের এলিয়ে পড়া রোদে ঝকঝক করছে। জমা বরফে রোদের আলো এমন ঝিকমিক করে। নয়ত পাহাড়ের গা— পাহাড় কেটে বানানো রাস্তার গা— সবই যেন পোড়া কয়লার চেহারা। তার ওপর আবছা হয়ে সন্ধে নামছে। জলপাই রঙের জিপটা একটু পরে অন্ধকারে মুছে যাবে। শুধু সাদা রঙের সেন্ট বার্নার্ড দুটো এখনও সাদা

আছে। তাদের পিঠের কালো ছোপগুলো এখনই হারিয়ে গেল।

খুব ইচ্ছে হল লেফটেনান্ট জেনারেল চিবের— এখুনি তিনি জিপ থেকে নেমে পড়বেন। নামার সময় সেন্ট বার্নার্ড দুটোকে দুই বগলে নিয়ে নামবেন। জিপকে বলে দেবেন— সামনের পোস্টে গিয়ে ওয়েট কর। আমি যাচ্ছি। কিন্তু কোনওদিন আর ফিরবেন না।

পাহাড়ের পর পাহাড়। ভগবানের লন্ড্রি যেন সব পাথরের শাড়ি মেলে দিয়েছেন। এপাশ ওপাশ করে। কাল দিনের রোদে শুকোবে। ঠাণ্ডা পড়ছে জোর। দুই পাহাড়ের মাঝে পাহাড়ি গ্রাম থাকে। বসতি থাকে। সেখানে সেন্ট বার্নার্ডের বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দেবেন চিব। তারপর ওদের সঙ্গেই ওখানে থেকে যাবেন। সেন্ট বার্নার্ড দুটি বড় হতে থাকবে।

চোখের ইশারা পেয়ে একজন জওয়ান একটি সেন্ট বার্নার্ড জেনারেল সাহেবের কোলে তুলে দিল।

॥ সাত ॥

যা ছিল একসময় নবাব প্যালেস তা এখন ভাদৌড়ি হাবেলি। আসাদুল্লা মঞ্জিল বা আসাদ মঞ্জিল থেকে ভাদৌড়ি হাবেলি। পাকুড় নামটা সবাই জানে। রেল স্টেশনে। সেখান থেকে স্টোন চিপ ওয়াগন বোঝাই হয়ে সব জায়গায় যায়। পাকুড়ের পরের স্টেশন টিলাভিটা। তারপরেই কোটালপাহাড়।

স্টেশনে নেমে কয়েক মিনিট হাঁটলেই রাস্তার ওপর ভাদৌড়ি হাবেলি। নবাবি স্টাইলে বানানো বাড়ি। চারদিকে বিঘে পঞ্চাশেক জায়গা। বাড়ির সামনের দিকে লাগানো একটি ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে 1901.

আর বাড়ির পেছন দিকটা আরও আগে তৈরি। সেখানে লেখা আছে 1৪76. বোঝাই যায় দুই সময়ে বানানো বাড়ি। ১৮৭৬ সনের অংশটি খানিকটা বসে গেছে। তাই জায়গায় ক্র্যাক।

সুরথ ভাদুড়ি ইঞ্জিনিয়ার এনে দেখিয়েছিলেন। কিছুই করার নেই। ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন : হয়ত ডোবা ভরাট করে তার ওপর তৈরি হয়েছিল। একশ বছর হয়ে গেছে কবে। তবু পেছনের অংশটা শুধু বসছেই—বসছেই। সেখানে বছর বছর প্যাচ ওয়ার্ক করাতে হয়।

কম্পাউন্ড ওয়াল তোলা হয়েছিল সম্ভবত এই শতাব্দীতে। কেননা সিমেন্টের গাঁথুনি। তবু জায়গায় জায়গায় সারাই করতে হয় ফি-বছর।

কেননা কাছেই একটা স্কুল আছে। সেখান থেকে ছেলেরা আম পাড়তে আসে দেওয়াল টপকে। নবাবদের লাগানো আমগাছ তো আছেই। সুরথও এত বছর অনেক গাছ লাগিয়েছেন। তাঁর লাগানো গাছে ফল আসে। শুধু আমই নয়। মুসাম্বি। বাতাবিও ফলে।

বছর ঘুরে আবার একটা বর্ষার মুখে এসে হাজির হয়েছেন সুরথ ভাদুড়ি। কম্পাউন্ড ওয়ালের বাইরেই লাগোয়া বিঘে ত্রিশেকে ধান থেকে অড়হর সবই হয়। সেখানে কাটানো দিঘি তো আছেই। সেচের জন্যে বর্ষার জল ধরা থাকে তাতে। তাছাড়া কম্পাউন্ড ওয়ালের ভেতর একটি পুকুরে মাছ থাকে। বিশেষ করে মাগুর মাছ। ফি-বছর শ দুই-তিন করে বাচ্চা মাগুর ছাড়েন তিনি সেখানে। কলকাতা থেকে সবাই এলে ধরা হয়। মাগুররা বাড়ছেই। কলকাতা থেকে তাঁর ছেলে তো আসার সময়ই পায় না। এবার সঙ্গে এসেছে তার মেয়ে— বিজয়া।

একদিকে বালি সিমেন্টের কাজ চলছে। অন্যদিকে বর্ষার মুখে মুখে মাটি ভিজিয়ে নতুন গাছ বসানো চলছে। এজন্যে দরকারে বাইরের দিঘির জল পাম্প করে আনা হচ্ছে।

আগের লাগানো একষট্টিটা সেগুন গাছ অন্তত বিশ ফুট বেড়েছে। মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সুরথের একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। পাঁচ বছরের মাথায় সেগুনের ডাল কেটে দিলে গাছ আরও গোল— আরও মোটা হয়। বাড়ও অনেক বেশি হয়। দেরিতে হলেও সেই কাজটা এখন চলছে।

এখন সকাল আটটা। কম্পাউন্ড ওয়ালের বাইরে ডিজেল পাম্প ভুগ ভুগ করে চলছে। পাইপ বেয়ে জল এসে কম্পাউন্ড ওয়ালের ভেতরকার জমি বর্ষাকালের মতন ভিজিয়ে ফেলল। সুরথ ভাদুড়ি বাদশাপসন্দ আম গাছের নিচে দাঁড়ানো। সেখান থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন। উঁহু। হল না। হল না। ওখানে মেহগনি বসানো চলবে না হরিয়াল—

হরিয়াল নামে লোকটি খালি গা। সাদা মাথা। তার হাতে মেহগনির চারা। পায়ের সামনে কোদাল। কাছাকাছি আরও চার-পাঁচজন মাটি কুপিয়ে চারা বসানোর মাদা বানাচ্ছে।

বাচপনেই যদি মেহগনি অর্জুন গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায় তো গোড়া শক্ত হবে না হরিয়াল। মেহগনির মত মেহগনি হলে অন্তত চারশ বছর যুঝবে। তার তো শক্ত গোড়া চাই। সে তো শেকড় ছড়িয়ে শক্ত হবে।

হরিয়াল তার মাঝবয়স থেকেই কোটালপাহাড়ে সুরথের সঙ্গে আছে। সুরথের গাছপালা, ঘরবাড়ি, ধান, অড়হর দেখেশোনে। বাড়ি টিলাভিটা স্টেশনে নেমে যেতে হয়। সেখানে তার যাওয়া হয়ে ওঠে না। এখানেই সে বেশি থাকে। তাকে হঠাৎ দেখে কাজের লোক বলে বোঝার উপায় নেই। সে ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গীসাথীর মতই চলাফেরা করে। মতামত দেয়। চওড়া কাঁধ। খুব লম্বা নয়। কোটালপাহাড় বাজারে এটা-ওটা কিনতে হলে সে-ই যায়। তখন হরিয়াল টায়ার কেটে বানানো একজোড়া স্যান্ডেল পায় দেয়। ওপরের দিকে একটা ফতুয়া চড়িয়ে নেয়। কিন্তু টিলাভিটায় তারই বাড়ি যাওয়ার সময় পায়ে দেবে মোকাসিন— গায়ে দেবে পাঞ্জাবি। ঢোলা হাতার।

এঁটেল মাটির বাঁধুনি দেওয়া মেহগনির চারাটি হাতে সে একগাল হেসে বলল, এর গোড়া শকত্ না টিলা!— সে আপনি দেখবন কি করে? আপনি কি থাকবেন?

একথায় সুরথ তাঁর নিজের শরীরটার দিকে তাকালেন। কবেই তাঁর শরীর ষাট পেরনো একজন বাঙালির চেহারা পেয়ে গেছে। তবু চলাফেরা— হুটহাট ঘুরে বেড়ানোর ভেতর থাকেন বলে—মোটা হননি—আর বেশ টনকো আছেন। তিনি বললেন, সব কি নিজে দেখে যাওয়ার জন্যে করে মানুষ? আমি বলি কি হরিয়াল—সেগুন চারা যেমন তফাত রেখে বসাচ্ছ—তার দুগোনা তফাত রেখে মেহগনি বসানো ভাল। দ্যাখো তো আগের গাছগুলো। দিব্যি ডালপালা ছড়িয়ে সাবেক মেহগনিগুলো আরও একশ বছর বাড়তে পারবে।

এবার হরিয়াল হো-হো করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে তার বয়সের ভারি শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শ-দেড়শ বছরের কথা না বলবন। দুনিয়া তখন কত বদল হইয়ে যাইবন!

একশ-দেড়শ বছর এগিয়ে গিয়ে ছবিটা ভাবতে চেষ্টা করলেন সুরথ ভাদুড়ি। কিছুতেই সে ছবি ভেবে বের করতে পারলেন না তিনি। এখন কোটালপাহাড়ের রাস্তা দিয়ে সাঁওতাল রিকশওয়ালারা প্যাঁক প্যাঁক করে রিকশ চালিয়ে যাচ্ছে। কোটালপাহাড়ের স্টেশনবাজার রমরম করছে। তখন কি এসব থাকবে? অশোক থাকবে? বিজয়া থাকবে? ওরাও তো থাকবে না। থাকবে না ওদের মা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে মেহগনির চারা পালের জাহাজে করে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে কোম্পানির সাহেবরা এদেশে এনেছিল দুশ-আড়াইশ বছর

আগে। রাস্তার দুধারে বসিয়ে গেছে জন কোম্পানির ফ্যাক্টর, রাইটার, সেপাইরা। পরে মেহগনি এদেশের গাছ হয়ে গেছে। সাহেবরা মেহগনির ফলের বীজ করে তা থেকে চারা বানিয়ে বসিয়েছে বছরের পর বছর। হলদে আভা ছড়ানো ফুল দেয় গাছগুলো। ওই তো তারই হাতে বছর পনের আগে বসানো গাছে ডৌখোল পাখির ঝাঁক এসে বসল। এসব গাছ একশ ফুট অব্দি বাড়ে। তার মানে এখনকার আট-দশতলা বাড়ির সমান উঁচু হয়ে দাঁড়ায় পুরো বয়সে।

ডৌখোল পাখিগুলো এমন নিশ্চিন্তে মেহগনির জোড়া জোড়া চারপাতার থোকার ভেতর হুটোপাটি, কিচিরমিচির জুড়ে দিয়েছে—কে বলবে পনের বছর আগে ওখানে কোনও মেহগনি গাছই ছিল না। অথচ ওরা ওখানে খেলছে যেন-- বহু বহুকাল ধরে ওখানে মেহগনি গাছ আছে। হরিয়ালের কথামত দুনিয়া কিন্তু বদলেই চলেছে।

এই পাখিরা কোত্থেকে আসে জানেন সুরথ। সিধে উত্তর-পুবে উড়ে গেলে রাজমহল পাহাড়ের রেঞ্জ। এই সাঁওতাল পরগনায় রাজমহল পাহাড়ের হাত, পা, গা, মাথা লম্বা হয়ে ছড়িয়ে আছে। রাজমহল রেঞ্জের গায়ে জঙ্গলে পাখিদের আস্তানা। পাহাড়ের নিচে গঙ্গা। শীতে সাইবেরিয়ার হাঁস ওখানে এসে জোটে। হাজারে হাজারে। কোটালপাহাড় থেকে পেছন দিকে হাঁটলে বাগদাপাড়া, মুর্শিদাবাদ। সামনে হাঁটলে সাহেবগঞ্জ। এখন জেলা সাহেবগঞ্জ। সদর সাহেবগঞ্জ। আগে জেলা ছিল আরও বড়। দুমকা। তারও আগে—অনেক আগে—সুরথের জন্মের অনেক আগে পুরো সাঁওতাল পরগনাই তো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভেতর ছিল। তার মানে নবাব প্যালেস তৈরি হয়েছিল যখন—তখন এসব এলাকা ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভেতর। বদলেছে—বদলে যায়—কত বদলে যায় সব।

এখানকার মাটি লালচে এঁটেল। মাঝে মাঝে দোআঁশলা মাটি। কাঁকর মেশানো। সুরথ বসিয়ে থাকেন একবছরের চারা। তার চেয়ে কম বয়সের হলে পোকা, জলধোসা রোগ, কেঁচো সহজেই চারাকে কাবু করে ফেলে। তাঁর চোখের সামনে বছর পনেরর মেহগনির গা লালচে বাদামি। দেখে খুব সুখ হয় সুরথের। সারাটা গাছই যেন তাঁর তৃপ্তি।

আগেকার বসানো শিশুগাছ ঠেলে উঠেছে। বড় বড় পাতা। ঘন কালো বাকলের ভেতর দিয়ে শিশুগাছটার গা যা বেরিয়ে পড়েছে তা রীতিমত বাদামি।

হরিয়াল।

হুজুর ?

গর্তের মাটি ওলটপালট করে দিয়েছ ?

জি।

এবার বসিয়ে দাও চারাটা। আস্তে। দেখো যেন শেকড়ের মুকুট না ভেঙে যায়।

জি হুজুর। আমি কি দেখবন। আপনি দেখবন।

সুরথ দেখলেন— মেহগনির একবছরের চারার মূল শেকড়ে নার্সারি থেকে আনার সময় যে মাটি বাঁধা ছিল— তা ঠিকই আছে। এই মাটি সরে গিয়ে শেকড়ের মুকুট যদি একবার ভেঙে যায় তো চারা সিধে করা খুব কঠিন। মুকুট একবার ভেঙে গেলে চারা আর বাঁচে না।

আগেকার লাগানো সেগুন গাছগুলোর বাড় ঠিকমত হয়নি। তাই তাদের ডাল কাটা চলছে ক'দিন ধরে। সেগুন ঠিকমত বাড়লে একশ বিশ ফুট অব্দি উঁচু হয়। গতকালের কাটা ডালগুলো বারান্দায় তুলে রাখা হয়েছে। ডাল কাটার সময় ওদের গা ছিল সোনালি। শুকিয়ে গিয়ে আজই বাদামি ভাব ধরেছে।

হরিয়াল শুকনো গোবর দিচ্ছিল গর্তে। আরেকটা মেহগনির চারা বসবে। সুরথ বললেন, বেলা বাড়ছে। রোদের তাতও বাড়ছে।

হরিয়াল উবু হয়ে গর্তের মাটি ওলটপালট করছে। সে কোনও কথা বলল না।

সুরথ বললেন, সন্ধে অব্দি চারাগুলোর চারদিকে তালপাতার ডেগো বসিয়ে ছায়া করে দিতে হবে। সন্ধে এসে গেলে আর কোনও ভয় নেই। ঠাণ্ডায়— অন্ধকারে আরাম করে জিরিয়ে নিতে পারবে চারাগুলো। সারারাত।

হরিয়াল নিজের কাজ করতে করতেই বলল, তবে তো চাঙ্গা হইয়ে যাইবন।

হঠাৎ ঘণ্টির শব্দে ফিরে তাকালেন সুরথ। তাঁর হাবেলির গেট দিয়ে টাঙা ঢুকছে। ঘোড়ার গলার ঘণ্টি বাজছে ঘোড়ার ছোটার তালে। লাগাম ধরে বসে আছেন রোশেনারা বেগম। বাঁ হাতে। ডান হাত তো নেই। পানে ঠোঁট লাল। বেলা দশটা-সওয়া দশটার রোদে মেহেন্দি করা মাথার চুল লালচে হয়ে ফুটে উঠেছে। চোখে সুরমা। নিচে গারারার ঝুলে পা ঢাকা পড়েছে। ওপরে জামার ওপর বাসন্তী রঙের দোপাট্টা। বয়সের সঙ্গে সব রঙই খুব চড়া। মহিলা এখনও তাঁর তিরিশ বছর আগের বয়সে পড়ে আছেন।

এই যে নতুন রাজাসাহেব।

সুরথ রাগ চেপে বললেন, ওই নামে আমাকে ডাকবেন না। আপনাকে তো আগেও কতবার বলেছি— আমি সুরথ ভাদুড়ি। আমার বাবা ঈশ্বর নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি।

লাগাম হাতে টাঙার ওপর বসেই রোশেনারা বেগম বললেন, আমি রাজসাহেবই বলব। একসময় এই প্যালেস ছিল আমার খসম নবাব আসাদুল্লার। এখন এই হাবেলি আপনার। আপনি রাজাদের মতই সেগুন মেহগনি লাগিয়ে চলেছেন।

দেখুন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আপনাকে সম্মান দিয়েই বলছি— ন্যায্য ভাবেই এই হাবেলি আমার। আপনি আমায় হাইকোর্ট অব্দি নিয়ে গেছেন মামলায়। সেখানেও আমারই মালিকানা বহাল হয়েছে। তারপর রাজাসাহেব বলে আমাকে ঠাট্টা করতে এসেছেন?

ঠাট্টা কোথায়! সত্যি কথাটাই বললাম।

হাতজোড় করে বলছি। আপনি একজন মহিলা। আপনি এখন আসুন।

ভাল! প্রশংসা করছি— তাও আপনার ভাল লাগল না!

প্রশংসায় আমার দরকার নেই। আমাকে আমার মত থাকতে দিন দয়া করে।

রোশেনারা বেগম একবার হাসলেন। তারপর লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ফেরালেন। সুরথ দেখলেন, টাঙার পেছন থেকে মহিলার মাথাটি যেন একটি বড়সড় দিশি মুরগির ঝুঁটি।

পাঁচ-সাতজন মিলে মাটি কোপাচ্ছে। হাতখানেক করে সব গর্ত। গর্তের দু'ধারে ওপরের মাটি তুলে রাখা। গর্তের ভেতরকার মাটির সঙ্গে একবছরি চারাগুলোর শেকড়ের মাটি সই সই করে এক একটি গাছ বসানো। দুটি সেগুন গাছে লোক উঠেছে। তারা ডাল কাটছে। এবার গাছগুলো অনেকটা করে বাড়বে। সুরথ মাথা তুলে সেগুনের উঁচু ডালে তাকালেন। এক একটি গাছ তাঁর মনের আশার ছবি হয়ে আকাশের দিকে উঁচুতে উঠে গেছে। তাঁর একজীবনে সারা দেশ কত উল্টেপাল্টে গেল। বাবা। চা-বাগান। দেশ ভাগ। কলেজ। পড়াশুনো। বিয়ে। অশোক। বিজয়া। কোটালপাহাড়।

মেয়ের নাম মনে পড়তে তিনি বাড়ির ভেতর চললেন। ভেতরে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে। কাজ দেখছে— বিজয়া। বিশাল বিশাল গোল থামের ওপর ঢাকা বারান্দার পেটাই ছাদ। সামনের দিকটা এই শতাব্দীর

একেবারে গোড়ায় তৈরি হয়েছিল। ঘরের ভেতরের ছাদের কাছাকাছি পায়রাদের পাকা বসতি। যাতে ওরা আর ওখানে বসতে না পারে— সেজন্য মই বেয়ে মিস্ত্রি উঠেছে। পায়রাদের ঘুলঘুলিগুলোর জায়গায় বড় বড় পেরেক উল্টো করে সিমেন্ট দিয়ে বসানো চলছে। আর বসতে পারবে না ওরা সেখানে। পায়রা বড্ড বাড়ি নোংরা করে।

কত পেরেক লাগবে বাবা?

কলেজে পড়া মেয়ের মুখে তাকালেন সুরথ। কেন? এক বস্তা এসেছিল। সব ফুরিয়ে গেছে?

প্রায় শেষ। এখনও তো অনেক— অনেক লাগবে বাবা।

তা তো লাগবেই। এটা তো প্যালেস। ঘরের কোনও শেষ নেই। তাও তো হাবেলির পেছন দিকটা ব্যবহার হয় না। বেবাক ঘর পড়ে যেতে শুরু করেছে মা।

ভেঙে দাও না বাবা। তাহলে পেছন দিকে একটা বড মাঠ বেরিয়ে আসবে।

মন্দ বলিসনি মা। ১৮৭৬ সনের ঘর সব। এক একটা পেল্লাই ঘর। ঘর না বলে হলঘর বলাই ভাল।

আমার মনে হয় বাবা— তখন যাঁরা থাকতেন— তাঁরা এক একটা হলঘর পার্টিশন দিয়ে বাস করতেন।

তাই তো মনে হয় ওইভাবেই ওঁরা সারা প্যালেসে পঁয়ষট্টিখানা ঘরের হিসেব ধরতেন।

॥ আট ॥

ঠিক পুজোর আগে ক্যালকাটা ক্লাবে কমল ঘোষ চা খেতে ডাকলেন সুরথ আর নীলাম্বরকে। আলাদা আলাদা ফোন করে। ফোন নামিয়ে নীলাম্বর সুরথকে ধরলেন ফোনে। হ্যাঁরে চা খাওয়াবে— তা ক্লাবে কেন?

সুরথ বললেন, তাতে কি হয়েছে। তুমি কিছুই জানো না নীলাম্বর। গল্পগাছা করতে তো লোকে ক্লাবে যায়। চা খায়।

তুমি যাও?

গেছি দু-একবার আমি। আমার কথা বাদ দাও। আমি বাড়িতেই চা খাই। কিংবা তোমার বাড়ি বা কমলের বাড়ি গিয়ে চা খেতে পারি। দাও যদি।

আমিও তাই সুরথ।

কথামত সুরথ এসে হাজির হলেন না ক্লাবে। নীলাম্বর প্রায় বিকেলে একা একা ক্লাবের হলঘর পেরিয়ে বিরাট লনের মুখোমুখি ঢাকা বারান্দায় কমল ঘোষকে পেলেন। কমল ঘোষই হবে। তাঁর মন তাই বলল। বহু— বহুকাল হল দেখা নেই। চওড়া কাঁধ। মাঝারি হাইট। মাথাটি ভারী। ছোট করে ছাঁটা চুল। কাঁচাপাকা। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। সুতোর কাজ করা ক্লাব শার্ট গায়ে।

তুমি নিশ্চয় নীলাম্বর হালদার।

ঠিক ধরেছ কমল— বলতে বলতে নীলাম্বর চেয়ার টেনে বসলেন। আশপাশে আরও কিছু চেয়ারে আড্ডার মেজাজে কিছু মানুষ। বাঙালি অবাঙালি। কিছু চেয়ার ফাঁকা। একা একজন খুবই বয়স হয়েছে— সাফারি সুট, ভারী চশমা— চেয়ারে বসে। তার পাশের চেয়ার তিনটি ফাঁকা।

তারপর অম্বর। রিটায়ার করেছ নিশ্চয়।

হ্যাঁ। তুমিও তো করেছ।

হুঁ। লাস্ট পোস্টিং কোথায় ছিল?

কাস্টমসে কমল। অ্যাপ্রাইজার হয়ে রিটায়ার করেছি।

কমল সামান্য ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ল্যান্ড কাস্টমসের কালেক্টর মুখার্জিকে চিনতাম।

অনেক মুখার্জি আছে তো।

কমল গম্ভীর গলায় বললেন, আমি সুদেব মুখার্জির কথা বলছি। সুদেবকে না চেনার তো কথা নয় অম্বর।

আমি চিনব কী করে। আমি ছিলাম সি কাস্টমসে। সমুদ্রর ব্যাপার। তাছাড়াও অ্যাপ্রাইজাররা তো কালেক্টরের ঘরে সবসময় যেতে পারে না।

না না। আমি যেতাম। মানে আমাদের অ্যাপ্রাইজারদের যেতে হয়। নানান মিটিং থাকে তো কালেক্টরের সঙ্গে। কিন্তু ওঁকে চিনি না— কারণ, উনি তো ল্যান্ডের ব্যাপারে—

মিটিং থাকলেও অম্বর—সেসব তো অফিসিয়াল দেখাশুনো। কতটাই বা চেনা পরিচয় হয়।

না না কমল—আমাদের ভেতর দিব্যি চেনা পরিচয় হয়। কালেক্টর তো আমাদের কো-অর্ডিনেট করেন। তাঁকে সবসময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। এটাই কাজের ধারা।

কমল ঘোষ ঠোঁট উল্টে বললেন, হবে। তুমি যখন বলছ। সুদেব মুখার্জি খুব চৌকস অফিসার। পরে দিল্লি বদলি হয়ে যায়। আমি দিল্লি গেলে দেখা হয় আমাদের। চা বলি ?

বল।

কড়কড়ে উর্দি পরা বেয়ারা বিরাট ট্রে-তে চা নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। যাওয়ার সময় সেলাম বাজাল কমলকে। কমল একটু ঝুঁকে সেলাম নিয়ে চা ঢালতে লাগলেন। মুখে বললেন, তোমার পছন্দমত চিনি নিও।

মুখে দিয়েই নীলাম্বর বুঝলেন, খুব দামি চা।

বাড়ি করেছ ?

তুমি করেছ কমল ?

অনেকদিন। অ্যাকচুয়ালি দুই ছেলেই দূরে দূরে। বড়জন আরব এমিরিটাসে আছে— খবরের কাগজে স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ছোটজন ম্যাকলিনের চা-বাগানগুলোর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।

বাগানে থাকে ?

কলকাতাতেই হেড কোয়ার্টার। এখানে থাকে। আবার বাগানেও থাকে। মানে বাগানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় ওকে। ওদের কোম্পানির প্লেনেই ঘোরে। ঘন ঘন যেতে হয়। তোমার বাড়ির কথা বললে না তো অম্বর।

আমি একটা পুরনো বাড়ি কিনে সারিয়ে নিয়েছি। আমরা তো মোটে দুজন।

ছেলেপেলে ?

হয়নি ভাই।

বাড়ি কিনেছ কোথায় ?

বড় রাস্তার প্রায় ওপরে। ট্রামলাইন থেকে একখানা বাড়ি পেছনে। --জায়গার নাম ইচ্ছে করেই বললেন না নীলাম্বর।

উঃ ! তাহলে তো খুব সাউন্ড পলিউশন। থাক কী করে ? ট্রামবাসের আওয়াজ।

চা শেষ করে নীলাম্বর বললেন, থাকতে হয় ভাই। তোমার বাড়ি বুঝি খুব ভেতরে ?

না। না। একদম ফাঁকায়। আমাদের সল্টলেকের দিকটায় তো ট্রাম নেই। বাসও তত বেশি নয়। বাইপাস ক্রস করে কুড়ি মিনিটে ক্লাবে চলে আসি গাড়িতে। যখন জি এস আই-তে ডি জি ছিলাম—তখন তো

বেলভেডিয়ারে অফিস কোয়ার্টারে থেকেছি, আলিপুর— ময়দানের রাস্তা ফাঁকাই পেতাম অফিস যাতায়াতের সময়। বেশি সময় লাগত না। আমি চিরটাকাল সাউন্ড পলিউশন— ডাস্ট পলিউশন থেকে দূরে থেকেছি।

কমলের চা শেষ হয়ে গেছে। তিনি নিজে থেকেই ফের শুরু করলেন। আমার একটিই মেয়ে। জামাই জি এস আইতে আছে। এখন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আছে।

জঙ্গলে কেন ?

ওখানে আয়রন ওরের খোঁজ লাগাচ্ছে। ওসব জায়গাতেও কোনও পলিউশন নেই অম্বর।

আমার ফোন নম্বর কোত্থেকে পেলে ?

সুরথ দিয়েছিল। কিন্তু সে তো এল না অম্বর। আর আসবেই বা কী করে। প্রপার্টি ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ছেলে বাবার কাজে ইন্টারেস্টেড হলে সুরথ খানিকটা ফ্রি হতে পারত।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কমল। নীলাম্বরের টেবিল ছেড়ে খানিকদূরে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। সেখানে বসে আর ওঠেন না কমল। একজন ক্লাব মেম্বার— মোটাসোটা—তিনি প্রায়ই বলছেন—তাই নাকি ? তাই নাকি ?— আর কমল চাপা গলায় হেসে কী বলেই চলেছেন। কথা আর শেষই হয় না। মুখটা হাসি হাসি।

নীলাম্বরের পেছনে হলঘর। সেখানে অনেক গল্পগাছা করছে। কারও কারও টেবিলে গ্লাসের পর গ্লাস। ছুটির মেজাজে হাসাহাসি। এ ক্লাবে তিনি আগেও এসেছেন দু'চারবার। কিন্তু যাদের সঙ্গে এসেছেন— তারা উঠে অন্য টেবিলে গিয়ে জমে যায়নি। সামনের লনে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সামিয়ানার নিচে সাজানো টেবিলে সারি দিয়ে কাপ— প্রাইজের জিনিসপত্তর। হয়ত ক্লাবের কোনও টুর্নামেন্টের আজ প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে।

নীলাম্বরের হঠাৎ মনে হল— কাছেই একা বসে থাকা খুবই বুড়ো ভদ্রলোক তাঁকেই যেন প্রায় ইশারায় ডাকছেন। এভাবে কাউকে ডাকা যায় না। বুড়ো মানুষটির মাথাটি ঘাড়ের ওপর প্রায় বসে গেছে। একরকম চিঁ চিঁ করে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, যদি একবারটি আসেন এদিকে—

যাবেন কি না বুঝতে পারছেন না নীলাম্বর হালদার। কমল তিনটে টেবিল পরে সেই টেবিলটায় চাপা গলায় কোনও রগড়ের কথা বলে চলেছেন। ফিরে আসার নাম নেই।

আমি একা পড়ে গেছি। যদি একবারটি আসেন। কথা বলার কেউ নেই।

নীলাম্বর গিয়ে ভদ্রলোকের পাশে বসলেন। মানুষটির বেশ বয়স হয়েছে। দামি সাফারি সুটের বাইরে বেরনো গলা— হাত— সব জায়গায় ফরসা চামড়ার ভেতর থেকে নীল নীল শিরা জেগে উঠেছে।

নীলাম্বর গিয়ে বললেন, কেন ? এখানে আপনার কোনও বন্ধু নেই ?

ছিল। তারা কি আর বেঁচে আছে যে ক্লাবে আসবে! আই অ্যাম নাইনটি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড। ক্লাবে আজই আবার এলাম তিরিশ বছর পরে।

তার মানে ?

ঘাবড়াবেন না। কলকাতা তখনও ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল— সেই সময় বাবার হাত ধরে এখানে এসেছি প্রথম। যৌবনে— মাঝবয়সে হরদম এসেছি। এই তিরিশ বছর ড্রাফট পাঠিয়ে মেম্বারশিপ আপটুডেট রেখে এসেছি।

কথা বলছেন বুড়ো মানুষটি বাংলায়। কিন্তু বোঝা যায় বাঙালি নন।

ভদ্রলোক নিজের থেকেই বললেন, আমি বুস্তমজি প্রেস্টন। আমরা কলকাতার পারসি। আমি বাংলা স্কুলে পড়াশুনো করেছি পোলক স্ট্রিটে। এসপ্ল্যানেড ম্যানসনটা আমার বাবার ছিল। ওখানে এখনও আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। ব্রিটেন থেকে তিরিশ বছর পরে ফিরে এলাম গত সোমবার। এসে ওখানেই উঠেছি।

চলে এলেন ?

হ্যাঁ। পাকাপাকি দেশে ফিরে এলাম। বাবার মাইনিং ইন্টারেস্ট ছিল ঝরিয়ায়। সেসব বেচে দিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে ব্রিটেনে চলে যাই তিরিশ বছর আগে। ওখানেই আমার স্ত্রী মারা গেলেন। ছেলে রয়েছে ওখানে। কিন্তু ব্রিটেনে আমার আর ভাল লাগছিল না।

চলে এলেন ?

হ্যাঁ। পাকাপাকি। কলকাতা আমার হোম টাউন। এখানেই জন্মেছিলাম— এখানেই বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে— এখানে আমাকে কেউ চেনে না। যাদের সঙ্গে একসময় ক্লাব থেকে বেরিয়ে রেসের মাঠে গেছি— তাদের কাউকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না। তারা কি আর বেঁচে আছে ? আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

না না। তবে আমি কিন্তু ক্লাবের মেম্বার নই। এক বন্ধু চা খেতে ডেকেছিলেন।

বন্ধু কোথায়? দেখছি না তো।

ওই যে— ওই টেবিলে গিয়ে বসেছেন।

বুড়ো মানুষটি হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে কমলকে দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

ঠিক এই সময় কমল তাঁর কথা শেষ করে উঠে এলেন। বুস্তমজি তাঁকে দেখে আস্তে বললেন, বসুন না এখানে।

কমল রীতিমত বিরক্ত ভঙ্গিতে নীলাম্বরের মুখে তাকালেন। নীলাম্বর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এইমাত্র আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনি তোমাদের ক্লাবের একজন মেম্বার।

কথাটা কমলের ঠিক বিশ্বাস হল না। তিনি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন বুস্তমজির মুখে। নীলাম্বর বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। কমল ভাবছেন— এত বুড়ো কোনও মেম্বারকে তো তিনি কোনওদিন দেখেননি ক্লাবে। একটু যেন থরথর করে কাঁপছেও লোকটি। নিশ্চয় কারও সঙ্গে এসেছেন। যেমন এসেছেন আজ নীলাম্বর। তাঁর নেমন্তন্নে। কে নিয়ে এল এই বুড়োহাবড়াকে?

কমল আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন, আমি এখানকার এক্জিকিউটিভ কমিটিতে আছি। আমি তো কখনও—

সঙ্গে সঙ্গে বুস্তমজি বললেন, আমিও একসময় এক্জিকিউটিভ কমিটিতে থেকেছি। ফর্টিসিক্সে ছিলাম— ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমার নাম বুস্তমজি প্রেস্টন।

এককথায় কমল ঘোষ চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তবু তাঁর মুখ থেকে অবিশ্বাসের ছায়া এখনও যায়নি।

বুস্তমজি বললেন, আমিই বোধহয় এখন সবচেয়ে পুরনো মেম্বার। আগেকার আর কেউ বেঁচে আছি কি না জানি না।

এবার কমল বললেন, মনে পড়ছে। ক্লাব প্রেসিডেন্টদের ছবি আছে দোতলায়।

বুস্তমজি খুব অবহেলায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, থাকতে পারে।

কমল ঘোষ আস্তে আস্তে বুস্তমজিতে মজে যেতে লাগলেন। বুস্তমজি একসময় বললেন, এই ক্লাবে কত আনন্দ করেছি আমরা। বাবার মুখে শুনেছি—ভাইসরয়রা বছরে একবার ক্লাবে আসতেন। অবিশ্যি আমাদের সময়ে ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল তো দিল্লি চলে গেছে। তারপর আর ভাইসরয় আসেননি।

কথায় কথায় অনেক কথা এসে গেল। বুস্তমজি বলেই চলেছেন। নিজের কথার সঙ্গে একটু একটু কাঁপছেন। আর বলছেন। থেমে থেমে। চশমার ভেতর দিয়ে কমল ঘোষকে দেখার চেষ্টা করছেন।

বাবা করেছিলেন কয়লাখনি।

কোথায় ?

ঝরিয়ায়। নিরসাকটি আর দুনম্বর কালিমাটি। আর আমি করেছিলাম চা-বাগান।

নীলাম্বর দেখলেন, সম্ভ্রমে কমলের চোখের পাতা নেমে এল। তিনি আস্তে জানতে চাইলেন, সেসব বাগান ?

ম্যাকলিনকে বেচে দিয়েছিলাম। ব্রিটেন যাওয়ার আগে।

আমার ছোট ছেলে তো ম্যাকলিনেই কাজ করে। চা-বাগান দেখে।

তাকে বলবেন, হলং-- পাহাড়ি নদী হলংয়ের গায়ে রাঙাপাড়া টি এস্টেট—

ওখানে তো আমার ছেলে যায়।

ওই বাগান আমি নার্সারি থেকে একটু একটু করে গড়ে তুলি।

খুব ভাল বাগান।

ভাল না হয়ে উপায় নেই। সব চারা আমার নিজের হাতে বাছাই করা।

যে কমল নীলাম্বরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্য টেবিলে উঠে গিয়েছিলেন— তিনিই এখন বুস্তমজির টেবিলে একদম জুড়ে গেছেন। নীলাম্বর মনে মনে বললেন, সুরথ এলে বুস্তমজির সঙ্গে পটে যেত খুব সুরথ সেগুন, মেহগনি লাগায়। ধান, অড়হর করে। বুস্তমজি একসময় চা-বাগান করেছেন। তাঁর মনে হল— শুধু আমিই কিছু করি না

॥ নয় ॥

বেলা এগারটা নাগাদ হাওড়া ছেড়ে ট্রেন যখন কোটালপাহাড়ে এসে দাঁড়াল-- তখন প্রায় সন্ধে। পশুপতিকে নিয়ে নীলাম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখেন— গোল হয়ে বিশাল একখানা চাঁদ উঠেছে। প্ল্যাটফর্মের বাইরে রেলের অফিসঘরের পেছনের আকাশে। খুব কাছে। একদম হলদে। চাঁদের ভেতরের পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে।

আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সুরথ ভাদুড়ি হাবেলিতে এইদিনে ঘটা

করে লক্ষ্মীপুজো করেন। কলকাতায় থাকতে নীলাম্বরকে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবে কিন্তু।

বন্ধু বলতে পশুপতিকে পেয়ে ধরে এনেছেন নীলাম্বর। পশুপতি গুহরায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পড়ে নীলাম্বরকে বললেন, তোর ক্লাসফ্রেন্ড সুরথ তোকে আসতে বলেছেন। ঝুটমুট আমাকে নিয়ে এলি কেন?

চল না। সুরথ মানুষ দেখলে খুশিই হয়।

প্ল্যাটফর্মে রেলের ইলেকট্রিকের আলো ছাপিয়ে আকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদের আলো। একদল সাঁওতাল— তাই মনে হল নীলাম্বরের—সুরথের মুখ থেকে শুনে শুনে তাঁর কাছে এখানকার অনেক কিছুই এখন জানা— অন্য দরজা ফাঁকা থাকলেও একই দরজা দিয়ে ঠেসেঠুসে সবাই ট্রেনের কামরায় উঠছে।

দুজনে রাস্তায় এসে পড়লেন। লাল মাটির রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট। প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে রাস্তার পাশেই বিরাট বটগাছ সন্ধেরাতে পাখিরা ঘরে ফিরে কিচিরমিচির কথা বলেই যাচ্ছে। চড়া জ্যোৎস্নাকে দিনের শেষের আলো বলে ভুল করেনি তো? এর ভেতরেই রিকশর প্যাঁক প্যাঁক। জ্যোৎস্নায় রিকশর নিকেল করা মাডগার্ডও চকচক করছে।

রিকশ নিবি?

নীলাম্বর বললেন, রিকশ কী হবে। ডানদিক ধরে হেঁটে গেলেই ভাদৌড়ি হাবেলি। তিন-চার মিনিটের পথ।

মনে হচ্ছে তুই যেন ঘুরে গেছিস।

নারে। তোর মত আমিও এই প্রথম এলাম পশুপতি।— বলতে বলতে নীলাম্বর তাঁর চোখের সামনে একটা নীল আলোর ফুলকি দেখতে পেলেন। অমনি সারাটা ভাদৌড়ি হাবেলি তিনি দেখতে পেলেন। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সেগুন, মেহগনির বাগান। গাছগুলোর বাকলঢাকা গা। তার ভেতর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সুরথদের বাড়ি। গাছের ফাঁকেফোকরে অনেকটা দেখা যায়। অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়ানো বাড়ি। বিশাল বিশাল ঢাকা বারান্দা বাড়ির চারদিকে। সামনের হলঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বললেও চাঁদের আলো আজ সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

রাস্তার দু'ধারে দোকানপাটের সাইনবোর্ড হিন্দিতে। পাশাপাশি উর্দুও আছে। আছে দু'একখানা ইংরেজিতে লেখা সাইনবোর্ড। রাস্তার মানুষজন কাটিয়ে দু'জনে যখন ভাদৌড়ি হাবেলির সামনে এসে দাঁড়ালেন—পশুপতি বা নীলাম্বর—কারও মুখেই কোনও কথা ফুটল না। চাঁদের আলোয়

গাছপালা ঢাকা বিরাট চত্বর। কম্পাউন্ডওয়াল খানিকদূর দেখা যায়। তারপর তা মাঠের ভেতর হারিয়ে গিয়েছে। কম্পাউন্ডওয়ালের বাইরেই সাদা রঙের একটি মসজিদ। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে—সুরথদের বাড়ির বারান্দায় অনেক লোকজন।

তাদের কথাবার্তার আওয়াজ। হাসির হররা। ওরই ভেতর লক্ষ্মীপুজোর শঙ্খ বেজে উঠল। ঘণ্টার আওয়াজ। বড় বড় সেগুন, মেহগনির ডালপালার ভেতর থেকে টিয়া পাখি ডাকল যেন। 'ক্যাঁ—' তাই তো মনে হল নীলাম্বরের। কম্পাউন্ডওয়ালের বাইরে সাদা রঙের মসজিদ ছাড়িয়ে চোখ আর যায় না। শীত আসেনি। কিন্তু শীত শুরুর কুয়াশা এসে পড়েছে। সেই কুয়াশায় সবটাই ঝাপসা। ওদিকটাই তাই মনে হচ্ছে—ধানখেত—কিংবা স্রেফ মাঠ।

তোরণের মত গেট পেরিয়ে মোটা মোটা গাছের গা। জ্যোৎস্নায় তাদের আলাদা করে চেনা দায়। তবে সরল সিধে সেগুনকে কে আর না চেনে। অল্পবয়সী মেহগনিগুলো দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। নীলাম্বর বা পশুপতি—কেউই তাদের নামে নামে চিনতে পারলেন না।

খানিক এগিয়ে যেতে নীলাম্বর দেখলেন, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুরথ বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। কোনও কষ্ট হয়নি তো? বসতে জায়গা পেয়েছিলে?

নীলাম্বর বললেন, বিশেষ ভিড় নেই তো। এই আমার বন্ধু পশুপতি গুহরায়। নিয়ে এলাম সঙ্গে করে—

খুব ভাল করেছ। পশুপতিবাবু কষ্ট করে আসায় খুব খুশি হলাম। চলুন। ওপরে চলুন। আমরা অনেকেই ওপরে দোতলায় তোমাদের জন্যে ওয়েট করছিলাম। এবছর পুজো হল তো দোতলায়।

নীলাম্বর বারান্দায় উঠে জানতে চাইলেন, তুমি একদম রাইট টাইমে রিসিভ করতে নেমে এলে। আমরা এসে গেছি বুঝলে কী করে?

খুব সিম্পিল অম্বর। ট্রেন এলে শোনা যায়। ট্রেন চলে গেল টের পাই। কাছেই তো সব।

বারান্দা দিয়ে ঢুকতেই বড় হলঘর। দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চ পেতে সবার বসার জায়গা। মেঝেতে তিনজন লোক শালপাতা আর গ্লাস সাজাচ্ছে। তার মানে খিচুড়ি, প্রসাদ এবার দেওয়া হবে। বেঞ্চে বসে নানা চেহারার পঁচিশ-তিরিশজন লোক। তার শালপাতা পড়তেই বেঞ্চ থেকে নেমে মেঝেতে বসছেন। এঁদের কারও বা দেহাতি চেহারা। কেউ বা বিলকুল খালি গা।

আবার কেউ ঠেঁটি ধুতি হাঁটু অব্দি টেনেটুনে ওপরে ফতুয়া চড়িয়েছেন

নীলাম্বর বুঝলেন, এঁরা সবাই সুরথের লোকাল মানুষজন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুরথ বললেন, বছরে এই একটি দিন সবাইকে ডাকি। এই দিনটিতে সারাটা হাবেলি গমগম করে।

পুজো হয়ে গেল?

হ্যাঁ। আমাদের তো প্রদোষ পুজো। আর জোড়া লক্ষ্মী।

নিচের হলঘরটির ওপরেই দোতলার হলঘর। লালপেড়ে শাড়ি পরানো একজোড়া কলাগাছ। ঘোমটা দেওয়া। কাঠের সিংহাসনে একজোড়া লক্ষ্মী। দু'পাশে তাদের গায়ে আখ বাঁধা হয়েছে। লক্ষ্মীর পা কলাগাছের বাসনায় বসানো। সামনে কলাগাছের থোড়ের ওপর ঝাঁটার শলার ওপর বসানো বাসনার নৌকোয় নতুন ধানের ছড়া। গাছ থেকে পেড়ে আনা কাঁচা সুপুরির ছড়া। তেল-সিঁদুর মাখানো আমের পল্লব জলভর্তি ঘটে। সবরকম প্রসাদের ওপরেই ফুল। তার মানে— খানিক আগেই পুজো শেষ হয়েছে।

এই যে ডাক্তারবাবু। কলকাতা থেকে আমার দুই বন্ধু এসেছেন।

ডাক্তারবাবুটি দেখতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী। একগাল কাঁচাপাকা দাড়ি। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে জোড়হাতে বললেন, আমি পালিত ডাক্তার। এখানেই প্র্যাকটিস করছি তিরিশ বছর।

নীলাম্বর, পশুপতি দু'জনই দেখলেন, ডাক্তারবাবুটিও তাঁদেরই বয়সী হবেন। বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি। তার ওপর কাঁধে একখানি লোকাল চাদর। বেশ মোটা। হয়ত সাঁওতালদের হাতের কাজ। চুনে হলুদ রঙে ছোপানো। একথা-সেকথায় ডাক্তারবাবু বললেন লোকাল রোগ বালাইয়ের কথা। বিশেষ করে স্টোন কোয়ারির সাঁওতাল লেবারদের ফুসফুসে পাথরের গুঁড়ো ঢুকে গিয়ে শ্বাসকষ্টের কথা উঠল। এদিকটায়— সেই পাকুড় থেকে গোমানি অব্দি পাথর ভাঙার কাজই তো লোকাল মজুরদের বড় এমপ্লয়মেন্ট।

তোমার ছেলেমেয়ে আসেনি?

গিন্নি এসেছেন। ওরা আসতে পারেনি।

সুরথের স্ত্রী— বেশ লম্বা বাঙালি মেয়েদের তুলনায়— একখানি লালপেড়ে তাঁত পরেছেন—একসময় বললেন, আপনাদের প্রসাদ দিই?

সুরথ বললেন, ওরা তো থাকছে। পরে দিলেও চলবে। আগে অন্য সবার হোক।

হলঘরের বিশাল শতরঞ্জির ওপর বসে নীলাম্বর খোলা দরজা দিয়ে

দোতলার পেল্লাই ঢাকা বারান্দা দেখতে পেলেন। তিনটি আলোর ডুম সে-বারান্দার সবটা আলো করতে পারেনি। বিশাল বাড়ি। লোকজন চলে গেলে খাঁ খাঁ করবে।

খোলা জানলা দিয়ে সুরথের লাগানো সেগুন, শিশু, আম, অর্জুন, মেহগনি— সব গাছের নাম জানেন না নীলাম্বর— চেনেনও না— গাছের ডালপালা, গা দেখতে পাচ্ছেন। তারা ফিনিক ফোটা কোজাগরী জ্যোৎস্নায় চান করছে। কলকাতা থেকে কত দূরে সুরথের এই আশ্চর্য জগৎ। ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে এসেছে এখন মানুষের সংসার ঘরকন্না। সেখানে সুরথ বছর বছর হলঘরে বোঝাই হাবেলিতে বালি সিমেন্ট দিয়ে প্যাচ ওয়ার্ক করায়। রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে। বছর বছর শাল, শিমুল, শিরীষ লাগান। সাবেক সেগুনের ডালপালা ছাঁটান। গ্রোথের জন্যে। গাছগুলো বছর বছর আকাশ বেয়ে আরও উঁচুতে উঠে যায়।

কথায় কথায় রাত এগিয়ে যাচ্ছিল। আর বাইরের লোকজনও কমে আসছিল। হঠাৎ হলঘরের সিলিংয়ে চোখ পড়ল পশুপতির। এ তো দেখছি ঝাড়বাতি।

সুরথ গর্বের হাসি হেসে বললেন, নবাবি আমলের।

তার মানে?

নবাব সাহেবদের প্যালেস ছিল। ওঁদের পূর্বপুরুষ কেউ আনিয়েছিলেন। এই সেঞ্চুরির নয়।

কি বলছ?

যা বলছি ঠিকই বলছি। সাফসুতরো করার জন্যে সিলিং থেকে নামানো হয়েছিল। ধুলো ঝাড়ার পর দেখি—কাচে খোদাই করে লেখা— ইংরেজিতে— ড্রেসডেন, ১৮৯০।

পালিত ডাক্তার বললেন, এসব জিনিস তো এখন আর তৈরি হয় না।

পশুপতি বললেন, ইংরেজি সিনেমায় দেখেছি।

সুরথ বললেন, কলকাতায় মল্লিক প্যালেসে দেখতে পাবেন। এক একটার দাম এখন কিছু না হলেও দেড় লাখ টাকা হবে। নবাবদের শখ। ওঁরা তো কম শৌখিন ছিলেন না।

আরও আছে নাকি?

ভেতরের হলঘরের সিলিংয়ে আরও একটা আছে। কিন্তু সেটা সাফ করতে আর নামাইনি।

কেন ?

সে ঘরের সিলিং আরও উঁচু। প্যালেসের ও দিকটা তো ১৮৭৬ সনে তৈরি। নামাইনি কারণ, নামাতে গিয়ে যদি ভেঙে ফেলি। থাকুক না যেমন আছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। এক একজনের মনের ভেতর এক এক কথা ভেসে উঠছে। নীলাম্বর বুঝতে পারেন— মানুষ বড় আশা করে বাড়ি, প্যালেস, মঞ্জিল, হাবেলি বানিয়ে থাকে। সাজায়। একটু একটু করে। দিনের আলোতে নিজের বানানো আশাকে— হাউসকে দেখে। আবার রাতে ঝাড়বাতির আলোতেও দেখে। দেখে দেখে হাউস মেটে না। মনে হয়— না জানি— এরপরেও আরও কিছু আছে। কেন ? এখন ফ্ল্যাট কিনে— বানিয়ে আমরা তো এই একই রকম করি।

সুরথ বললেন, আরও তিনটে ঝাড়বাতি হাতে এসেছিল। কিন্তু আমি নিইনি। বলতে পারো— আমার কাছে রাখিনি। এই সামসুল সাহেব জানেন।

সামসুল সাহেব মানুষটি পাজামার ওপর ফুলশার্ট গায়ে। তার ওপর হাতকাটা কোট। চোখে ভারী চশমা। সিঙ্গল সোফায় বসে। তিনি গলা তুলে বললেন, ভাদৌড়ি সাহেবকো রাখনা চাহিয়ে থা। রাখলে ভাল হত।

পশুপতি আর নীলাম্বর দু'জনই সামসুল সাহেবের মুখে তাকিয়ে পড়লেন। তারপর ঘরের বাকি সবার মুখ দেখলেন। সবাই যেন চুপ করে কোনও কথা না বলে একটি কথাই বলছেন। ঝাড়বাতি তিনটে রাখা উচিত ছিল সুরথের।

সুরথ বললেন, সামসুল রহমান অতি সজ্জন মানুষ। আমাদের এখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার উনি। উনি সব জানেন। এঘরে আর যাঁরা আছেন— যেমন চৌবেজি, স্টেশনমাস্টার ওরন শর্মা, রেজা আলি খান, ডাক্তারবাবু— ওঁরাও জানেন। অম্বর ?

নীলাম্বর যেন চমকে উঠলেন, অ্যাঁ ?

এখন দুঃখ হয়—কেন সেদিন ঝাড়বাতিগুলো রাখলাম না। রাখলে অমন বাহারি, শৌখিন, দামি জিনিস তিনটে থেকে যেত। ওগুলো ছিল কোটালপাহাড়ের গর্ব।

পশুপতি আর থাকতে পারলেন না। জানতে চাইলেন, কীরকম ?

সুরথ বললেন, আমাদের গেট দিয়ে ঢোকার সময় সাদা রঙের মসজিদ দেখেছেন তো।

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

এই মসজিদ নবাব সাহেবরা বানিয়েছিলেন। ওঁরা তো ওখানে নামাজ পড়তেনই। লোকাল মানুষজনও ওখানে গিয়ে নামাজ পড়তেন। মসজিদের পাশেই নবাব ফ্যামিলির মানুষজনের নিজেদের সমাধি আছে সব। এখনও কোনও কোনও সমাধিতে কেউ কেউ গিয়ে বাতি দিয়ে আসেন।

নীলাম্বর জানতে চাইলেন, এখন নামাজ পড়া হয় না?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিশ্চয় হয়। কাল ভোরে আজানের সুরে তোমার ভোর হবে দেখ। নতুন ইমামসাহেবের গলাটি ভাল। সিক্সটি ফাইভে এদিকে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। তখন ইন্দো-পাক ওয়ার। ইমামসাহেব মসজিদে তালা দিয়ে চলে যাবেন। যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, তিনটে ঝাড়বাতি রয়েছে। খুব দামি। ভাদৌড়ি সাহাব আপনার কাছে রেখে দিন।

রেখে দিলে?

নাঃ। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। বলেছিলাম, ওগুলো মসজিদের দামি জিনিস। আমি রাখব না। ইমামসাহেব ঝুলোঝুলি করলেন। বললেন, আপনাকে কেউ অবিশ্বাস করবে না। আপনি রাখুন। আমি বললাম, মাপ করুন, আমি একজন হিন্দু। শেষে কোনও কথা হবে। আমি রাখলাম না। রাতের অন্ধকারে মসজিদের তালা ভেঙে চুরি হয়ে গেল ঝাড়াবাতি তিনটে। কোটালপাহাড়ে অমন বাহারি, দামি জিনিস আর হবে না। নাও। এবার সবাইকে প্রসাদ দিতে বলি।

নীলাম্বর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দাও। আমি কয়েকটা সিগারেট নিয়ে আসি।

তুমি যাবে কি? এখানে কিছু চেনো না। বসো। আমি আনিয়ে দিচ্ছি। হরিয়াল—

না না। কাউকে ডেকো না। পান সিগারেটের আবার চেনার কি আছে। যাব আর নিয়ে আসব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীলাম্বর দেখলেন, নিচের হলঘর প্রায় ফাঁকা। দু'জন সাঁওতাল খুব হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনের বাগানে পড়ল। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে জ্যোৎস্নার চৌকো কখনও তাদের গায়ে— পায়ে। আবার কখনও ফিকে অন্ধকারে ওরা একটু আবছা হয়ে গেল। ওঁদের পেছন পেছন নীলাম্বর গেট পেরিয়ে কোটালপাহাড়ের বাজার রাস্তায় এসে পড়লেন। সাঁওতাল দু'জন ফটফটে জ্যোৎস্নায় ডাইনে স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছে। দোকানিরা কেউ কেউ ঝাঁপ ফেলে দিচ্ছে। নীলাম্বর বাঁ দিকে তাকালেন।

সাদা মসজিদ জ্যোৎস্নায় একেবারে দুধসাদা হয়ে দাঁড়িয়ে। ডানদিকে এগোলে নিশ্চয় পান সিগারেটের দোকান পাওয়া যাবে। হঠাৎ ঘণ্টার আওয়াজে ফিরে তাকালেন নীলাম্বর।

সাদা মসজিদের সামনে দিয়ে একটি টাঙার কাঠামো এগিয়ে আসছে। আবছামত। ঘোড়ার লালচে কালো মাথাটি সবার আগে। তারপরেই লাগাম ধরে বসা একজন মানুষের আভাস। ঘণ্টির চাপা আওয়াজ তুলে ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজছে। টাঙা এসে নীলাম্বরের সামনে থেমে গেল। রাস্তার ওপর। নীলাম্বর দেখলেন, আরে! এ তো একজন মহিলা বসে। তার বাঁ হাতে লাগাম।

এবার তিনি পরিষ্কার দেখলেন, নিচে গারারা। ওপরে জামার ওপর দোপাট্টা। কুয়াশায় কোনও রঙই বোঝার উপায় নেই। মাথাটি কালোই লাগল নীলাম্বরের। অ্যাতো রাতে টাঙায় লাগাম হাতে একজন মহিলা! তার মাথার ভেতর সুরথের নানা সময়ে বলা কথার দু'একটি চিড়িক দিয়ে গেল। আপ রোশেনারা বেগম?

বাংলায় বলুন। আমার আম্মিজান বাংলা শিখেছিলেন। আমিও বাংলা বুঝি। আপ কৌন? নৌতুন রাজার রিসতেদার?

নতুন রাজা?

ভাদৌড়ি হাবেলির ভাদৌড়িজি!

ওঃ। হ্যাঁ। আমি সুরথবাবুর বন্ধু। আমি ঠিকই বলেছি। আপনি নিশ্চয় রোশেনারা বেগম?

বলুন হাতকাটা রোশেনারা! জখমি রোশেনারা!! অভাগিন রোশেনারা!!! কোটালপাহাড়ে আমাকে এখন সবাই তাই বলে। দেখছেন না— আমার ডান হাতখানা গায়েব!

একজন টাঙার ওপরে বসে। অন্যজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। লাল মাটির রাস্তা। ভরা চাঁদনিতে সেই রাস্তাকেও দামি দেখাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় না জানি কত মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। ভাদৌড়ি হাবেলির সেগুন-মেহগনি বাগান থেকে কোন গাছের ফুল কতকগুলো উড়ে এসে পড়েছে রাস্তায়। সেই সঙ্গে নানান গাছের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা গন্ধ বাতাসে।

নীলাম্বর হালদার সিগারেট কিনবে বলে পা বাড়ালেন।

লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ নীলাম্বরের দিকে এনে ফেললেন রোশেনারা। তাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হল নীলাম্বরকে।

কাঁহা যাইবন?

সব কথা ধরতে পারছেন না নীলাম্বর। কখনও বাংলা। কখনও হিন্দি। আবার সেই সঙ্গে কিছুটা দেহাতি। তিনি বললেন, এক প্যাকেট সিগারেট কিনব।

এখানে কোথায় পাবেন! এদিকে তো সব দুকানে ঝাঁপ পড়ে গেল।

এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাব।

উঁহু। এগোলেও পাবেন না। সব দুকান বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি তো এখানকার রাস্তাঘাট, দুকানপাটের হাল হকিকৎ কিছুই জানেন না। উঠুন। টাঙায় উঠুন।

না না। আমি হেঁটে গিয়ে কিনে নিয়ে ফিরব।

কোনদিকে হাঁটবেন? আমার টাঙায় মেহেরবানি করে উঠে বসুন। আমি জানি এখন কোথায় দুকান খোলা আছে। সেই মতিঝোরার রাস্তায় যেতে হবে। শিউমন্দিরকা বগলমে।

কোনদিকে বলে দিন না আপনি। ঠিক চলে যাব।

আনজানে মেহেমানের উপর ডাকাইতি হয় এখানে। টাঙায় উঠে বসুন।

অবাকই লাগছে নীলাম্বরের। বয়স হয়েছে রোশেনারার। একা একা লাগাম হাতে টাঙায়! এত রাতে। রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায় নেই। যাও বা দু'একজন হাঁটুরে লোক যাচ্ছে— তারাও রোশেনারার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বোঝাই যায়— সারাটা কোটালপাহাড় টাঙায় রোশেনারাকে দেখে থাকে।

নীলাম্বর টাঙার পেছন দিকে উঠে বসলেন। রোশেনারার মুখ সামনের দিকে। নীলাম্বরের মুখ ঠিক উল্টো— পেছন দিকে।

রেল স্টেশন বাঁয়ে রেখে টাঙা এগিয়ে গেল। একটা দুটো ছোটখাটো খাবার জায়গা এখনও বন্ধ হয়নি। কিন্তু কোনও পান সিগারেটের দোকান চোখে পড়ছে না নীলাম্বরের। সব ঝাঁপ পড়ে গেছে।

এদিককার দোকানপাটগুলো বসতবাড়ির বারান্দায় বারান্দায়। বন্ধ দোকানের পাশেই হয়ত সে-বাড়ির সিংদরজা। খুব উঁচু। দরজার মাথায় কোনও কোনও বাড়িতে চাঁদতারা। কোনও বাড়িতে পদ্ম। কোনও বাড়িতে কিছু নেই। কিংবা রাজহাঁস। সবই সিমেন্টের। শঙ্খের কাজ করা। ফটফটে জ্যোৎস্নায় যেসব কাজ ঝকঝক করছে।

টাঙা চলেছে দুলকি চালে। সেই চালে ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজছে। নীলাম্বর বলে উঠলেন, আমি সিগারেট কিনেই ফিরে যাব বলে এসেছি—

পহলে তো সিগারেট খরিদ করুন। আপনাকে আমি চোরি করে নিয়ে যাচ্ছি না।

না না। তা কেন। সিগারেটের দোকান কি খোলা আছে একটাও?

শিউমন্দিরের ওখানে পেয়ে যাবেন। বলতে বলতে রোশেনারা বেগম ঘোড়াকে ডাকলেন, জলদি চল বুকসানা। ঝকুর তাড়া আছে।

নীলাম্বর মনে মনে বললেন, ঘোড়ার নামটি তো বেশ খানদানি। বুকসানা! মুখে বললেন, আর কতটা?

এই তো এসে গেলাম।

রেল লাইনের গায়ে কিছু ঝুপড়ি। সেগুলো ডাইনে ফেলে কয়েকঘর সোনা-রুপোর দোকান। ঝাঁপ বন্ধ। হিন্দি সাইনবোর্ড খানিকটা পড়তে পারছেন নীলাম্বর।

এক জায়গায় একটা বড় ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। কোনও বাড়িতে হয়ত উৎসব ছিল। তাদের জ্বালানো আলোয় নীলাম্বর দেখলেন, রোশেনারার মেহেদি করা চুল লালচে। তাঁর আর রোশেনারার পিঠোপিঠি বসার মাঝখানে একখানি মাত্র তক্তার তফাত।

আপনি নৌতুন রাজার দোস্ত।

হ্যাঁ। পুরানা দোস্ত।

তব তো হাতকাটা রোশেনারাকে নিয়ে কিছু চর্চা হয়েছে।

নীলাম্বর বুঝলেন, এ তো পেটের কথা বের করে নেওয়ার মতলব। তিনি বললেন, না! তেমন কিছু নয়।

তবু কুছ কুছ তো বলেছেন নৌতুন রাজা। এই মামলাবাজি। হইহুজ্জৎ।

বিশেষ কিছু নয়। আমি তো কলকাতায় থাকি। কোটালপাহাড় এই আজ সন্ধেবেলায় এসেছি।

সে তো নৌতুন রাজা ভি থাকেন কলকাতায়।

এখানেও থাকেন সুরথবাবু। আপনি তো ভাল করেই জানেন বেগমসাহেবা।

রোশেনারা খুশি হলেন। টাঙার চলতি চালের সঙ্গে দুলতে দুলতে হেসে ফেললেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, আপনি ইজ্জত দিতে জানেন। আপ খোদ ইজ্জতদার আদমি আছেন।

আমাকে দয়া করে নামিয়ে দিন। আমি সিগারেট কিনে ফিরে যাব। ওঁরা চিন্তা করবেন।

ঘাবড়াবেন না। আমি এক না-লায়েক আওরত আছি। আমি আপনাকে গায়েব করবার এলেম রাখি না। ওই নবাব প্যালেসে আমি বড় হয়েছি। আমার নানাসাহেবের আব্বাহুজুর সন ১৮৭৬-এ প্যালেস বানান। তারপর সন ১৯০১-এ আমার নানাসাহেব সামনের দিককার দেউড়ি, ঘরবাড়ি বানান।

আপনার নানাসাহেব ?

হ্যাঁ। নানাসাহেবের দুটি বেটি। একবেটির ছেলে নবাব আসাদুল্লা আমার মসেরা ভাই। তার সঙ্গে আমার শাদি হয়। আমার নানাসাহেব তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। আমি আসাদুল্লার মওসির বেটি।

বুঝলাম না।

আমার মওসির ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমাদের ভেতর তো এমন হরবখত্ হয়েই থাকে। আমরা দুজন এই প্যালেসে বড় হয়ে উঠি। আমি আর আসাদুল্লা। পরে আসাদুল্লার বেগম হয়েছি আমি।

তা নবাব আসাদুল্লা যখন প্যালেসের বদলি মৈমনসিংয়ে নতুন রাজাদের বাড়িঘর পেলেন— তখন আপনি মামলা করতে গেলেন কেন ? কিসের হকে আপনি প্যালেস দাবি করলেন ?

বাঃ। যখন আমি প্যালেসের ভাগ চাইলাম— তখন তো আমি আর নবাব আসাদুল্লার বেগম না আছি। তালাক হয়ে গেল। আমি তো তখন আমার আব্বাহুজুর— আম্মাহুজুরাইনের ওয়ারিশান। তাদের ভাগ আমি বেটি হয়ে পাব না ?

জ্যোৎস্না রাতে অধিকারের কচকচি কেমন বেখাপ্পা। তবু নীলাম্বর বললেন, আপনাদের আইনে তো নিয়ম আলাদা। তালাকের পরেও মেয়েদের কি অত ভাগটাগ থাকে ?

আমি আইনের কি জানি ? আমি বচপন থেকে ওখানে ছিলাম। বড় হয়েছি। ওপারে চলে যাওয়ার সময় আসাদুল্লা মিঞা কী করে গেছে— সেজন্যে আমি বে-ঘর হব কেন ?

আপনি বে-ঘর ?

টাঙা থেমে গেল। ডান হাতে শিবমন্দির। বেশ উঁচু। মন্দিরে কেউ নেই। ভেতরে বিগ্রহের সামনে অল্প পাওয়ারের ডুম জ্বলছে। কোথায় সিগারেটের দোকান ! সব বন্ধ। একটা সাইকেল রিকশর সিটে একজন সাঁওতাল ঘুমোচ্ছে। রাস্তার বাঁ দিকে গাছপালা— বড় বড়। জ্যোৎস্না খুব চড়া বলে গাছের পাতা— তাদের জড়িয়ে ঝুলে পড়া তলা— সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওই দেখুন আমার ঘর--

নীলাম্বর দেখলেন, সামনেই রাস্তাটা নিচু হয়ে আবার ঢেউ খেলে ওপরে উঠে গিয়ে বিশাল এক শাল জঙ্গলে মিশে আছে। গাছগুলো আকাশে সত্তর-আশি ফুট উঠে গেছে। আর সেই জঙ্গলের ডানদিকে গাছগাছালির ভেতর মাথা তুলে দাঁড়ানো উঁচু পাহাড়ি টিলা থেকে একটা ঝোরার জল জ্যোৎস্নায় জ্বলন্ত কাজ হয়ে অবিরাম ঝরে পড়ছে। সেই জলে ঢলু নাবিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রায় দিঘি। সেই দিঘির পাড়ে— প্রায় জলটুঙি বলা যায়— বাঁয়ে বাঁধানো একটি চাতাল—ওপরের গম্বুজ মত ছাদ ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়— তবু কয়েকটা থামের ওপর কোনওমতে টিকে আছে। নিচে চাতাল ঘিরে প্ল্যাস্টিক।

আপনি ওখানে থাকেন ?

হ্যাঁ। সামনেই আমাব নানাসাহেবের আব্বাহুজুরের লাগানো শালগাছের জঙ্গল। ওই চাতালে বসে নানাসাহেবের আব্বাও একসময় নামাজ পড়েছেন। এখন আমি পড়ি। বচপনে কত বেড়াতে এসেছি এখানে। আর এখন ওখানে থাকি।

নীলাম্বর খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। কোনও মতে শেষে বললেন, এত বড় শালজঙ্গল— এখানে একা থাকেন !

রোশেনারা বেগম মাথা নাড়লেন। মানে হ্যাঁ। শেষে বললেন, এসব শালগাছ সত্তর-আশি বছরের পুরানা। নানাসাহেবের বাবা লাগিয়েছিলেন। এখন সরকার নিয়ে নিয়েছে। ওই নামাজ পড়ার জায়গাটাই শুধু নিতে পারেনি। আর নিতে পারেনি ওই মোতিঝোরা।

খুব বড় জঙ্গল ?

হ্যাঁ। নানাসাহেবের আব্বা দু'মাইল জায়গা জুড়ে লাগান। বছর বছর লাগিয়ে গেছেন। হয়ত ভেবেছিলেন, নবাবি চলে গেলেও এইসব শালগাছ একদিন আমাদের দেখবে। শালগাছে আমাদের চলে যাবে। তাও বা থাকল কোথায় ? জঙ্গল দপ্তর নিয়ে নিল সব।

সিগারেটের কথা একদম ভুলে গেলেন নীলাম্বর। রোশেনরা টাঙা থেকে ঘোড়াকে খুলতে খুলতে বললেন, এক একদিন আমি রুকসানাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যাই। ওখানকার ঘাস ওর বহুত পসন্দ। বচপনে দে[illegible]ছি আমার নানাজানের খুব খেয়ালে থাকত এইসব শালগাছ। সরকারি লোকজন জঙ্গলের কোনও তরিবত করে না। অনেক গাছ মরে গেছে।

তাই ?

হ্যাঁ। মরেও তারা দাঁড়িয়ে আছে। কিছু গাছ পোকায় শেষ। হঠাৎ হঠাৎ সেসব গাছ ধড়মড় করে পড়ে যায়।

আপনি জঙ্গলের ভেতরে যান?

হ্যাঁ। জ্বালানির লকড়ি আনতেও ঢুকি জঙ্গলে।

বাঁহাতে টাঙাটা টেনে মন্দিরের গায়ে রাখলেন রোশেনারা বেগম। তারপর লাগাম ধরে ঢালু পথ বেয়ে রুকসানাকে নিয়ে নামতে লাগলেন।

নীলাম্বর দাঁড়িয়ে। তিনি রোশেনারা বেগমের আস্তানা পুরো দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন মতিঝোরা। কোনও থামার নাম নেই। সাদা রঙের জল টিলা থেকে নাচতে নাচতে নেমে আসছে।

হঠাৎ নিচের থেকে রোশেনারা মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। আপনার সিগারেট কেনা হল না। কেন যে দুকানগুলো এত জলদ্‌বাজি করে ঝাঁপ ফেলে দেয় আজকাল। কোটালপাহাড় এমন ছিল না আগে।

ও ভাববেন না। কাল সকালেই তো দোকান খুলে যাবে।

আপনি যাবেন কী করে?

একটাই তো রাস্তা। উল্টোদিকে হাঁটব এবার। সন্ধেরাতে কোত্থেকে আসছিলেন তখন? মসজিদের পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন—

ওঃ! ওখানেই আমাদের সবার কবর। আব্বাজানের কবরে আমি বাতি দিতে যাই—